বাঙলা নাটকের এই প্রেক্ষাপট স্মরণে রেখে আপনাকে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক পড়তে হবে। দেশকালের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিত একাধারে যেমন তাঁকে নাটক রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি তিনি কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। কারণ বিশেষ স্মরণীয় বাংলা নাটকের এ সময়ে অভাব ছিল। অধিকন্তু নাটক রচনার উপযুক্ত আদর্শ বাংলা গদ্য পদ্য ভাষার অনুপস্থিতি ও সীমাবদ্ধতা নিয়েও দীনবন্ধু অপটু হাতে তাঁর প্রথম নাটকটি লিখেছিলেন। স্বভাবতই তাঁর রচনার মধ্যে অনেক দুর্বলতা থাকা অসম্ভব নয়। তথাপি দেশের দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতি সীমাহীন মমতায় তাদের সমস্যা তুলে ধরবার গুরুভার তিনি তুলে নিয়েছিলেন বলেই তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। আপনি পরবর্তী দুটি এককে এ সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে জানবেন।

৮১.৯ সারাংশ

ষোড়শ সপ্তদশ শতকে লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে রচিত পাঁচালী, নাচগানের মাধ্যমে দেবোপাসনার উদ্দেশ্য রচিত মঙ্গালগান ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে নাট্যনীতি অষ্টাদশ শতকে এসে ভিন্নতর নামরূপ পেল। কবিগান এবং সংগীত বহুল লোকাভিনয়ের নাম হল যাত্রা। নব্য শিক্ষিত বাঙালির রুচি যাত্রার পরিবর্তে ইংরেজি মঞ্চাভিনয়ের প্রেরণায় ইংরেজি নাট্যাদর্শে রচিত বাংলা নাটকের, প্রতি আকৃষ্ট হল। সূত্রপাত ঘটল বাংলা নাটক রচনার। লেবেডফ এদিকে পথ দেখিয়েছিলেন। বাংলা গদ্যের অনুশীলনপর্ব শেষে জি সি গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার যথাক্রমে 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' নাটক লিখলেন। পরের বছর হরচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়রের একটি নাটক অনুবাদ করলেন। নাটক রচনার এই সূচনা পর্বে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক নিয়ে আবির্ভাব ঘটল রামনারায়ণ তর্করত্নের। সমাজের বাস্তব সমস্যা যেভাবে তিনি নাটকটিতে তুলে ধরলেন, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। সংস্কৃতজ্ঞ রামনারায়ণ কতকগুলি সংস্কৃত নাটক অনুবাদ ছাড়াও পুরাণাশ্রিত মৌলিক নাটক ও সামাজিক সমস্যামূলক নাটক রচনা করেছিলেন। শৌখিন রঙ্গামঞ্চে বহুবার অভিনীত হওয়ায় তিনি নাট্যকার হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে 'নাটুকে' রামনারায়ণ নামে খ্যাত হয়েছেন।

প্রাক্-মধুসূদন পর্বের বাংলা নাটক যাত্রারীতিকে বহন করলেও সর্বতোভাবে ইংরেজী রীতি আশ্রয় করতে পারে নি। সংস্কৃত নাট্যাদর্শের অনুসরণ বেশি, যদিও ক্বচিৎ ইংরেজি রীতি অনুকরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

'শর্মিষ্ঠা' নাটক নিয়ে নাট্যকার মধুসূদনের যাত্রা শুরু। এর গঠনে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব প্রবলতর। পদ্মাবতীতেও তাই। এর কাহিনি গ্রীক পুরাণ থেকে নেওয়া। দুটি প্রহসন ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ইংরেজি আদর্শের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। প্রহসনের ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি ব্যাঙ্গাত্মক উপস্থাপনা আজও অনন্য। ইতিহাসাশ্রিত কৃষ্ণকুমারী নারীচরিত্র সৃষ্টি ও বিয়োগান্তক নাট্যরস সৃষ্টিতে সফল।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। নাটকটি ইংরেজি রীতি অনুসরণে রচিত হলেও শিল্প সৌকর্যে দুর্বল। দরিদ্র শ্রেণির সংলাপ বাস্তবানুগ হলেও, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের সংলাপে সংস্কৃতানুগ্য সংলাপ রচনায় লেখকের দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয়

আছে। কয়েকটি রোমান্টিক নাটক লিখেছেন যেগুলি সার্থক নয়। ব্যঙ্গারসে স্থূলতা সত্ত্বেও ব্যাঙ্গাত্মক প্রহসনগুলিতে বিশিষ্টতা আছে। সমাজের নিচু স্তরের মানুষদের চরিত্রায়ণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

৮১.১০ অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ১৯ পৃষ্ঠায় উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। অন্যথায় প্রাসঙ্গিক মূলপাঠ আবার পড়ে উত্তর ঠিক করুন।

(১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) নাটক আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু যে ——— ও ——— উদ্বোধন করে।

খ) নাটক জাতির —— ——।

গ) ব্যয়সাপেক্ষ আধুনিক —— থিয়েটারের —— অভিনয়ের —— ও —— আবেদন সেখানে সীমিত।

ঘ) বাংলা নাটক ইংরেজি ——— ও ——— অনুকরণ প্রয়াসী হলেও সম্পূর্ণ —— —— শিল্পকলার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ঙ) হরচন্দ্র ঘোষের নাটকের নাম—
এবং উমেশচন্দ্র মিত্রের নাটক।

২) নাটক একমতে 'চিত্ত রঞ্জনের উপাদান', অপর মতে 'জীবনের সমস্যা-সঙ্কট প্রকাশের' মাধ্যম, অন্যমতে 'সংগ্রামের হাতিয়ার'—তিনটি মত বিচার করে আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

৩) 'ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্যে নাটকের আদিমতম রূপের উল্লেখ আছে।'—মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দিন।

৪) সংস্কৃত নাটকের তিনজন প্রধান নাট্যকারের নাম উল্লেখ করুন।

৫) শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের মূল বক্তব্য উল্লেখ করুন।

৬) 'লোকনাট্য' কাকে বলে? বাংলা লোকনাট্যের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭) 'যাত্রাভিনয়' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

৮) মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৯) 'দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে নাট্যকারের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল'—নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৮১.১১ উত্তর সংকেত (অনুশীলনী—১, ২)

অনুশীলনী—১

১) (ক) এককটি পাঠ করে নাটকের সংজ্ঞা ও লক্ষণ জানা যায়।

(খ) বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানা যায়।

২) (ক) দর্পণ, (খ) মিশ্রকলা, পাঠ্য, অভিনেয়।
(গ) নাট্যকার, পাঠ করে, চরিত্র।
(ঘ) ট্র্যাজেডিকে, অনুকরণ, নাট্যক্রিয়ার।

৩) নাটকের সংজ্ঞা ও লক্ষণ (১.৩) অংশটি ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

৪) (ক) ১৮৫২, (খ) দীনবন্ধু মিত্র, (গ) গণনাট্য।

৫) নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের রচয়িতা 'ভরতমুনি'।
নাট্য শাস্ত্রানুসারে নাট্য শব্দের অর্থ নৃত্য, গীত ও বাদ্য-এর সমবায়। পরে এই তিনের সহযোগে অভিনয় অর্থে নাট্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী—২

১) (ক) জনজাগরণ, গণচেতনার
(খ) জীবনের, প্রতিচ্ছায়া
(গ) প্রসেনিয়ম, শিল্পিত, ভাষা, উপস্থাপনার
(ঘ) নাট্য সাহিত্য, নাট্যকলার, দেশজ, লোকায়ত
(ঙ) ভানুমতীচিত্তবিলাস, বিধবাবিবাহ নাটক

২) ১.৬ অংশে 'নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ' পর্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

৩) ১.৬ অংশে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রাসঙ্গিক আলোচনার সাহায্যে উত্তর করুন।

৪) শূদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি

৫) ১.৬ অংশের শেষ অনুচ্ছেদের সাহায্যে উত্তর তৈরী করুন।

৬) ১.৭ অংশের তৃতীয় অনুচ্ছেদ অবলম্বনে উত্তর করুন।

৭) ১.৭ অংশের শেষ চারটি অনুচ্ছেদের সাহায্যে উত্তর লিখুন।

৮) ১.৮ অংশের তৃতীয় অনুচ্ছেদ পড়ে উত্তর করুন।

৮১.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১) ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।

২) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস।

৩) ড. অজিত ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৪) ড. বৈদ্যনাথ শীল—বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা।

একক ৮২ ❐ দীনবন্ধু মিত্র ও তাঁর নীলদর্পণ

গঠন

৮২.১উদ্দেশ্য

৮২.২প্রস্তাবনা

৮২.৩দীনবন্ধু মিত্র ও তাঁর 'নীলদর্পণ'

৮২.৪সারাংশ

৮২.৫অনুশীলনী—১

৮২.৬নীলদর্পণ মূলপাঠ—১

৮২.৭সারাংশ

৮২.৮প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮২.৯মূলপাঠ—২ (নীলদর্পণ)

৮২.১০ সারাংশ

৮২.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮২.১২ মূলপাঠ—৩

৮২.১৩ সারাংশ

৮২.১৪ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮২.১৫ মূলপাঠ—৪ (নীলদর্পণ)

৮২.১৬ সারাংশ

৮২.১৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮২.১৮ নীলদর্পণ মূলপাঠ—৫

৮২.১৯ সারাংশ

৮২.২০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮২.২১ অনুশীলনী—২

৮২.২২ উত্তর সংকেত (অনুশীলনী—১.২)

৮২.২৩ গ্রন্থপঞ্জি

৮২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- উনিশ শতকের এমন একটি নাটকের পরিচয় পাবেন যা সমকালীন দেশকালের পরিচয় তুলে ধরেছে।
- নাটকটি পাঠ করে আপনি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নীলকরদের অত্যাচার এবং পরিণতিতে নীল বিদ্রোহের পরিচয় পাবেন।
- পঠিত নাটকটি সমকালে অনুরূপ কয়েকটি নাটক রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে।
- নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের এমন একটি নাটকের সঙ্গে আপনি পরিচিত হবেন, যেটি তাঁর প্রথম নাটক রচনা হলেও, বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনায় শুধু অভিনব নয়, যুগান্তকারী।
- নাটকটি পাঠ করে আপনি নাট্যকারের কৃতির পরিচয় পাবেন। লক্ষ করবেন, একটি সমসাময়িক ঘটনাকে চিরন্তন বন্ধনে আবদ্ধ করতে হলে, তাকে কেমনভাবে একটি শাশ্বত জীবন-সমস্যা বা অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হয়—যা চিরন্তন সর্ব দেশে ও কালে এবং অপরিবর্তনীয়।

৮২.২ প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ের প্রথম এককটিতে আপনি নাটক, নাটকের উৎস ও আদিযুগের কয়েকজন নাট্যকারের সাধারণ পরিচয় জেনেছেন। বর্তমান এককে আপনি দীনবন্ধু মিত্রের এমন একটি নাটকের সঙ্গে পরিচিত হবেন, যে নাটক শিল্পগুণে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ না হলেও দেশের সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহকে বিষয়বস্তু করে পরিবেশন করা হয়েছে। একসময় উদ্ভিজ্জ উপাদান থেকে নীল রং তৈরী প্রচলন ছিল। এদেশে নীলের আবাদ ও নীল রং তৈরী করা লাভজনক হওয়ায় নীলকররা জমির মালিক ও কৃষকদের বলপূর্বক দাদন দিয়ে, ফসলের প্রাপ্য মূল্য থেকে শুধু বঞ্চিতই নয়, নানারকম উৎপীড়ন করতেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের পটভূমিকায় এই বাস্তব ঘটনা বিদ্যমান। নাটকটি সে যুগ তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রচনাটির গুরুত্ব সমধিক। সাহিত্যিক মূল্য কিঞ্চিৎ ন্যূন হলেও সমাজ মানসের অভীপ্সা পূরণে সক্ষম হওয়ায় নাটকটি স্মরণীয় হয়ে আছে।

দীনবন্ধুর জীবনবৃত্তান্ত ও নাটক পড়ে আপনি সমকালে রচিত অন্যান্য নাটকের পাশাপাশি তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকের সাহিত্যমূল্যের সঙ্গে নাটকটির রাজনৈতিক সামাজিক গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। এই নাটক পাঠের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে বাংলাদেশের কৃষকের দুরবস্থার পরিচয়, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী হিসেবে দীনবন্ধুর অবদান উপলব্ধি করবেন।

৮২.৩ দীনবন্ধু মিত্র ও তাঁর 'নীল-দর্পণ'

দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম (ইং ১৮৩০ ; সাল ১২৩৬) নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে। যমুনা নদী গ্রামটিকে চতুর্দিকে বেষ্টন করে থাকায় নাম হয়েছে চৌবেড়িয়া। দীনবন্ধুর পিতা কালাচাঁদ মিত্র। গন্ধর্বনারায়ণ তাঁর পিতৃদত্ত নাম। গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করে, মাত্র দশ বৎসর বয়সে জমিদারী সেরেস্তায় ৮ টাকা বেতনে কাজে নিযুক্ত হন। লেখাপড়ার প্রতি ঝোঁক থাকায় পাঁচবছর পর উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় কোলকাতায় চলে আসেন। সেখানে পিতৃব্য নীলমণি মিত্রের বাসায় বাসনমাজা ও অন্যান্য কাজের বিনিময়ে আশ্রয় পান। দীনবন্ধু এই নামে তিনি লঙ্ সাহেবের অবৈতনিক স্কুল থেকে ১৮৫০-এর শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাশ করেন। অতঃপর হিন্দু কলেজে ভর্তি হন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। হিন্দু কলেজের জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষা না দিয়েই তিনি ১৫০ টাকা বেতনে পাটনায় পোস্টমাস্টার পদে যোগ দেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ডাকবিভাগের পরিদর্শক পদে উন্নীত হন। এসময় তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নানা জায়গায় এবং ১৮৭০-এ লুসাই যুদ্ধের সময় ডাক ব্যবস্থা তদারকির জন্য কাছাড়ে যান। যুদ্ধ চলাকালে সুষ্ঠু ডাক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ভারত সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন (১৮৭১)। বছর খানেক তিনি কোলকাতায় পোস্টমাস্টার জেনারেলের সহকারী ছিলেন (১৮৬৯-৭০)। সর্বত্র দক্ষতার পরিচয় দিলেও ডাকবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের বিরাগভাজন হওয়ায় তিনি অপমানিত হন এবং ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের পরিদর্শক পদে যোগ দেন (১৮৭২)। সরকারী কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে যায় ও ১৮৭৩-এর ১লা নভেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু হয়।

কলেজ জীবনে দীনবন্ধু 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা লিখতেন এবং এই সূত্রে তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। গুপ্ত কবির প্রেরণায় 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়াও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। সৃষ্টিশীল এই সব রচনার সঙ্গে সরকারী কাজে গ্রাম শহরে পরিভ্রমণ সূত্রে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, নাটকের চরিত্র সৃষ্টির কাজে সাহায্য করেছিল। সমকালীন অনেক ঘটনা ও ব্যক্তিজীবনের বহুবিধ অসঙ্গতি দীনবন্ধুর নাটকের উপজীব্য হয়েছে। তাই কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হলেও নাটকেই তাঁর যথার্থ সিদ্ধি। তাঁর প্রথম নাটকে (নীলদর্পণ) তিনি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। নাটকটি সৌখীন মঞ্চ থেকে সাধারণ রঙ্গামঞ্চে সগৌরবে বহুবার অভিনীত হয়েছে।

'নীলদর্পণ' নাটকটির ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। বাংলাদেশের উর্বরা জমি নীলচাষের অনুকূল। বাংলার গ্রামে গ্রামে ইংরেজরা কুঠি স্থাপন করে নীলচাষ শুরু করেন ও এর থেকে প্রভূত অর্থ মুনাফা করতেন। নীলচাষে অনিচ্ছুক চাষীদের নীলচাষে বাধ্য করবার জন্য নানারকম উৎপীড়ন করা শুরু হোল। এই পীড়ন সবচেয়ে বেশী হয়েছে নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগণা, ফরিদপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়। সেখানে নীলকরদের অত্যাচার সীমাহীন নৃশংসতা ও বর্বরতার পর্যায়ে পৌঁছায়। কৃষকদের বলপূর্বক দাদন দিয়ে ধানী জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করা হোত। চাষীরা এর প্রতিবাদ করলে তাদের কুঠির

লাঠিয়ালের সাহায্যে ধরে এনে নির্মম অত্যাচার করা হোত। 'শ্যামচাঁদ' এবং 'রামকান্ত' নামক চাবুকের আঘাতে অনিচ্ছুক চাষীকে প্রহার করে ক্ষত বিক্ষত করা হোত। অসহায় কৃষককূল আদালতে বিচার প্রার্থনা করেও ইংরেজ বিচারকের কাছ থেকে কোন ফল পেত না। অনেক কৃষককে দূরান্তের কোন কুঠিতে চালান দিয়ে, অন্ধকার ঘরে আটক রাখা হোত। কৃষকের স্ত্রী-কন্যাদের জৈবিক প্রকৃতির আগুনে পুড়িয়ে বর্বরতার পরিচয় দিতে দ্বিধা করতো না। ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার কল্পিত ঘটনা নয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হরমণির কাহিনি তার সাক্ষ্য।

নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। বিশ্বনাথ সর্দার ওরফে বিশে ডাকাত নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধরে বিচারের প্রহসন করে ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু এতেও আন্দোলন থামেনি। চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, পোড়াগাছার দিগম্বর বিশ্বাস নীলচাষীদের সংগঠিত করেন। নীলকররা এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সমস্ত রকম পীড়ন জারি রাখে—আগুনে গ্রাম গ্রামান্তরের বাড়ীঘর পোড়ানো, নরহত্যা, নারীধর্ষণ ও লুঠ-তরাজ করে নারকীয় পরিস্থিতি তৈরী করে।

বাংলার গ্রামে গঞ্জে নীলকরদের সদম্ভ বিচরণের কালে যে অগণিত মানুষ শোষণ-পীড়নের শিকার হয়েছে, তারই বাস্তবসম্মত চিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে প্রতিফলিত। বলা যেতে পারে বাংলার এক দুর্যোগপূর্ণ ইতিহাসের নিষ্ঠুর নির্মম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নীলদর্পণ নাটকটি রচিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাই নাটকটিকে অমরতার গৌরব দান করেছে। নাটকের যত দোষ ত্রুটি থাকুক না কেন, এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য নাটকটিকে মহিমান্বিত করেছে।

৮২.৪ সারাংশ

দীনবন্ধু মিত্র ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কালাচাঁদ মিত্র। তাঁর পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে কোলকাতার লঙ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে, পরে হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে পড়েন। ১৮৫৫ খ্রীঃ ডাকবিভাগে চাকুরী নিয়ে পাটনায় যান, পরে ডাকবিভাগের পরিদর্শকের পদে উন্নীত হন। চাকুরী সূত্রে তাঁকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এমনকি আসামের কাছারেও যেতে হয়েছে। ব্যাপক পরিভ্রমণের ফলে বহু লোকের সংস্পর্শে আসেন, ফলে লোকচরিত্র সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৮৭২ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেন। ১৮৭৩ সালের ১লা নভেম্বর তাঁর দেহান্ত ঘটে।

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রকাশ ১৮৬০ খ্রীঃ। এই নাটকটি সৌখিন ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে। নীলচাষকে কেন্দ্র করে ইংরেজ কুঠিয়ালদের সীমাহীন অত্যাচার ও তার পরিণতিতে পীড়িত মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটি রচিত। নাটক রচনা ও প্রকাশের সময় দীনবন্ধু সরকারী চাকরী করতেন। তাই নিজের নাম ব্যবহার না করে 'কস্যচিৎ পথিকস্য' নামে প্রকাশ করেন। মধুসূদন দত্ত 'A Native' ছদ্মনামে 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজি অনুবাদ করলে সেটির মুদ্রাকর

সি. এইচ. মানুয়েলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হলে রেভারেন্ড লঙ্ নিজেকে প্রকাশক ঘোষণা করেন। তাঁর কারাদন্ড ও হাজার টাকা জরিমানা হয়। 'নীলদর্পণ' এদিক থেকেও ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

বাংলার দুর্যোগপূর্ণ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে 'নীলদর্পণ' নাটকটি রচিত, তাই নাটকের কিছু দোষত্রুটি সত্ত্বেও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য রচনাটিকে মহিমান্বিত করেছে।

৮২.৫ অনুশীলনী—১

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৯৫ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। অন্যথায় প্রাসঙ্গিক অংশগুলি আর একবার পড়ে সঠিক উত্তর করতে সচেষ্ট করুন।

(১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) (নীলদর্পণ) নাটকটিকে বলা যেতে পারে —— নাটক —— নাটক।

(খ) দীনবন্ধু মিত্রের পিতা —— ——, তার পিতৃদত্ত নাম ——।

(গ) কলেজ জীবনে দীনবন্ধু ——— কবিতা লিখতেন।

(ঘ) দীনবন্ধু মিত্রের ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন সম্পকে সংক্ষেপে পরিচয় দিন।

৮২.৬ নীল-দর্পণ মূলপাঠ—১

নীল-দর্পণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর—গোলোকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক

(গোলোকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন)

সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম, কর্তা মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসী হলে খাটে।

গোলাক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্তারা যে জমিজমা কর্য়ে গিয়াছেন, তাতে কখন পরের চাকরিস্বীকার করিতে হয় নি। যে ধান জন্মায়, তাতে সংবৎসরের খোরাক হয়, অতিথি সেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায় ; যে সরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০/৭০ টাকার বিক্রি হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কে-ই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়েছে, গাঁতিও যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয় নি সাহেব পত্তনি নিয়েছে, এর মধ্যে গাঁথান ছারক্ষার কর্য্যে তুলেছে। দক্ষিণপাড়ার মোড়লবাড়ির দিকে চাওয়া যায় না, আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দুবেলায় ৬০ খান পাত পড়তো, ১০ খান লাঙ্গাল ছিল, দামড়াও ৪০/৫০ টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ! আহা যখন আসধানের পালা সাজাতো, বোধ হতো যেন চন্দনবিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল ; উহাদের খালাস কর্য্যে আনতে কত কষ্ট ; হাল, গোরু বিক্রি হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁ-ছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আনতে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষা করে খাব, তবু ও গাঁয়ে আর বাস করবো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুইখান লাঙ্গাল রেখেছে, তা নীলের জমিতেই যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে। কর্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গতবারে আপনার ধান গিয়াছে, এইবারে মান যাবে।

গোলক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে চাষ দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল করবে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো। আর সাহেব বেটা বলেছে, যদি পূর্বমাঠের ধানি জমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড়বাবু না কুটি গিয়েছেন?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় লয়ে গিয়াছে।

সাধু। বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সে দিনে সাহেব বল্লে "যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ি উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।" তাহাতে বড়বাবু কহিলেন, "আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ি কি ছার!"

গোলোক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ দেখি, ৫০ বিঘা ধান হইলে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাকতো! তাই যদি নীলের দামগুলো চুকিয়ে দেয়, তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

[নবীনমাধবের প্রবেশ]

কি বাবা কি করে এলে?

নবীন। আজ্ঞে জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন,

৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়ে দেওয়া যাবে।

গোলোক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হলো অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না! অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব, আমাদিগের লোকজন লাঙ্গাল গোরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমাদিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।"

সাধু। যারা পেটভাতায় চাকরি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গাল প্রায় ছেড়ে দিয়াছি, তবু তো নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাজে কাজেই কত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন, আমি সেইরূপ করিব। কিন্তু আমার মানস, একবার মোকদ্দমা করা।

[আদুরীর প্রবেশ]

আদুরী। মাঠাকুরুণ যে বক্‌তি লেগেচে, কত বেলা হলো, আপনারা নাবা খাবা করবেন না? ভাত শুকিয়ে যে চাল হইয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়াইয়া) কর্তা মহাশয়, এর একটা বিলি ব্যবস্থা করুন নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গালে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি শিকের উঠবে। আমি আসি, কর্তা মহাশয় অবধান, বড়বাবু নমস্কার করি গো।

[সাধুচরণের প্রস্থান]

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার করিতে দেন, এমত বোধ হয় না, যাও বাবা, স্নান কর গে।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের বাড়ি

(লাঙ্গাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। (লাঙ্গাল রাখিয়া) আমিন সুমুন্দি য্যান বাগ্, যে রোক করে মোর দিকি আসচিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা কোন মতেই শোন্‌লে না। জোর করিই দাগ মারলে। সাঁপোলতলার ৫ কুড়ো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল, তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়াব কি? কাঁদাকাটি কর‍্যে দ্যাকবো, যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাজিই দ্যাশ্ ছাড়ে যাব।

[ক্ষেত্রমণির প্রবেশ]

দাদা বাড়ি এয়েচে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ি গিয়েছে, আলেন, আর দেরি নাই। কাকিমারে দেখ্‌তি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্ দিনি খাই, তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গ্যাল। সুমুন্দিরি অ্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতেই শোন্‌লে না।

[সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান]

সাধু। রাইচরণ, এত সকালে যে বাড়ি এলি?

রাই। দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা, জমি তো না য্যান সোনার চাঁপা। এক কোণ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম। খাব কি, ছ্যালেপিলে খাবে কি, এতডা পারিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে, ও মা! রাত পোয়ালি যে দু কাটা চালের খরচ, না খাতি পেয়ে মর্‌বো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়াকপাল, গোডার নীলি কল্লে কি? অ্যাঁ! অ্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে করবো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা ফেনা আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারিকিতি বা কখন করবো। তুই কাঁদিস নে, কাল হাল গরু বেচে গাঁর মুখে ঝ্যাঁটা মেরে বসন্তবাবুর জমিদারিতে পাল্‌য়ে যাব।

[ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ]

জল খা, জল খা, ভয় কি, জীব দিয়েচে যে, আহার দেবে সে। তা তুই আমিনকে কি বলে এলি?

রাই। মুই বলবো কি, জমিতে দাগ মার্‌তি নাগ্‌লো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়্‌য়ে দিতি নাগ্‌লো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম, তা কিছুই শোন্‌লে না। বলে, যা তোর বড়বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা, মুই ফোজদুরি করবো বল্যে সেঁস্‌য়ে এইচি। (আমিনকে দূরে দেখিয়া) ঐ দ্যাগ শ্যালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে করে এনেচে, কুটি ধর্‌য়ে নিয়ে যাবে।

[আমিন এবং দুইজন পেয়াদার প্রবেশ]

আমিন। বাঁদ্, রেয়ে শালাকে বাঁদ্। (পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন)

রেবতী। ও মা, ই কি, হ্যাঁগা বাঁদো ক্যান্? কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ। (সাধুর প্রতি) তুমি দেঁড়্‌য়ে দ্যাক্‌চো কি, বাবুদের বাড়ি যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো!

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম নয়। ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখাপড়া জানিস, তোকে খাতায় দস্তখৎ কর্‌য়ে দিয়ে আসতে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়! একে কি নীলের দাদন বলো, নীলের গাদন বল্লে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে আছ, যে ঘার ভয়ে পাল্‌য়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়লাম। পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল, তা হাবাতেও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর হলো।

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বগত) এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেশকারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব—মালটা ভাল, দেখা যাক্।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা। [ক্ষেত্রমণির প্রস্থান]

আমিন। চল্ সাধু, এই বেলা যানে মানে কুটি চল। [যাইতে অগ্রসর হইল]

রেবতী। ও যে এট্টু জল খ্যাতি চেয়েলো, ও আমিনমশাই তোমার কি মাগ ছেলে নেই, কেবল লাঙ্গাল রেখেছে আর এই মারপিট। ও মা ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দুবার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, সে যে অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যেই কাতর, এখনো চকি জল পড়্‌চে, মুখ শুইকে গেছে—কি করবো, কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায়, হায়. হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম (ক্রন্দন)।

আমিন। আরে মাগী, তোর নাকিসুর এখন রাখ, জল দিতে হয় তো দে, নয় ওমনি নিয়ে যাই।

[রাইচরণের জলপান ও সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটি, বড় বাঙ্গালার বারেন্দা

(আই, আই, উড সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ)

গোপী। হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজপত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্র দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে।

উড। তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। স্বরপুর, শামনগর, শান্তিঘাটা এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামাচাঁদ বেগোর তোম্ দোরস্ত হোগা নেই।

গোপী। ধর্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুটির কতকগুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন করে্য শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাঠিয়াল, শুড়কি-ওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো—তুমি দেখি নি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি, জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতিকা বাত হাম কুচ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্কিছাড়া আমারে কিছু বলি নি—তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েট্‌কা হায় নেই বাবা—তোমকো জুতি মারকে নেকাল ডেকে হাম্ এক আদ্‌মি ক্যাওটকো এ কাম দেগা।

গোপী। ধর্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙে নীল করিবার জন্য এবং গোলোক বসের সাতপুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কাজ করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি চামারেও পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করে যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুক্‌য়ে—চায় ওস্‌কো হাম্ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কো হিসাব দোরস্ত করকে রাখ—বাঞ্চৎ বড়া মাম্‌লাবাজ, হাম্ দেখেগা শালা কেস্তারে রূপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্মাবতার, ঐ একজন কুটির প্রধান শত্রু। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না, যদি নবীন বস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকিল মোক্তারদিগের এমন সলাপরামর্শ দিয়াছিল যে, তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, "নবীন বাবু, সাহেবের বিরুধ্বাচারণ করো না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই।" তাতে বেটা উত্তর দিল, "গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব, আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।" বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি যোটাযোট করিতেছে, তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম বোলা কি নেই, তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোম্‌ছে কাম্ হোগা নেই।

গোপী। হুজুর, ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করেছি, তখন ভয়, লজ্জা, শরম মান, মর্যাদার মাথা খাইয়াছি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।

উড। আমি কথা চাইনে, আমি কাজ চাই।

[সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম করিতে করিতে প্রবেশ]

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্মাবতার, নীলের বিরুধ্বাচরণ করি নাই, করিতেছি না, এবং করিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি নীল করিছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে, আদ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাজেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাজেই চটতে হয়। তা আমার চটায় আমিই মরবো, হুজুরের কি!

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড়বাবুর গুদামে কয়েদ কর্য়ে রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ কর্‌বো, প্রবলপ্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ, চাসার মুখে ভাল শুনায় না, গায়ে যেন ঝাটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গাল ঠেলে, উনি বলেন "প্রতাপশালী—"

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদরনায়েব।—ধর্মাবতার! পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাসালোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবরণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্মাবতার, যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান্ শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! (প্রকাশ্যে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গাল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও ৯ বিঘা আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাকবে, তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতা প্রহার), শ্যামচাঁদকা সাৎ মালাকাৎ হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা। (দেয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই ছুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে; ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিন্‌ডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারি করলিনে? (কান মলন)

—রাই। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চৎকো (শ্যামচাঁদাঘাত)

[নবীনমাধবের প্রবেশ]

রাই! বড়বাবু, মলাম গো! জল খাব গো! মেরে ফ্যাল্লে গো।

নবীন। ধর্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখন বাসী মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন তবে আপনার নীল বুনবে কে? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে ৪ বিঘা নীল দিয়াছে। যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক অছে?—সাধু ঘোষ, তোর মত কি তা বল? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভাল ২ চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খান ভাল জমি ছিল তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি বিনা দাদনে নীল কর্য্যে দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে, হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান (শ্যামচাঁদ প্রহার)।

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ) হুজুর, গরিব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা! উহার বাড়িতে খাইতে অনেকগুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে, সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড। চপরাও, শালা, বাঞ্চৎ, পাজি, গোরুখোর। এ আর অমর নগরের ম্যাজিস্ট্রেট নয় যে কথায় কথায় নালিশ কর্‌বি, আর কুটির লোক ধর্য্যে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিস্ট্রেট তোমার হইয়াছে। র‍্যাসকেল—এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবী! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মেধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাতঃ।

গোপী। নবীন বাবু, বাড়াবাড়ি কাজ কি, আপনি বাড়ি যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক। [নবীনমাধবের প্রস্থান]

উড। গোলামকি গোলাম! দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও।

[উডের প্রস্থান]

গোপী। চল সাধু, দপ্তরখানায় চল। সাহেব কি কথায় ভোলে।

বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই।।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান

(সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ি বিনাইতে নিযুক্ত)

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ি একগাছিও হয় নি। ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বয়ের নাম কর্য্যে যা করি তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট করেছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে। যেমন একঢাল চুল তেমনি দড়ি হয়েছে। আহা চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্বদাই হাস্যবদন। লোকে বলে যা-কে যায় দেখতে পারে না, আমি তো তার কিছুই দেখি নে। ছোটবয়ের মুখ দেখলে আমার তো বুক জুড়য়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে!

[শিকাহস্তে সরলতার প্রবেশ]

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি শিকের তলাটি বুন্‌তে পেরেছি কি না!—হয়নি?

সৈরিন্ধ্রী। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ, এইবার দিব্বি হয়েছে। ও বোন্ এই খান্‌টি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার শিকে দেখে বুন্‌ছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না, তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুরয়ে গেছে, তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্যন্ত তর সইল না। তোমার বোন্ সকলি তাড়াতাড়ি, বলে

বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি।।

সর। বাহবা—আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গেলহাটে মহাশয়কে আনতে বলেছিলেন, তা তিনি পান নি।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিঠি লিখিবেন সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বলবো।

সর। দিদি এ মাসের আর কদিন আছে গা—

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কালেজ বন্দ হলে বাড়ি আস্‌বের কথা আছে—তাই তুমি দিন গুনচো—আর বোন্, মনের কথা বের্‌য়ে পড়েছে!

সর। মাইরি দিদি, আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করি নি—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র, কি মধুমাখা কথা! ওঁরা যখন ঠাকুরপোর চিটিগুলিন পড়েন

যেন অমৃত বর্ষণ হইতে থাকে! দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখিনি। দাদারি বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখান পাঁচ হাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো তেমনি ছোট বউ - (সরলতার গাল টিপে) সরলতা তো সরলতা—আমি কি তামাক-পোড়ার কটোটা আনিনি, যেমন একদন্ড তামাকপোড়া নইলে বাঁচি নে তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসেছি।

[আদুরীর প্রবেশ]

ও আদর, তামাকপোড়ার কটোটা আন্ না দিদি।

আদুরী। মুই অ্যাকন কনে খুঁজে মর্‌বো?

সৈরি। ওরে, রান্নাঘরের রকে উঠ্‌তে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে খামাত্তে মইখানি আনি, তা নলি চালে ওটবো ক্যামন কর‍্যে।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন, ও তো ঠাকুরুণের কথা বেশ বুঝতে পারে? তুই রক কারে বলে জানিস নে, তুই ডান বুঝিস নে?

আদুরী। মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান। মোগার কপালের দোষ, গোরিব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো আর দাঁত পড়লো, তবেই সে ডান হয়ে ওটলো। মা ঠাকুরুণিরি বলবো দিনি, মুইকি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করিয়া) ছোট বউ বসিস, আমি আস্‌চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুন্‌বো।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান]

আদুরী। সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা—নাকি দুটো দল হয়েছে, মুই আজাদের দলে।

সর। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্‌তো?

আদুরী। ছোট হালদার্নি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস নে! মিন্‌সের মুখখান মনে পড়লি আজো মোর পরাণডা ডুকরে ক্যাঁদে ওটে। মোরে বড্‌ডি ভালবাসতো। মোরে বাউ দিতি চেয়েলো।

পুঁইচে কি এত ভারি বে প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারি।
মনের মত হলি পরে বাউ পরাতি পারি।।

দেখাদিনি খাটে কি না, মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বল্‌তো, "ও পরান, ঘুমুলে।"

সর। তুই ভাতারের নাম ধরে ডাক্‌তিস্!

আদুরী। ছি, ছি, ছি, ভাতার যে গুরুলোক, নাম ধত্তি আছে?

সর। তবে তুই কি বল্যে ডাকতিস?

আদুরী। মুই বল্‌তাম, হ্যাদে ওয়ো শোন্‌চো—

[সৈরিন্ধ্রীর পুনঃপ্রবেশ]

সৈরি। আবার পাগলীকে কে খ্যাপালে?

আদুরী। মোর মিন্‌সের কথা সুদুচ্চেন তাই মুখ বল্‌তি লেগিচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট বয়ের মত পাগল আর দুটি নাই, এত জিনিস থাক্‌তে আদুরীর ভাতারের গল্প ঘাঁটিয়ে শোনা হচ্চে।

[রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ]

আয় ঘোষদিদি আয়, তোকে আজ ক দিন ডেকে পাঠাচ্চি, তো তোর আর বার হয় না। ছোট বউ এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ ক দিন আমারে পাগল করেছে, বলে—দিদি, ঘোষদের ক্ষেত্র শ্বশুর বাড়ি হতে এসেছে তা আমাদের বাড়ি এল না?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এম্‌নি কের্‌পা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকিমাদ্দের পর্‌ণাম কর। (ক্ষেত্রমণির প্রণাম)

সৈরি। জন্মায়তি হও, পাকাচুলে সিঁদুর পর, হাতে না ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুড়বাড়ি যাও।

আদুরী। মোর কাছে ছোট হালদার্নির মুখি খোই ফুট্‌তি থাকে, মেয়েড়া গড় কল্লে, তা বাঁচো মরো একটা কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই, ষেটের বাছা—আদুরী, যা ঠাকুরণকে ডেকে আন্‌গে। [আদুরিষ প্রস্থান]

পোড়াকপালি কি বলিতে কি বলে তা কিছু বোঝে না,—ক মাস হলো?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পর্‌কাশ করিছি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি, কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো? তোমরা আপনার জন তাই বলি—এই মাসের কডা দিন গেলি চার মাসে পড়্‌বে।

সর। আজো পেট বেরোয় নি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পুবি নি, ও এখনি পেট ডাগর হইয়াছে কি না তাই দেখ্‌চে।

সর। ক্ষেত্র, তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো, ঠাক্‌রুণিরি বল্লে ঝাপটা কাটা কস্‌বিদের আর বড়নোকের মেয়েগার সাজে। মুই শুনে নজ্জায় মর্‌যে গ্যালাম, সেই দিনি ঝাপটা তুলে ফ্যাল্‌লাম।

সৈরি। ছোট বউ, যাও দিদি কাপড়গুনো তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলো।

[আদুরীর পুনঃপ্রবেশ]

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আদুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী। ছোট হালদার আগে বাড়িই আসুক, হা, হা, হা, হা। [সরলতার জিব কেটে প্রস্থান।]

সৈরি (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা—ঠাকুরুণ কই লো—

[সাবিত্রীর প্রবেশ]

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবউ এইচিস্, তোর মেয়ে এনিচিস্ বেশ করিচিস্—বিপিন আবদার নিচলো তাকে শান্ত কর্য়ে বাইরে দিয়া এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ পর্‌ণাম করি। ক্ষেত্র তোর দিদিমারে পরণাম কর। [ক্ষেত্রমণির প্রণাম]

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে কাশি) বড় বউ মা ঘরে যাও, বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে—আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে "আদুরী") মা যাও গো জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি। (জনান্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী দেখ, তোরে ডাক্‌চে।

আদুরী। ডাক্‌চেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ার মুখ—ঘোষদিদি আর একদিন আসিস।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান]

রেবতী। মাঠাকুরণ, আর তো এখানে কেউ নেই—মুই তো বড় আপদে পড়িছি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম রাম রাম, ও নচ্ছার, বেটীকেও কেউ বাড়ী আস্‌তে দেয়—বেটীর আর বাকি আছে কি, নাম লেখানেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই করবো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মর্‌দেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি আর হাট বল্লিই বা কি—গস্তানি বিট বলে কি—মা মোর গাডা কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে—বিটী বলে, ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েচে, আর তার সঙ্গে একবার কট্টিব কামরাঙ্গার ঘরে যাতি বলেছে।

আদুরী। থু, থু, থু!—গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!—সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু থু! প্যাজির গোন্দো!—মুই তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারিনে—থু, থু, গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গোরিবের ধর্ম কি ধর্ম নয়? বিটী বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম কর্য়ে দেবে—পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম কি ব্যাচ্‌বার জিনিস, না এর দাম আছে। কি বল্‌বো, বিটী সাহেবের নোক, তা নইলি মেয়েনাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক হয়েছে, কাল থেকে ঝম্‌কে ২ ওট্‌চে।

আদুরী। মাগো, যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাকা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়লি মুইতো কখনুই যাতি পার্‌বো না, থু, থু, থু! গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা সর্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেট্য়ে দিস, তবে নেটেলা দিয়ে ধর্য়ে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুল্লুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা, চাসার ঘরে সব পারে। মেয়েলোক ধরে মরদ্‌দের কায়দা করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চানি বল্যে ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধর্য়ে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে অ্যাকিই নীলির ঘায় লাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বসবে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কত্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বলবো, তোমার কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই—কি সর্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেব না, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

রেবতী। ময়রাণী বিটী আর এক কথা বল্যে গ্যাল, তা বুঝি বড়বাবু শুনিন্‌নি—কি একটা নতুন হুকুম হয়েছে, তাতে নাকি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক্ সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ দিতি পারে। তা কর্তা মশাইরি নাকি এই ফাঁদে ফ্যালবার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বল্যে গ্যাল, তা কি আমি বুঝ্‌তি পারি, নাকি এ ম্যাদের পিল্ হয় না।

আদুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেটপোড়া খেব্‌য়েচে।

সাবি। আদুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দমা পাকাবার জন্যি ম্যাচেরটক্ সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম নাকি বড়্‌ডো শোনে।

আদুরী। বিবিরি আমি দেখিছি, নজ্জাও নেই, শরমও সেই—জ্যালার হাকিম মাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গা পাক্‌ড়ি, তেরোনাল ফির্‌তি থাকে, মা গো, নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মান্‌সি ঘোড়া চাপে!—কেশের কাকি ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেঁসে কথা কয়েলো, ভাই নোকে কত নজ্জা দেলে, এতো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগী কোন্ দিন মজাবি দেক্‌চি। তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ তোরা বাড়ী যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলুবাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে যাব, তবে সাজ জ্বলবে।

[রেবতী ও ক্ষেত্রমনির প্রস্থান]

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না।

[সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ]

আদুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

(সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন)

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল লা, আমার সোনার বউ, আমার রাজলক্ষ্মী। (পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্যাঁগা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই—তুমি কি এক জায়গায় ১ দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে পার না—এমন পাগ্‌লীর পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল—কাপড়ডায় ফালা দিলে কেমন করে, তবে বোধ করি গায়েও ছড় গিয়েছে—আহা! মার আমার রক্তকমলের মত রং, একটু ছড় লেগেছে যেন রক্ত ফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন কর্য্যে যাওয়া আসা করো না।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ]

সৈরি। আয় ছোটবউ ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, দুই যায়ে এই বেলা থাকতে ২ গা ধুয়ে এস। [সকলের প্রস্থান।]

৮২.৭ সারাংশ

গ্রামের নাম স্বরপুর। গোলোকচন্দ্র বসু গ্রামের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবার। তাঁর স্ত্রীর সাবিত্রী পতিব্রতা, আদর্শ গৃহিনী। তাঁর দুই ছেলে নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব। পুত্রদ্বয় বিবাহিত—তাঁদের স্ত্রী সৈরিন্ধ্রী ও সরলতা। জ্যেষ্ঠ নবীন পরোপকারী—সহৃদয় ও বলিষ্ঠ প্রকৃতির মানুষ—গ্রামেই থাকেন, বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করেন। ছোট বিন্দুমাধব কোলকাতায় কলেজে পড়ে।

সাধুচরণ ও রাইচরণ দুই ভাই—গোলোকের অনুগত প্রতিবেশী রায়ত। রেবতী সাধুচরণের স্ত্রী, ক্ষেত্রমণি তাদের একমাত্র সন্তান—সে বিবাহিতা।

স্বরপুরের অদূরে বেগুনবেড়ের নীলকুঠী। আই. আই. উড ও পি. পি. রোগ দুই ইংরেজ কুঠির মালিক। তারা সরকারের কাছ থেকে পত্তনি নিয়ে দেশীয় দেওয়ান, আমিন ও পেয়াদাদের সাহায্যে আশপাশের গ্রামের জোতদার গাঁতিদার ও প্রজাদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালাচ্ছে। মুনাফার লোভে, কর্মচারীদের সাহায্যে প্রজাদের ভাল ভাল জমি চিহ্নিত করে সামান্য দাদন দিয়ে নীলচাষে বাধ্য করছে। বিপন্ন প্রজারা নীলচাষে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগাল ও নির্মমভাবে চামড়ার চাবুক 'শ্যামকান্ত' দিয়ে প্রহারে জর্জরিত করে, কুঠির অন্ধকার গুদামে আটকে রাখে।

স্বরপুর গ্রামের গরীব চাষীদের উপর নীলচাষের জন্য জুলুম ও নিপীড়ন করলে নবীনমাধব তাদের সাহায্য করেন। এজন্য বসু পরিবারের প্রতি নীলকরদের চরম আক্রোশ। বসু পরিবারকে বিগত বছর ৫০ বিঘা জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করলে, তাঁদের পাওনা মিটিয়ে দেয়নি, পরন্তু এবছর ৬০ বিঘা জমিতে নীল চাষের জন্য চাপ দেয়। এ অবস্থায় বসু পরিবারকে প্রায় অনাহারে কাটাতে হবে, শত অনুনয় বিনয়েও কোন ফল হয়নি। বরং অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

সাধুচরণ রাইচরণ সঙ্গতিপন্ন কৃষক পরিবার। রাইচরণ সাধুকে জানায় তাদের সবচেয়ে ভাল জমিতে নীলকরের আমিন দাগ দিয়েছে। এ জমি তো জমি নয় সোনার চাঁপা। এ জমি গেলে সম্বচ্ছরের খাওয়া চলবে কি করে? রাইচরণ আমিনকে বাধা দেওয়ায় পেয়াদা নিয়ে এসে তাদের দু-ভাইকে ধরে নিয়ে যায়। সাধুর মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে দেখে তাকে ছোট সাহেবকে উপঢৌকন দেবে ঠিক করে। সে ইতোমধ্যে তার বোনকে উপহার দিয়ে পেস্কারি পেয়েছে।

সাধু ছোট সাহেবের কাছে শত অনুনয় করেও কোন ফল পেল না। প্রত্যুত্তরে তার ওপর নির্যাতন শুরু হোল। নবীনমাধব তাদের পক্ষে সুপারিশ করলে, উড অশিষ্ট ভাষায় অপমানিত করেন। গোপীনাথ নবীনকে বলে, 'আপনি বাড়ী যান। বসুদের পারিবারিক জীবন সুখের, শাশুড়ীর সঙ্গে পুত্রবধূদের সম্পর্ক মধুর। দাসী আদুরীর কথাবার্তা প্রীতি রসসিক্ত। সাধুর স্ত্রী রেবতী এসে জানায় পদী ময়রাণী জানিয়েছে ছোট সাহেব ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে যেতে বলেছে, শুনে ক্ষেত্র ঝম্‌কে ঝম্‌কে (চম্‌কে চম্‌কে) উঠছে! শুনে আদুরী বলে সাহেবের মুখে 'প্যাঁজির গোন্দা' মুই সব সইতি পারি, প্যাঁজি গোন্দা সইতে পারি নে।" রেবতী আরও জানায় কুঠীর সাহেবেরা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যোগসাজসে কর্তামশায়ের দু মাসের জেলের ব্যবস্থা করেছে। সাবিত্রীর এ সব শুনতে ভাল লাগছিল না, তাই রেবতীকে বিদায় দিলেন।

৮২.৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রীক নাট্যশাস্ত্রী অ্যারিস্টটল নাটকের গঠন বিন্যাস প্রসঙ্গে চারটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। পর্যায়গুলি হোল ঃ প্রথম, প্রবেশক (Protasis) সংস্কৃত নাটকে একেই বলা হয় মুখসন্ধি, দ্বিতীয়, ঘটনার বিকাশ (Epitasis), তৃতীয়, চরম উৎকর্ষ (catastasis) এবং চতুর্থ, পর্যায় (catastrophe)—এখানেই আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ, তাঁর সাহিত্য দর্পণে নাটকের গঠন আলোচনায় বলেছেন মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি বা নির্বহন—এই পঞ্চসন্ধির কথা। ইংরেজি নাটকে একেই পাঁচটি অঙ্ক (Act)-এ বিভাজিত করা হয়েছে। যথা—Exposition, Rising action, Climax, Falling action এবং Catastrophe।

বর্তমান মূলপাঠটি প্রথম অঙ্ক, চারটি গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্য (scene)–এ উপস্থাপিত। নাটকীয় ঘটনার কতকগুলি বীজ এই গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্য সহযোগে উপস্থিত করা হয়েছে।

প্রথম অঙ্কে গোলোক বসু ও সাধুচরণের কথোপকথন থেকে মুনাফালোভী নীলকরদের রায়ত বা প্রজাদের পীড়নের বিবরণ জানতে পারা যায়। পরে সাধুচরণ ও তার ভাই রাইচরণকে নীলকুঠীর আমিন পেয়াদাসহ এসে বেগুনবেড়ের কুঠীতে ধরে নিয়ে যায়। তারা নয় বিঘা জমিতে নীল চাষে অক্ষমতা জানালে পীড়ন শুরু করে। নবীন বসু তাদের বক্তব্যের সত্যতা জ্ঞাপন করে সহানুভূতির সঙ্গে বিচারের অনুরোধ জানালে, তিনি অপমানিত হন। সাধুচরণের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণির ওপর রোগ সাহেবের দৃষ্টি পড়ে এবং নবীন বসুকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য গোলোক বসুকে জেলে পাঠাবার ষড়যন্ত্র চলে।

এই অঙ্কের মূল প্রতিপাদ্য হোল ঃ অত্যাচারী নীলকরদের কার্যকলাপ প্রদর্শন, নিপীড়িতদের অসহায়তা ও নায়ক চরিত্রের প্রতিরোধ রচনা করবার অভিপ্রায় প্রকাশ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কতিপয় অপ্রচলিত শব্দ ও তার অর্থ ঃ

খোরাক—খাদ্য। মাচ—মাছ। গাঁখান্—গ্রামখান। দামড়া—বদল। ভ্যালা—ভাল। অবধান—প্রণাম। আজাদের—রাজাদের (রাধাকান্তদেব প্রসঙ্গ)। আবাগী—অভাগী। আসধান—আউসধান। অ্যাকন—এখন। এট্টু—একটু। এতডা—এতটা। একবাল চুল—একরাশ চুল/ একমাথা চুল। কবুল—স্বীকার, সম্মত। কয়েদ—আটক, কস্‌বি—নাগরী বেশ্যা। কসুর—দোষ। কয়েটবা—কায়স্থের। বারবিতি—কৃষিকাজ। কেম্তাবে—কেমন করে। কৌড়ি—বড়ি। ক্যাওটকে—কেওটজাতির লোকের। ক্যান—কেন। খালে—খেলে। খ্যাতি—খেতে। খ্যাদের—খেদের। গড়—প্রণাম। গস্তানি—কুলটা। গাঁতি—জামিদারের অধীন জমি। গেঁজেছো—পচিয়েছ। গোডার—গু-খেকোটার। গোন্দো—গন্ধ। গোস্তাকি—অপরাধ। ঘা—বিপদ। চুঙ্গি—চোঙা, নল। চেয়েলো—চেয়েছিলো। ছুপ্‌দে—চুপ কর। জরু-স্ত্রী। ডবকা—উঠতি বয়স। ডান—দক্ষিণ, ডাইনি। ডুকরে—চিৎকার করে। ঢাল (চুল)—লম্বা, ঘন, গোছা (চুল)। ঢ্যারা সই—টিপ সই। তর্—দেরি। দস্তুর—নিয়ম। দাদন—অগ্রিম। নছিবির—অদৃষ্টের। নয়দারা—নয় ধারা। নাঙ্গা—রাঙ্গা, লাল। নাতি—নাইতে, স্নান। নীলি—নীলে। নেটেলা—লেঠেল। নোনা ফেনা—অনুর্বর (লবণাক্ত)। পালা—ধানের গাদা। বন্দ—জমির খন্ড। বন্দা—বান্দা, ক্রীতদাস। বিদেকাটি—ঘাস, আগাছা তোলবার চিরুণী আকৃতি যন্ত্র নাম 'বিদে'। ভাতার—ভর্তা শব্দের অপভ্রংশ, স্বামী। ভ্যালা—ভাল। মাদ্দের—মাদের। মুসাবিদা—খস্‌ড়া। মেয়ে নাতি—স্ত্রী লোকের লাথি। মেয়েগার—মেয়েদের। মোতাবেক—অনুসারে। ম্যাদ—মেয়াদ, জেল। রোক্—ঝোঁক। সইতে—সই করতে। ষেটের বাছা—ষষ্ঠীর পুত্র। সাবেক—পূর্বতন। সেঁস্‌য়ে—শাসিয়ে, হদ্দ—সীমা।

গাঁতি যায় যায়—তালুক ধ্বংস হওয়ার পথে।

কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব—নীল কুটির গুদামে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটকে রেখে অত্যাচারের ভয় দেখান।

'প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছাড়'—জীবনপণ করে প্রতিরোধের অভিপ্রায় জ্ঞাপন। দৃঢ়চেতা নবীনমাধবের অত্যাচারীর অত্যাচার প্রতিরোধ করবার দৃঢ় সঙ্কল্প জ্ঞাপন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জমিতো না, য্যান সোনার চাঁপা—সাঁপোলতলার জমি এত উর্বরা যে তাঁর সোনালি ফসলের প্রাচুর্য সাধু রাইচরণের পরিবারের সম্পদ। মহার্ঘ সম্পদের এই পরিচয় তুলে ধরতে 'সোনার চাঁপা'—এই অলঙ্কৃত উপমা ব্যবহার করেছে।

এক কোন্ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম—জমির ফসলের একটা অংশ বিক্রী করলে মহাজনের দেনা শোধ হোত।

কারকিতী—জমির যত্ন। ফসল উৎপাদনের জন্য জমিতে যে যত্ন করতে হয়।

নীলের গাদন—বলপূর্বক দাদন বা অগ্রিম দিয়ে বিনিময়ে নীলচাষ করতে বাধ্য করানকে গাদন বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গাদন—জোর করে বা ঠেসে বা চেপে ভর্ত্তি করা।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

না-লায়েক—অনুপযুক্ত। ফার্সী শব্দ।

শ্যামচাঁদ বেগোর তোম্ দোরস্ত্ হোগা নেই—অর্থাৎ শ্যামচাঁদ ছাড়া তুমি ঠিক হবে না। শ্যামচাঁদ-চামড়ার চাবুক। এটি ব্যবহার করত লারমুর নামে জনৈক কুঠিয়াল।

বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে—গোপীনাথ-এর কাজে অপটুতায় ক্ষুব্ধ উড সাহেব একথা বলেছেন। গোপীনাথ, তাঁর ত্রুটি ধরা পড়তেই নবীন মাধবের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দেয়, দেখে উড এ কথা বলেছেন।

চতুর্থ গর্ভা

শ্যামা ঠাকুরুণের কেশ—সরলতার মাথায় চুলের প্রাচুর্য দেখে সৈরিন্ধ্রী কালী ঠাকুরের চুলের সঙ্গে তুলনা করেছে।

খামাত্তে—খামার হতে। পাতখানি হয়ে গিয়েছে—পাতার মত রোগা হয়ে গিয়েছে। এরা সাহেবদের চণ্ডাল—সাবিত্রী এতদিন সাহেবদের সুবিচার ও গুণাবলীর পরিচয় জেনে এসেছে। নীলকরদের বৃত্তান্ত শুনে তিনি মন্তব্য করেছেন—এঁরা সাহেবদের মধ্যে কুলাঙ্গার। চণ্ডালদের মত হীন ও অধঃপতিত।

নেটেলা—লাঠিয়াল, মাচের টক্ সাহেব—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। তেরো নাল ফিরতি থাকে—তরোয়ালধারীরা ঘুরতে থাকে।

বউ মান্‌সি ঘোড়া চাপে—কুঠির বিধি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ঘোড়ায় চাপে দেখে আদুরির গ্রামীণ সংস্কার আহত বোধ করে। ঘরের বৌ পর পুরুষের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপেছে, এটি সে বরদাস্ত করতে পারে না।

তুই আবাগি কোন দিন মজাবি—আদুরি তার প্রগলভ উক্তির দ্বারা কোন দিন বিপদ ডেকে আনবে। সাবিত্রী এই আশঙ্কা থেকে কথাটি বলেছে। ধোপা বউ কাপড় নিয়ে আলেন—কথাটি রঙ্গপ্রিয় আদুরির। সে ঘোমটা পরা সরলতাকে দেখে রসিকতা করে একথা বলেছে।

['নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অংশে নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। বাংলার সাধারণ গ্রাম্যচাষী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার ইংরেজদের সংগঠিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে তখনও সংঘবদ্ধ ছিল না, মাঝেমধ্যে কোন কোন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ জানিয়ে নিপীড়িত হচ্ছে তার পরিচয় এই অঙ্কটি থেকে জানা যাচ্ছে। এ পর্বে পল্লী বাংলায় সাধারণ নরনারী অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে যে কতটা বিপন্ন ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়।

Exposition হিসাবে নাটকের প্রধান প্রধান কুশীলবদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে চারটি দৃশ্যে পরিচয় ঘটেছে। চরিত্রগুলির পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট সহজ বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

দীনবন্ধুর সংলাপ রচনার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই এই সঙ্গে সঙ্গে আভাসিত হয়েছে। দীনবন্ধুর প্রথম নাট্যপ্রয়াস হিসেবে তাঁর মনন ও সমাজ হিতৈষণার পরিচয় এই অঙ্ক-দৃশ্যে প্রতিফলিত।]

৫২.৯ নীলদর্পণ মূলপাঠ—২

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির গুদামঘর

(তোরাপ ও আর চারি জন রাইয়ত উপবিষ্ট)

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পার্‌বো না—ঝে বড়বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হাল গোরু বেঁচ্‌য়ে নে ব্যাড়াচ্ছে, মিত্যে সাক্ষি দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপকে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পারবো না—জান্ কবুল।

প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাঁক্ থাক্‌বে না, শ্যামাচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড়বাবুর নুন খাইনি—তা করবো কি, সাক্ষি না দিলি যে আস্ত রাখে না—উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়্‌য়ে উটেলো—দ্যাদিনি অ্যাকন তবাদি অক্ত ঝোজানি দিয়ে পড়চে—গোডার পা য্যান বলদে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস নে!

তোরাপ। (দন্ত কিড়্‌মিড়্ করিয়া) দুত্তোর প্যার্‌য়েকের মার প্যাট কর্‌য়ে, লৌ দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ, কি বলবো, সমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এম্‌নি থাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাড্ ম্যাড্ করা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকিরি—জোন খাটে খাই। মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, বল্লি তো খাটবে না, তবে মোরে গুদোমে পোর্‌লে ক্যান্—তানার সেমন্‌তোনের দিন ঘুন্‌য়ে এস্‌তেচে, ভেবেলাম এই হিড়িকি খাটে কিছু পুঁজি করবো, কর্‌য়ে সেমন্‌তোনের সমে পাঁচ কুটুম্বর খবর নেব, তা গুদোমে ৫ দিন পচ্‌তি লেগিচি, আবার ঠ্যাল্‌বে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই অ্যাকবার গিয়েলাম—ঐ যে ভাবনাপুরীর কুটি, যে কুটির সাহেবডারে সক্‌লি ভাল বলে—ঐ সমুন্দি মোরে অ্যাকবার ফোজদুরিতি ঠেলেলো। মুই সেরের কেচ্‌রির ভেতর অনেক তাম্‌সা দেখেলাম। ওয়াঃ! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক্ সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, দুই সুমুন্দি মোক্তায় ওম্‌নি র, র, কর্‌য়ে অ্যাসেছে, হেড়া হিড়ি যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুদো এঁড়ের নড়ুই বেদ্‌লো!

তোরাপ। তোর দোষ পেয়েলো কি? ভাবনাপুরীর সাহেবতো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা

কবো, ঘোড়া চড়ে যাব। সব সমিন্দি যদি ঐ সমিন্দির মতে হতো, তা হলি সমিন্দিগার এত বদনাম নট্‌তো না।

দ্বিতীয়। আহ্লাদে যে আর বাচিনে গা—

ভাল ২ করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে।

কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে।।

এব্‌রে ও সুনিন্দির ইক্‌সুল করা বেইরে গেছে, সুমিন্দির গুদোম্‌তে সাতটা বেয়েত বেইরেছে। অ্যাকটা নিচু ছেলে। সুমিন্দি গাই বাচুর গুদোমে ভরেলো—সুমিন্দি যে ঘোঁটা মাত্তি লেগেছে, বাবা।

তোরাপ। সমিন্দিরে ভাল মানুষ পালি খ্যাতি আসে, মাচেরটক্‌ সাহেবডারে গাংপার করবার কোমেট কত্তি লেগেছে।

দ্বিতীয়। এ জেলার মাচেরটক্‌ না—ও জেলার মাচেরটকের দোষ পালে কি তাও তো বুঝ্‌তি পারচি নে।

তোরাপ। কুটি খাতি যাই নি। হাকিমডেরে গাঁতবার জন্যি খানা পেক্‌য়েলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেল্‌য়ে রলো, খাতি গেল না—ওডা বড় নোকের ছাবাল, নীল মামদোর বাড়ী যাবে ক্যান। মুই ওর অন্‌তেরা পেইচি, এ সমিন্দিরে বেলাতের ছোটনোক।

প্রথম। তবে এগোনের গারনাল সাহেব কুটি কুটি আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়্‌য়েলে ক্যামন করে? দেখিস্‌ নি, সুমুন্দিরে গোঁট বেঁদে তাঁনারে বর সেজ্‌য়ে মোদের কুটিতে এনেলো?

দ্বিতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলির ভাগ নিতি পারে। তিনি নাম কিন্‌তি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচ্‌য়ে নাকে, মোরা প্যাটের ভাত করো খাতি পার্‌বো, আর সমিন্দির নীল মামদো ঘাড়ে চাপতি পারবে না—

তৃতীয়। (সভয়ে) নুই তবে মলম, মামদো ভূতি পালি নাকি ঝক্কোতে ছাড়ে না? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এ মান্নির ভাইরি মানেচে ক্যান? মান্নির ভাই নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না—সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁছাড়া হতি লেগলো, তাই বচোরদ্দি নানা নচে দিয়েলো—

ব্যারালচোকো হাঁদা হেম্‌দো!
নীলকুটির নীল মেম্‌দো।।

বচোরদ্দি নানা কবি নচ্‌তি খুব।

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচেচে শুনিস্‌নি।

"জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে।।

তোরাপ। এওল নচন নচেচে ; "জাত মাল্লে" কি?

দ্বিতীয়। "জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে।।"

চতু । হা! মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেচে তা কিছুই জানতি পাল্লাম না—মুই হলাম ভিনগাঁর রে ত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা বস মশার সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল্লাম? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করোলো, তাইতি বস মশার কাছে মিচ্‌রি নিতি অ্যাকবার ভরপুর আয়েলাম। আহা কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুব রুপী দেখেলাম, বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।

তোরাপ। এবার ক কুড়ো ঢুক্‌য়েচে?

চতুর্থ। গ্যাল বার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচড়া কল্লে—এবারে ১৫ বিঘের দাদন গতিয়েছে, ঝা বল্‌চে তাই কচ্চি তবু তো ব্যাভ্রম কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই দু বচ্ছোর ধরে নাঙ্গাল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এই বারে যো হয়েলো, তিলির জন্যিই জমিডে রেখেলাম, সে দিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে অ্যাসে দেঁড়্‌য়ে থেকে জমিডেয় মার্গ মারালে। চাসার কি আর বাঁচন আছে?

তোরাপ। এডা কেবল আমীন সমিন্দির হির্‌ভিতি। সাহেব কি সব জমির খবর নাকে। ঐ সমিন্দি সব ঢুঁড়ে বার করে দেয়। সমিন্দি য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, ভাল জমিডে দ্যাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওর তো আর মহাজন কত্তি হয় না, সুমিন্দি তবে ওমন করে মরে ক্যান—নীল কর্‌বি, তা কর, দামড়া গোরু কেন, নাঙ্গাল বেন্‌য়ে নে, নিজি না চস্‌তি পারিস মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ ক্যান্ চসে ফ্যাল না, মোরা গাঁতা দিতি তো নারাজ নই, তা হলি দু সনে নীল যে ছেপ্‌য়ে উট্‌তি পারে, সমিন্দি তা করবে না, মান্নির ভার নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগচে, তাই চোস্‌চেন, তাই চোসচেন—(নেপথ্যে হা, হো, হো, মা, মা) গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা, দরগা, তোরা আম নাম কর, এডার মদ্দি ভূত আছে। চুপ দে চুপ দে—

(নেপথ্যে—হা নীল! তুমি আমারদিগের সর্বনাশের জন্যই এদেশে এসেছিলে—আহা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কানসারণের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল খেলেম, এখন কোন্ কুটিতে আছি, তাও তো জানিতে পারিলাম না, জানিবই বা কেমন করে, রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়, উঃ মাগো তুমি কোথায়।)

তৃতীয়। আম, আম, আম, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর!—

তোরাপ। চুপ, চুপ।

(নেপথ্যে। আহা! ৫ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই—হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখি নে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, কথা কহিবার শক্তি নাই, মা গো! তোমার চরণ দেড় মাস দেখিনি।

তৃতীয়। বউরি গিয়ে এ কথা বলবো—শুন্‌লি তো মর‍্যে ভুত হয়েচে তবু দাদনের হাত ছাড়াতি পারি নি।

প্রথম। তুই মিনসে এমন হেব্‌লো।—

তোরাপ। ভাল মান্‌সির ছাবাল—মুই কথায় জান্‌তি পেরিছি—পরাণে চাচা, মোরে কাঁদে কত্তি পারিস মুই ঝরকা দিয়ে ওরে পুচ করি ওর বাড়ী কনে—

প্রথম। তুই নে নেড়ে।

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁদে উটে দ্যাক্—(বসিয়া) ওট—(কান্ধে উঠন) দ্যাল ধরিস্, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা—(গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা লাব, চাচা লাব, গুপে সুমিন্দি আস্‌চে। (প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন)

[গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে করিয়া রোগ সাহেবের প্রবেশ]

তৃতীয়। দেওয়ানজী মশাই, এই ঘড়ডার মধ্যি ভুত আছে। এত বেল কান্‌ত নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই তেমনি না বলিস তবে তুই ওমনি ভূত হবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়েছে, এ কুটিতে আর রাখা নয়। ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল—

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে, কোন্ বজ্জাত নষ্ট? (পায়ের শব্দ)

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে! এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা, বলে নেমক্‌হারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবা রে! যে নাদ্‌না, অ্যাকন্ তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা কর্‌বো। (প্রকাশ্যে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি।

রোগ। চপরাও, শূয়ারকি বাচ্চা! রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে। (রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা)

তোরাপ। আল্লা! মাগো গ্যালাম, পরাণে চাচা, একটু জল দে, মুই পানি তিসেয় মলাম্, বাবা, বাবা, বাবা—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতায় গুঁতা)

তোরাপ। মোরে ঝা বল্‌বা মুই তাই করবো—দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চতের হারামজাদ্‌কি ছেড়েছে। আজ রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষা আদায় না হোলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম রোতা হায় কাহে? (পায়ে গুঁতা)

তৃতীয়। বউ তুই কনে রে, মোরে খুন কর্‌্যে ফ্যালালে, মা রে, বউ রে, মা রে, মেলে রে, মেলে রে (ভূমিতে) চিত হইয়া পতন)

রোগ। বাঞ্চৎ বাউরা হায়।

গোপী। কেমন তোরাপ, প্যাঁজ পয়জার দুই তো হলো।

তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্টু পানি নি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম।

গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর, ঘামও ছোটে, জলও খাওয়ায়। আয় তোরা সকলে আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে আনি।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিন্দুমাধবের শয়নঘর

(লিপিহস্তে সরলতা উপবিষ্ট)

সর। সরলা ললনা জীবন এল না।
কমল হৃদয় দিবরদ দলনা।

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় নবসলিলশীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়েছিলাম। দিন গণনা করিতেছিলাম যে দিদি বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা নয়, আমার এক এক দিন এক এক বৎসর গিয়েছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্মূল হইল, এক্ষণে যে মহৎ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক—প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্মে, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগরভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক সভা স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই কাছারী নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই, মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন—স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান,স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামীরত্নই সতীর সর্বস্বধন। হে লিপি, তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি (লিপিচুম্বন)। তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি (বক্ষে ধারণ)। আহা! প্রাণনাথের কি অমৃত বচন, পত্রখানি যত পড়ি ততই মন মোহিত হয়, আর একবার পড়ি (পঠন) ঃ

প্রাণের সরলা।

তোমার মুখারবিন্দু দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্বচনীয় সুখ লাভ করি। মনে করিয়াছিলাম সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ, কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি, যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা গোপনে গোপনে পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোনরূপে কারাবদ্ধ হন। দাদা মহাশয়কে এ সংবাদ আনুপূর্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদবিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করো না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্সপিয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষণ বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার খান দিয়াছেন, বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব—বিধুমুখি, লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়েও

তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতাঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন তবে তোমার লিপিসুধা পান করে আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইত ইতি।

তোমারি বিন্দুমাধব।

আমারি—তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে?—আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারি নে বলে ঠাকুরুণ আমাকে পাগ্‌লির মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়। যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আর উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থির হয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে আমি এখন সেইরূপ হইলাম। আর আমার সেই হাস্যবদন নাই! হাঁসি সুখের রমণী, সুখের বিনাশে হাঁসির সহমরণ। প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। এ অবোধ মন! তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতেও পায় না। কিন্তু নয়ন, তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে ; (চক্ষু মুছিয়ে) তুমি শান্ত না হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারি নে—

[আদুরীর প্রবেশ]

আদুরী। তুমি কত্তি লেগেচো কি? বড় হালদার্নি যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না, কল্লে কি, ঝার পানে চাই তানারি মুখ তোলো হাঁড়ি—

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই।

আদুরী। তেলে দেক্‌চি অ্যাকন হাত দেউনি। চুলগল্লাডা কাদা হতি লেগেচে, চিঠিখান অ্যাকন ছাড়নি—ছোট হালদার ঝ্যাত চিটিতি মোর নাম ন্যাকে দেয়।

সর। বড় ঠাকুর নেয়েছেন?

আদুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি লেগেছে, তোমার চিটিতি ন্যাকি নি—কত্তামশাই যে কানতি নেগলো।

সর। (স্বগত) প্রাণনাথ, সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারিবে না। (প্রকাশ্যে) চল, রান্না ঘরে গিয়ে তেল মাখি। [উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর, তেমাথা পথ

(পদী ময়রাণীর প্রবেশ)

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি—রেয়ে যে খেঁটে এনেছিল, সাধুদাদা না ধরলিই জম্মের মত ভাত কাপড় দিত—আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়—উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে

দয়া নেই—আমারে দেখে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি, বলে কাছে আসে। এমন সোনার হরিণ মা না কি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে।—ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে—মা গো, কি ঘৃণা, টাকার জন্যে জাত জন্ম গেল, বুনোর বিছানা ছুতে হলো, বড় সাহেব ড্যাক্‌রা আমারে দ্যাকমার করেছে, বলে নাক কান কেটে দেবে—ড্যাক্‌রার ভীমরতি হয়েছে, ভাতারখাগীর ভাতার মেয়েমানুষ ধরে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়েমানুষের পাছায় নাতি মারতে পারে, ড্যাকবার সে রকম তো একদিন দেখলাম না। যাই আমিন কালামুখরে বলি গে, আমারে দিয়ে হবে না—আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে, পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে।

(নেপথ্যে গীত)

যখন ক্ষ্যাতে, ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে, ও তার লয়ান দুটি ।।

(একজন রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোকা ধরেছে?

পদী। তোর মা বনের গে ধরুক, আঁটকুড়ির বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ী যাও, কলমিঘাটায় যাও—

রাখাল। মুই দুটো নিড়িন গড়াতি দিউচি—

[একজন লাঠিয়ালের প্রবেশ]

বাবারে! কুটির নেটেলা। [রাখালের বেগে পলায়ন।]

লাঠি। পদ্মমুখি, মিশি মাগ্‌গি কর্‌্যে তুল্যে যে।

পদী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করে) তোর চন্দ্রহারের যে বাহার ভারি।

লাঠি। জান না প্রাণ, প্যায়দার পোশাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্‌না চেয়েছিলুম তা তুই আজও দিলি নে। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না।

লাঠি। পদ্মমুখি, রাগ করিস্ নে। আমরা কাল শ্যামনগর লুট্‌তে যাব, যদি কাল বক্‌না পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁদা রয়েছে। আমি মাচ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব।

[লাঠিয়ালের প্রস্থান।]

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কাজ নাই। কম্‌য়ে জময়ে দিলে চাসারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শামনগরের মুন্সীরে ১০ খান জমি ছাড়বার জন্যে কত মিনতি কল্যে। "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।" বড় সায়েব পোড়ারমুখো পোড়ার মুখ পুড়েয়ে বসে রলো।

[চারি জন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ]

চারি জন শিশু। (পাততাড়ি রেখে করতালি দিয়া)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।

পদী। ছি বাবা কেশব, পিসি হই এমন কথা বলে না।

৪জন শিশু। (নৃত্য করে)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ও কথা বলতে নাই—

৪ জন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।

[নবীনমাধবের প্রবেশ]

পদী। ও মা, কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম। [ঘোম্‌টা দিয়া পদীর প্রস্থান।

নবীন। দুরাচারিণী, পাপীয়সী—(শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও, অনেক বেলা হইয়াছে— [৪ জন শিশুর প্রস্থান।]

আহা! নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইনিস্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্জন, বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়, বাবুজি বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজির নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয় আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে, দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি, অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব, ইনিস্পেক্টর বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুলস্থাপনে সমোদ্যোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দশা দেশে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল—বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ, অল্প বয়সের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়।—বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখি নে, পাঁচ জনের একজনও হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারিজন সাক্ষ্য দিলেই সর্বনাশ, বিশেষ আমি এপর্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি না, তাহাতে আমরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উড সাহেবের পরম বন্ধু।

[একজন রাইয়ত, দুইজন ফৌজদারির পেয়াদা এবং কুটির তাইদ্‌গিরের প্রবেশ]

রাইয়ত। বড়বাবু, মোর ছেলে দুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই—গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম তার একটা পয়সা দেলে না, আবার বকেয়াবাকি বলে হাতে দড়ি দিয়েছে, আবার আন্দারবাদ নিয়ে যাবে—

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, এক বার লাগলে আর ওঠে না—তুই বেটা চল্, দেওয়াঞ্জির কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে। তোর বড়বাবুরও এম্‌নি হবে।

রাইয়ত। চল্ যাব, ভয় করি নে, জেলে পচে মরবো, তবু গোডার নীল করবো না—হা বিদেতা, হা বিদেতা, কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না (ক্রন্দন)। বড়বাবু মোর ছেলে দুটোরে খাতি দিও গো, মোরে মাটেত্তে ধরে আন্‌লে তাদের একবার দেক্‌তি পালাম না। [নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে। [রাইচরনের প্রবেশ]

রাই। দাদা না ধল্লিই গোডার মেয়েরে দাম টাসা করেলাম, মেরে তো ফ্যাল্‌তাম, ত্যাকন না হয়, ৬ মাস ফাঁসি য্যাতাম, শালি।—

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস?

রাই। মাঠাকুরুণ পুটঠাকুরকে ডেকে আন্‌তি বল্লে—পদী গুডি বল্লে তলপের প্যায়দা কাল আস্‌বে। [রাইচরণের প্রস্থান।]

নবীন। হা বিধাতঃ এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল তাই ঘটিল—পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপটচিত্ত, বিবাদ বিসংবাদ কারে বলে জানেন না, কখন গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারির নামে কম্পিত হন, লিপি পাট করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন, কয়েদ হলে জলে ঝাঁপ দিবেন হা! আমি জীবিত থাকিতে পিতার এই দুর্গতি হবে। মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিণী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়, নীলকুটির গুদামে তাঁর পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব, সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি, না, পরোপকার পরম ধর্ম, সহসা পরাঙ্মুখ হব না,—শ্যামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না, চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি, দেখি কি করিতে পারি—

[দুইজন অধ্যাপকের প্রবেশ]

প্রথম। ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বসুর ভবন কি এই পল্লীতে বটে—পিতৃব্যের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুলতিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু সাধু, এবং বিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয়, যেন অংশ—

"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপাত্যমুপজায়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ।।"

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না, তর্কালঙ্কার ভায়া শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না, হঃ হঃ, হঃ (নস্য গ্রহণ)।

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহূত, অদ্য গোলোকচন্দ্রের আলয়ে অবস্থান, তোমারদিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এই পথে চলুন। [সকলের প্রস্থান]

৮২.১০ সারাংশ

বেগুনবেড়ের কুঠির গুদাম ঘরে তোরাপ সহ চারজন রায়তকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাঁদের নিজেদের মধ্যে যে কথাবার্তা হচ্ছে, তা থেকে জানা যায়, গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য তাদের আনা হয়েছে। কিন্তু পরোপকারী গোলোকের বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে চায় না, অথচ নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের ভয়ও আছে, তাই বিরুদ্ধাচরণের সাহসও পায় না। এই পরিস্থিতিতেও তোরাপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সে নেমকহারামি করতে পারবে না। পরম রায়ত তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় 'শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা'। সে বলে, তার বুকের ওপর উড সাহেব পেরেক মারা জুতো পরে উঠে যে রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছে, তা এখনও 'ঝোজানি দিয়ে পড়চে'। দ্বিতীয় রায়তও তার ভূয়োদর্শনের সাহায্যে বুঝেছে, সাক্ষ্য না দিলে অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই নেই। চতুর্থ প্রথমে নীলের দাদন না নিলেও, অবশেষে বাধ্য হয়েছে পনের বিঘায় নীল বোনবার জন্য দাদন নিতে, এতেও তার পরিত্রাণ ঘটেনি। আবদ্ধ অবস্থায় জানা গেল, জনৈক নীল চাষী দাদনের বিরোধিতা করায় তাকে দেড় মাসের মধ্যে পনরোটি কুঠীতে ঘোরান হয়েছে। রাতে চোখ বেঁধে তাঁকে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ অত্যাচার যে আর সহ্য করতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে দেওয়ান গোপীনাথসহ রোগ সাহেব তোরাপ ও অন্যান্য সকলের ওপর নির্যাতন করতে থাকে। তৃষ্ণার্ত তোরাপ জল চাইলে কটূক্তি করা হয়। পরিশেষে সে সাময়িক আত্মরক্ষার জন্য সাহেবের কথা শুনবে, এই প্রতিশ্রুতি দেয়।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিন্দুমাধবের চিঠি পাঠরতা সরলতাকে আশা-নিরাশায় দোলায়িত দেখা যায়। গোলোক বসুকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে তদ্বিরের প্রয়োজনে শহরে থেকে যেতে বাধ্য হচ্ছে জানালে, সাময়িকভাবে বিরহ বেদনা ভারাক্রান্ত হলেও সে মানিয়ে নেয়। বিন্দু তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে সরলতায় প্রার্থিত বই সে অবশ্যই নিয়ে আসবে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে, পদীময়রাণী, তাঁর স্থূল রসিকতা, তাকে নিয়ে শিশুদের ছড়া গান, প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। নবীন শিশুদের বাড়ী পাঠিয়ে দেন। বিন্দু গ্রামে লেখাপড়ার জন্য স্কুল করবার প্রস্তাব দিয়েছিল। বর্তমানে গোলোককে নিয়ে বিব্রত থাকায় হয়ে ওঠেনি, পরে অবশ্যই শুভ প্রস্তাবটি কার্য্যকর করতে হবে। নবীন এখন পিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত। তিনি কয়েদ হলে আর বাঁচবেন না। অথচ নবীন তাঁদের পক্ষে কোন সাক্ষী জোগাড় করতে পারছেন না। তাঁর বিশ্বাস তোরাপ মিথ্যা কথা বলবে না। কিন্তু অপর চারজন রায়ত যদি সাহেবদের নির্দ্দেশ মত সাক্ষ্য দেয়, তবে তো সর্বনাশ। বিচারক ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট তো নীলকর সাহেবদের বন্ধু, তাই বিচার যে প্রহসন মাত্র, এটা তিনি বুঝেছেন। নবীন এই সব নানা কথা ভেবে অত্যন্ত ব্যাকুল। তিনি এতদিন যা ভাবেননি, তাই ভাবছেন—সপরিবারে তিনি গ্রাম ত্যাগ করবেন। তবে পরোপকার ধর্ম পরিহার করবেন না।

[প্রথম অঙ্কের বীজ, বর্তমান অঙ্কে ঘটনা প্রবাহকে ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে—

একেই বলা যায় Rising Action। রায়তদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার, বাবার কথা ভেবে নবীন মাধবের মানসিক যন্ত্রণা ঘটনায় গতি সঞ্চার করেছে।]

৮২.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অবিধি-অন্যায়, অসঙ্গত, অরপুরুব-অপরূপ, আম আম - রাম রাম ; আম নাম - রাম নাম ; আয়েলাম - এসেছিলাম ; ইক্সুল - আইন অনুযায়ী আটক এব্‌রে - এবার ; এনেলো - এনেছিল, কম্‌য়ে জম্‌য়ে - কমিয়ে সমিয়ে ; কসম্ - দিব্যি, শপথ ; কুড়ো - বিঘা, জমির মাপ, কুঁদির -কাঠ চেঁছে নানারকম আকার দিবার যন্ত্র। কুঁদির মুখি বাঁক থাকবে না—কুঁদ যন্ত্রে - কাঠ বা ধাতুর কোন জিনিস লাগিয়ে দিয়ে পালিশ করা হয়, ফলে কোনরকম বাঁকা-চোরা থাকে না। এখানে তোরাপ কোনভাবেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না, বললে প্রথম রায়ত, তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, দৈহিক নির্যাতন হলে তার এ সঙ্কল্প আর থাকবে না।

খেটে - খাটো মোট লাঠি। হিরভিতি - কারচুপি, কারসাজি, চালাকি, হেড়াহিরি - হুড়োহুড়ি, অতি ব্যস্ততা, ছুটোছুটি। হেমদো - বিরাট দেহ, নিরেট ব্যক্তি। কেচরি - কাছারি, চাবালি - চোয়াল, ঝোজানি - অবিরল ধারায়, টিকিরি - ঠিকামজুর, সেরেব - স্রেফ, শুধু ; হেড়াহেড়ি - হুড়োহুড়ি। হ্যাংনামা - হাঙ্গামা ; ইক্সুল - আইন অনুযায়ী, ঘোঁটা মাত্তি - গোলমাল, তোলপাড়। গাংপার করবার কোমেট্ কত্তি লেগেচে - ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দেশ থেকে বিদায় করবার জন্য কমিটি গঠন করছে (ষড়যন্ত্র করছে)। কারণ নীলকররা নিরপেক্ষ প্রজাহিতৈষী শাসক সহ্য করতে পারে না। হানের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচয়ে রাখে - বর্তমান গভর্নরকে (স্যার পীটার গ্রান্ট) যদি ঈশ্বর দীর্ঘজীবী করেন। হাঁদা হেম্‌দো - হেম্‌দো শব্দটি 'উজবুক' অর্থে ব্যবহৃত — বুদ্ধিহীন দেহসর্বস্ব।

সুখের বিনাশে হাসির সহমরণ - মানসিক সুখ নষ্ট হলে, হাসিও হারিয়ে যায়। হাসি অন্তরের আনন্দকে প্রকাশ করে। বড় হালদার্নি - বড়বৌ অর্থাৎ সৈরিন্ধ্রী। ড্যাকরা - অশিষ্ট, দুষ্ট। প্যায়দার পোষাক, আর নটীর বেশ—পেয়াদা যতদিন বড়লোকের চাকরী করে ততদিন তার সাজপোষাকের ঔজ্জ্বল্য থাকে, তেমনি যতদিন যৌবন ততদিনই নটীর সমাদর। তাইদ্‌গির-তাগিদকারী, যে তাগাদা করার কাজে নিযুক্ত। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা ধোপা 'ভ্যালা'র রস দিয়ে কাপড়ে দাগ দেয়, সে দাগ ওঠে না। তেমনি নীলের দাদন একবার নিলে রায়তের আর মুক্তি নেই। নবপ্রসূতি শশারু ..... অন্নাভাবে মরিবে - ব্যাধ শশক জননীকে ধরে নিয়ে গেলে, তার শাবকদের যেমন অনাহার মৃত্যুবরণ করতে হয়, তেমনি ধৃত রায়তের সন্তানদেরও অন্নাভাবে মৃত্যু হবে।

[দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম অঙ্কের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে। একদিকে ক্ষেত্রমণিকে প্রলুব্ধ করতে পদী ময়রাণী উদ্যোগী হয়েছে, অপরদিকে গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করে কারাগারে নিক্ষেপের আয়োজন চলছে, এইভাবে ঘটনার গতি ক্রমশঃ জটিলতর হতে শুরু করেছে দেখা যায়।

দুটি অঙ্কপাঠে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নাটকের সংলাপ দুটি ভিন্ন খাতে বইছে—বসু পরিবারের কুশীলবরা অনেকটা রামমোহন - বিদ্যাসাগরের গদ্য ভাষা আশ্রয় করে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করছে। অপর দিকে গ্রাম্য কৃষকদের (রায়ত) ভাষা, অকৃত্রিম, সহজও চরিত্রানুগ, অনেকটা জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত]

৮২.১২ নীল-দর্পণ মূলপাঠ—৩

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

[গোপীনাথ ও এক খালাসীর প্রবেশ]

গোপী। তোদের ভাগে কম্ না পড়িলে তো আমার কানে কোন কথা তুলিস্ নে।

খালাসী। ও গু কি অ্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম, যদি খাবা তবে দেওয়ানজিরি দিয়ে খাও। তা বল্লে, "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয়, যে সাহেবেরে বাঁদর খ্যাল্য়ে নে বেড়াবে।"

গোপী। আচ্ছা তুই এখন যা, কায়েতবাচ্চা কেমন মুগুর তা আমি দেখাব। [খালাসীর প্রস্থান] ছোটসাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয়, তবে কর্ম করিতে বড় সুখ, ও কথাও বল্বো—বড়সাহেব ওকথায় আগুন হয়, কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারি চটা, আমারে কথায় ২ শ্যামচাঁদ দেখায়। সেদিন মোজা সহিত লাতি মারলে। কয়েকদিন কিছু ভাল ভাল দেখিতেছি। গোলোক বসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়।

"শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।"

(উডকে দর্শন করিয়া)

এই যে আসিতেছেন, বসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

[উডের প্রবেশ]

ধর্মাবতার, নবীন বসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালিপড়ে রহিয়াছে, বেটাকে ফৌজদারিতে সেপর্দ্র করা গিয়াছে, এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল, এইবারে একেবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা শামনগরে কিছু কত্তে পারি নি।

গোপী। হুজুর, মুন্সীরে ওর কাছে এসেছিল তা বেটা বল্লে, "আমার মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে।" নবীন বসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের ৭/৮ ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেনতেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল মতলব বার করেছিলে।

গোপী। আমি জানতাম, গোলোক বস্ বড় ভীত মানুষ ফৌজদারিতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বসের যেমন পিতৃভক্তি, তাহা হইলে বেটা কাজে কাজেই শাসিত হইবে, এই জন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম, হুজুর যে কৌশলবাহির করিয়াছেন তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্কুরিণীর পাড়ে চাস দেওয়া হইয়াছে, উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল ; দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে পুকুরে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে, আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হল।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিশ করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ মাজিস্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানি করলে পাঁচবচোরে মোকদ্দমা শেষ হোবে না। মাজিস্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ তোমার সাক্ষী মাটোবুর করো নতুন আইনে চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে ; এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্মাবতার, নবীন বস ঐ চারি জন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল গোরু মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে এবং উহাদিগের পরিবারদিগের যাহাতে ক্লেশ না হয় তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে বলে আমার লাঙ্গাল গোরু কমে গিয়েছে, বাঞ্চৎ বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ, তোমছে কাম বেহতার চলেগা।

গোপী। ধর্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বৎসর ২ দাদন বৃদ্ধি করি ; এ কর্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমিন খালাসী আবশ্যক করে ; যে ব্যক্তি দু টাকার জন্য হুজুরের ৩ বিঘা নীল লোক্সান করে তার দ্বারা কর্মের উন্নতি হয়?

উড। আমি সম্জিয়াছি, আমীন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর, চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস, দাদন কিছু রাখে না, আমিন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদনবলিয়া ফেলিয়া দেয়, টাকাটি ফেরত দিবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করে এবং মিনতি করিতে ২ রততলা পর্যন্ত আমিনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি কলেজ হইতে এবারে উকিল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। আমি ওকে জানি, ঐ বাঞ্চৎ আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই

জালার কাছে ঠাণ্ডাজলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,

সময়ের গুণে আপ্ত পর।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর।।

উড। নীলকণ্ঠ কি করিল?

গোপী। নীলকণ্ঠ বাবু আমিনকে অনেক ভর্ৎসনা করেন, আমি তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটি ফেরত লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার সাতান, ৩৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত, এই কি চাকরের কাজ? আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি তবেই এ সব নিকমহারামি রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, ছাফ, নেমকহারামি।

গোপী। ধর্মাবতার, বেয়াদপি, মাফ্, হয়—আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড। হাঁ হাঁ আমি জানি, ঐ বাঞ্চৎ পডী ময়রাণীছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাৎকো হাম জরুর শেখলায়েঙ্গে, বাঞ্চৎকো হামারা বট্‌নেকা ঘরমে ভেজ ডেয়। [উডের প্রস্থান]

গোপী। দেখ দেখি বাবা, কার হাতে বাঁদর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত আর কাক ধূর্ত।

ঠেকিয়াছে এইবার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

(নবীনমাধব এবং সৈরিন্দ্রী আসীন)

সেরিন্ধী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ কর্য্যে বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষন্ন হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ, আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভারণগুলিন দিতে পারি নে?

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার কিন্তু আমি কোন্ মুখে লই। কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট, বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্বতে আরোহণ, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ় সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব। পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরিন্ধ্রী। হৃদয়বল্লভ! আমাদের অতি দুঃসময়, এখন কে তোমাকে পাঁচ শত টাকা বিশ্বাস কর্য্যে ধার দেবে? আমি পুনর্বার মিনতি করিতেছি, আমার আর ছোট বয়ের গহনাপোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় কর, তোমারক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোট বউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! বিধুমুখি! কি নিদারণ কথা বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল—ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ। তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্তা কি বুঝেছেন? কৌতুক-ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমনি রোদন করবেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দয় দস্যু হইলাম! আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না—নরাধম নিষ্ঠুর করেও এমন কর্ম করিতে পারে না। প্রণয়িনি! এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরি জীবনকান্ত, আমি যে কষ্টে ও নিদারণ কথা বলিয়াছি, তাহা আমিই জানি আর সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন। ও অগ্নিবাণ, তার সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করে তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে। প্রাণনাথ, বড় যন্ত্রণাতেই ছোট বয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি—তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শাশুড়ীর দীর্ঘ নিশ্বাস, ছোট বয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতি বান্ধবের হেঁটমুখ, রাইয়তজনের হাহাকার, এ সকল দেখে কি আমোদ-আনন্দ মনে আছে? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ, বিপিনের গহনা দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোট বয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট ; কিন্তু ছোটবয়ের গহনা দেওয়ার পূর্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোট বয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবিতে পারে, দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কাজ করে তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি, এ কি মাতৃতুল্য বড় জায়ের কাজ?

নবীন। প্রণয়িনি, তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকূলে দুটি নাই—আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল। আমি কি ছিলাম, কি হলাম। আমার ৭ শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দার পূজার সময় কি সমারোহ ; লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীকে অন্নবিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি। আহা! এমন ঐশ্বর্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী ভাদ্রবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা! পরমেশ্বর! তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ, আক্ষেপ কি—

সৈরি। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে। (সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো—আর বাধা দিও না। (তাবিজ খুলন)

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় ; (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ কর, শশিমুখি, চুপ কর, (হস্ত ধরিয়া) রাখ, আর এক দিন দেখি।

সৈরি। প্রাণনাথ, উপায় কি—আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা হবে। (নেপথ্যে হাঁচি) সত্যি সত্যি—আদুরী আসছে।

[দুইখান লিপি লইয়া আদুরীর প্রবেশ]

আদুরী। চিঠি দুখান কন্‌তে আসেচে মুই কতি পারিনে,মাঠাকুরণ তোমায় দিতে বল্লে।

[লিপি দিয়া আদুরীর প্রস্থান]

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয়, এই দুই লিপিতে জানিতে পারিব—(প্রথম লিপি খুলন)

সৈরি। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপি পাঠ)

"রোকায় আশীর্বাদ জানিবেন—

আপনাকে টাকা দেওয়া প্রুত্যপকার করা মাত্র, কিন্তু আমার মাতা ঠাকুরানীর গতকল্য গঙ্গালাভ হইয়াছে ; তদাদ্যকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিয়াছি—তামাক অদ্যপি বিক্রয় হন নাই। ইতি

শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়"

কি দুর্দৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার। দেখি, তুমি কি অস্ত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। (দ্বিতীয় লিপি খুলন)

সৈরি। প্রাণনাথ, আশা করি নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ—ও চিটি ওমনি থাক—

নবীন। (লিপি পাঠ)।

"প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণ পালিতস্য—

বিনয়পূর্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশয়ের মঙ্গালে নিজ মঙ্গল পরং লিপি প্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি ৩০০ টাকার যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে নিকট পৌঁছিব, বক্রী একশত টাকা আগামী মাসে পরিশোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ দিতে ইচ্ছা করি ইতি।"

সৈরি। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন—যাই, আমি ছোটবউকে বলিগে।[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান]

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারল্যের পুত্তলিকা, এত ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র—এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাই হবে। দেড়শত টাকা হাতে আছে—তামাক কয়েকখান আর এক মাস রাখিলে ৫০০ টাকা বিক্রয় হইতে পারি, তা কি করি, সাড়ে তিন শত টাকাতেই ছাড়িতে হইল, আমলা খরচ অনেক লাগিবে—যাওয়া-আসাতে বিস্তর ব্যয়—এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেয়াদ হয়, তবে বুঝিলাম যে, এ দেশে প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি, আইন কর্তাদিকেরই বা দোষ কি—যাহাদিকের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে, তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয়, তবে কি দেশের সর্বনাশ ঘটে? আহা এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে—তাহাদের স্ত্রী-পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়—উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে, ক্ষেত্রের চাষ সম্পূর্ণ হল না, সকল ক্ষেত্রে বীজবপন হল না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্মূল হল না, বৎসরের উপায় কি? কোথা নাথ, কোথা তাত শব্দে ধুলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন ম্যাজিস্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ

আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা! যদি সকলে আমরনগরের ম্যাজিস্ট্রটের ন্যায় ন্যায়বান হইতেন, তবে কি রাইয়তের পাকা ধানেই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয়? তা হলে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয়? হে লেফটেনান্ট গভরনর! যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি সজ্জন নিযুক্ত করিতে, তবে এমন অমঙ্গাল ঘটিত না। হে দেশপালক। যদি এমত একটি ধারা করিতে যে, মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদির মেয়াদ হইবে, তাহা হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত এবং তাহার এমন প্রবল হইতে পারিত না। আমাদিগের ম্যাজিস্ট্রেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ।

[সাবিত্রীর প্রবেশ]

সাবি। নবীন, সব লাঙ্গাল যদি ছেড়ে দাও তা হলেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গাল গোরু সব বিক্রি কর্য্যে ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে সুখে ভোগ করা যাবে, এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা, আমারও সেই ইচ্ছা। কেবল, বিন্দুর কর্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাস ছাড়িয়া দিলে সংসারনির্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গাল কয়েকখান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শীরঃপীড়া লয়ে কেমন করে যাবে বল দেখি? হা পরমেশ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল! (নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)

[রেবতীর প্রবেশ]

রেবতী। মা ঠাকুরণ, মুই কনে যাব, কি করবো, কল্লে কি, ক্যান্ মত্তি এনেলাম? পরের জাত ঘরে আনে সামাল দিতি পাল্লাম না। বড়বাবু, মোরে বাঁচাও, মোর পাষাণ ফাটে বার হোলো—মোর ক্ষেত্রমণিরি অ্যানেদাও, মোর সোনার পুতুল অ্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেল বেলা পেঁচোর মার সঙ্গে দাসদিগিতি জল আন্তি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চারজন নেটেলাতে বাছারে ধর্য্যে নিয়ে গিয়েছে। পদী সর্বনাশী দেখয়্যে দিয়ে পেলয়েচে। বড়বাবু, পরের জাত, কি কল্লাম, কেন এনেলাম, বড় সাধে সাদ দেবো ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্বনাশ! সর্বনেশেরা সব কত্তে পাবে—লোকের জমি কেড়ে নিচ্ছিস্, ধান কেড়ে নিচ্চিস্, গোরু-বাচুর কেড়ে নিচ্চিস্, লাটির আগায় নীল বুনয়ে নিচ্চিস্,—তা লোক কেঁদেই হোক্, কোকিয়েই হোক্ কচ্চে-এ কি! ভাল মানুষের জাত খাওয়া?

রেবতী। মা! আদাপেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগিচি, যে ক কুড়োয় দাগ মারলি তাই বোনলাম—রেয়ে ছোড়া জমি চসে আর ফুলে ২ কেঁদে ওঠে—মাটেত্তে অ্যাসে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে অ্যানে।

নবীন। সাধু কোথায়?

রেবতী। বাইরি বসে কান্তে নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব, কুলমহিলার অয়স্কান্তমণি, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণীয়া। পিতার স্বরপুর-বৃকোদর

জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্তেই যাইব—কে মন দুঃশাসন দেখিব, সতীত্ব শ্বেত উৎপলে নীলমণ্ডুক কখনই বসিতে পারিবে না। [নবীনের প্রস্থান]

সাবি। সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন।।

যদি নীল বানরের হস্তে হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতেই আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম। এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই—চল ঘোষ-বউ, বাইরের দিকে যাই। [উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোগসাহেবের কামরা

[রোগ আসীন। পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ]

ক্ষেত্র। ময়রিপিসি। মোরে এমন কথা বল না, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি ২ কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না, মোর ভাতার মনে কি ভাববে?

পদী। তোর ভাতারকোথায়, তুই কোথায়, এ কথা কেউ জান্তে পারবে না—এই রাত্রেই আমি সঙ্গো করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জানতি পারলে না—ওপরের দেবতা তো জান্তি পারবে, দেবতার চকি তো ধূলো দিতি পার্‌বো না। আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বলবে, মোর স্বামী সতী বল্যে মোরে যত ভাল বাসবে তত মোর মন তো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক্, আর অজানাই হোক্, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।

রোগ। পদ্দ, খাটের উপরে আন্ না।

পদী। আয় বাচা, তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বলতেহয় ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শূয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ানো। হা হা হা, আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে ২ কত মাতা পুড়ে মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি থাকে। আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশ জন মেয়ে মানুষকে নিদ্দম করিয়া রামকান্ত পেটা করিতে পারি, তখনি হাসিতে ২ খানা খাই—আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভাল বাসি, কুটির কর্মে ওকর্মের বড় সুবিধা হইতে পারে ; সমুদ্রে সব মিশয়ে যাইতেছে। তোর গায় জোর নাই—পদ্ম, টানিয়া আন।

পদী। ক্ষেত্রমণি! লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এস, সাহেব তোরে একটা বিবির পোশাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোশাকের—চট পর্য্যে থাকি সেও ভাল, তবু যেন বিবির পোশাক পরতি না হয়। ময়রা পিসি, মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই—আহা, আহা! মোর মা এত বেল গলায় দড়ি দিয়েছে, মোর বাপ মাথায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মত ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা কাকা দু জনের মধ্যি মুই অ্যাক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ী রেখে আয়, তোর পায়ে পড়ি, পদি পিসি, তোর গু খাই—মা রে মলাম, জল তেষ্টায় মলাম।

রোগ। কুজোঁয় জল আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিদুঁর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি—মোরে নেটেলায় ছুঁয়েচে, মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে তো ঘরে যাতি পারবো না।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্মও গেচে, জাতও গেচে, (প্রকাশ্যে) তা, মা, আমি কি করবো, সাহেবের খপ্পরে পড়িলে ছাড়ান ভার—ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক্, তখন আর এক দিন আসবে।

রোগ। তুমি তবে আমারসঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে আমি নরম করবো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাটাইয়ে দিব—ড্যামনেড্ হোর, হামার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস নি, তাই তো ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়া আনা হইল, আমি সহজে নীলের লাটিয়াল এ কার্যে কখন দিয়াছি? হারামজাদী পদী ময়রাণী!

পদী। তোমার কলিকে ডাকো, সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি, যাস নে, ময়রা পিসি, যাস নে। [পদী ময়রাণীর প্রস্থান]

মোরে কার সাপের গত্তের মধ্যি একা রেখে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপতি লেগিচি, মোর যে ভয়তে গা ঘুরতি লেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার, (দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটয়ে দাও, আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না—(হস্ত ধরিয়া টানন) সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও—তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব, মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতী।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার নজ্জা যাইবে না।

[বস্ত্র ধরিয়া টানন]

ক্ষেত্র। ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও—

[রোগের হস্তে নখ বিদারণ]

রোগ। ইনফরন্যাল বিচ্। (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এইবার তোর ছেনালি ভঙ্গ হবে।

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোর বুকি অ্যাকটা তেলোনালের খোঁচা মার্, মুই স্বগ্‌গে চলে যাই—ও গুখেগোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী জোড়া মরা মরো, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি, তোর হাত মুই এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো ২ করবো, তোর মা-বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়য়ে রলি কেন, ও ভাইভাতারীর ভাই, মার না, মোর প্রাণ বার কর্য়ে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতি পারি নে।

রোগ। চুপরাও, হারামজাদী, ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা।

[পেটে ঘুষি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন]

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা, কোথায় মা, দেখ গো তোমাদের ক্ষেতর মলো গো। (কম্পন)

[জানেলার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ]

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া লইয়া) রে নরাধম, নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খ্রীষ্টানধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা, আহ, আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার!

তোরাপ। সমিন্দি দেঁড়্য়ে যেন কাটের পুতুল—গোড়ার বাক্যি হরে গিয়েচে—বড় বাবু, সমিন্দির কি এমান আছে তা ধরম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর, মুই তেমনি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামান চাবালি, মোর তেমনি হাতের পোঁচা (গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত), ডাকবি, তো জোরার বাড়ী যাবি, (গাল টিপে ধর্য়ে) পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেদের, পাঁচ দিন খাবালি এক দিন খা। (কান মলন)

নবীন। ভয় কি, ভাল কর্য়ে কাপড় পর। (ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান) তোরাপ, তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা কর্য়ে লইয়া পালাই—আমি বুনোপাড়া ছাড়য়ে গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়া যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়্য়ে গিয়েছে, এতক্ষণ বোধ করে বুনোরা ঘুময়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনিলে কিছু বলবে না, তুই তার পর আমাদের বাড়ী যাস, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতেপালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্ তাহা আমি শুনতে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সেঁৎরে পার হয়্যে ঘরে যাব—মোর নছিবির কথা আর কি শোনবা—মুই মোক্তার সমিন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেঙ্গে পেলয়ে একেবারে বসন্তবাবুর জমিদারিতে পেলয়ে গ্যালাম, তার পর নাত করো জবু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই সমিন্দিই তো ওটালে, নাঙ্গাল কর্য়ে কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের ঠ্যালাটি কেমন—তাতে আবার নেমোখারামি কত্তি বলে—কই শালা, গ্যাড ম্যাড করো জুতার গুঁতা মারিস নে? [হাঁটুর গুঁতা]

নবীন। তোরাপ, মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দয় বল্যে আমাদের নির্দয় হওয়া উচিত নয় ; আমি চলিলাম। [ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান]

তোরাপ। এমন বসগারও বেছাপ্পর কত্তি চাস—তোর বড় বাবারে বল্যে মেনয়ে জুনয়ে কাজ মেরে নে, জোর জোরাবতি কদিন চলে, পেলয়ে গেলি তো কিছু কত্তি পার্‌বা না, মরার বাড়া তো গাল নেই। ও সমিন্দি, নেয়েত ফেরার হরি ঝে কুটি কবরের মধ্যি ঢোক্‌বে। বড়বাবুর আর বচুরে টাকাগুনো চুকয়ে দে, আর এ বচোর ঝা বুনতি চাচ্চে তাই নিগে, তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়চে, দাদন গাদলিই তো হয় না, চসা চাই—ছোট সাহেব, স্যালাম, মুই আসি।[চিত করিয়া ফেলিয়া পলায়ন]

রোগ। বাই জোভ! বিটেন টু জেলি। [প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর ভবনের দরদালান

[সাবিত্রীর প্রবেশ]

সাবিত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক) রে নিদারুণ হাকিম, তুই আমাকেও কেন তলব দিলি নে—আমি পতি-পুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম। এ শ্বশানে বাস অপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা! কর্তা আমার ঘরবাসী মানুষ—কখন গাঁ অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফৌজদুরিতে ধর‍্যে নে গেল, তাঁর জেলে যেতে হবে ; ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না, তিনি যে আতপচালের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না, আহা! বুক চাপড়ে ২ রক্ত বার করেছেন, কেঁদে ২ চক্ষু ফুলয়েছেন, যাবার সময়ে বলেন, গিন্নি, এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, মা, তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওঁরে নিয়ে বাড়ী আসবো—বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালি হয়ে গিয়েছে ; টাকার জোগাড় করিতেই যা কত কষ্ট, ঘুরে ঘুরে ঘুর্ণি হয়েছে, পাছে আমি বউদের গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন, মা টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে। গাঁতির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্দক পড়লে বাবার কতই খেদ—বলেন, কিছু টাকা হাতে এলিই মার গহনাগুলিন আগে খালাস কর‍্যে আনবো-বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল—বাবা আমার কাঁদিতে ২ যাত্রা করলেন—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল, আমি ঘরে বসে রলাম—মহাপাপিনি! এই কি তোর মার প্রাণ।

সৈরি। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েচে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন।

সাবিত্রী। (ক্রন্দন করিতে ২) না মা, আমার নবীন বাড়ী না ফিরে এলে আমি আর এ দেহে অন্ন-জল দেব না, বাছারে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন আছে, কষ্ট হবে না। তুমি এস, স্নান করবে।

[তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ]

ছোটবউ, তুমি ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জায়গা করিগে।

[সৈরিন্দ্রীর প্রস্থান, সরলতার তৈলমর্দন]

সাবিত্রী। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসী ফুলের মত মলিন হয়েছেন। আহা আহা! বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই, বাবার কালেজ বন্ধ হবে, বাড়ী আসবেন আশা কর্য্যে রইচি, তাতে এই দায় উপস্থিত। (সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখনো বুঝি কিছু খাউ নি? ঘোর বিপদে পড়ে রইচি, তা বাছাদের খাওয়া হলো কি না দেখিব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাও গে মা, চল আমিও যাই।[উভয়ের প্রস্থান]

৮২.১৩ সারাংশ

গোলোক বসুকে ফৌজদারিতে সোপর্দ করার সংবাদ গোপীনাথ উড সাহেবকে জানিয়েছে। তার সংবাদ মত এর ফলে গোলোক বসু পরিবার অনেকটা বিব্রত হয়ে পড়েছে। নবীনমাধব সাহেবের কাছে আবেদন করেও কোন ফল পায়নি। এদিকে মোকর্দ্দমার জন্য নবীনের পাঁচশত টাকা প্রয়োজন, কিন্তু সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। বড়বৌ ও ছোট বৌ তাদের গয়না নেবার জন্য নবীনকে অনুরোধ করলে তিনি সম্মত হননি। নবীন অতীতের স্বচ্ছল অবস্থা, বর্তমানের দুর্ভাগ্যের জন্য বেদনা বোধ করেন। এমন পরিস্থিতিতে একটি চিঠিতে তিনশত টাকা পাওয়ার সম্ভাবনায় আশ্বস্ত বোধ করেন। অকস্মাৎ রেবতী, তার কন্যা ক্ষেত্রমণির অপহরণের সংবাদ দেয়। নবীন শপথ নেন, সতীর শ্বেতপদ্ম নীলমন্ডুককে তিনি যেতে দেবেন না। সাবিত্রীও তাকে মাণিক্য অপবিত্র হবার পূর্বে নীলবানরদের হাত থেকে রক্ষা করবার আদেশ দেন।

পদী ক্ষেত্রকে রোগ সাহেবের কামরায় ব্যবসায় নানা ভাবে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছে। ক্ষেত্র কোনক্রমে ধর্মকে বিসর্জন দিতে সম্মত হয়নি। বারবার নানা ভাবে প্রতিরোধ রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছে। রোগ বলপূর্বক তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে ক্ষেত্রমণি, তার হাত আঁচড়িয়ে গ্রাম্য ভাষায় কটূক্তি করতে থাকে। ব্যর্থকাম রোগ তখন উত্তেজিত হয়ে গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির পেটে ঘুষি ও মাথার চুল ধরে টানতে থাকে। এমন সময় নবীনমাধব ও তোরাপ রোগের কামরায় প্রবেশ করে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করে। তোরাপ সাহেবকে আঘাত করে চলে যায়।

বসু পরিবারে হতাশার পরিবেশ বিরাজ করছে। নবীন ইন্দ্রাবাদে গিয়েছে গোলোককে মামলা থেকে মুক্ত করবার আশা নিয়ে।

(ইংরেজি নাট্য শাস্ত্রমতে তৃতীয় অঙ্কে নাটকীয় চরমোৎকর্ষ বা Climax থাকে। দ্বিতীয় অঙ্কে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহ এখানে সূচীমুখে প্রবেশ করে। সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। বর্তমান তৃতীয় অঙ্ক চারটি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত। এখানে চতুর্থ গর্ভাঙ্ক বসু পরিবারের প্রতিবেশ সৃষ্টির সহায়ক। মূল সংঘাত

কার্যত দেখতে পাওয়া যায় তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রোগ সাহেবর অত্যাচারের চরম দশ্য ও তার যথোচিত প্রত্যুত্তর নাটকটির চরমোৎকর্ষের উজ্জ্বল উদাহরণ।)

৮২.১৪ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গাঁতি—জমিদারের অধীনস্থ জোত-জমি। অন্তঃকরণে সাপের ডিম পাড়িয়াছে—হতাশ ও বিষাদে পূর্ণ নবীনের মন অনেকটা বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। এই কথাটি বোঝাতে গোপীনাথ বিষধর সাপের উপমা দিয়ে উডকে বোঝাতে চেয়েছে। বেহেতার চলেগা—ভাল ভাবেই চলবে।

আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ—ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী', এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'ভারত ভাস্কর' পত্রিকার সংবাদ ওসম্পাদকীয়তে নীলকরদের অত্যাচারের ভূরি ভূরি সংবাদ প্রকাশিতহোত। নীলকরেরাও 'ইংলিশম্যান' ও 'হুরকরা' পত্রিকাদ্বয়কে অর্থে বশ করে তাঁদের পক্ষে লেখাত। গোপীনাথ ইংরেজদের কাগজই শ্রেষ্ঠ তা বোঝাতে চেয়েছে।

সমজিয়াছি—বুজিয়াছি। শলভ পতন—ধান খেতে পঙ্গাপালের আবির্ভাব। নীল বানরের হস্ত হইতে..... ক্ষেত্রমণির অপহরণ বৃত্তান্তে সাবিত্রী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে নবীনমাধবকে তাকে উদ্ধারের জন্য আদেশ দেন। তিনি বলেন ক্ষেত্রমণির সতীত্ব নাশের পূর্বেই তাকে উদ্ধার করে আনতে পারলে বুঝবেন তিনি সত্যই বীর-প্রসবিনী জননী। বাংলার চিরন্তন মাতৃমূর্তি সাবিত্রীতে নাট্যকার তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন।

আমার ধর্মও গেচে জাতও গেচে—উক্তিটি পদীময়রাণীর। তৃষ্মার্ত সত্ত্বেও ক্ষেত্রমণি সাহেবের জল পান করবে না কারণ লাঠিয়ালরা তাকে ছুঁয়েছে। তাই স্নান না করে সে ঘরে যাবে না। এই কথা শুনে পদীর অন্তরের ধর্ম সংস্কার জেগে ওঠে। সে রোগ সাহেবের উপপত্নী, তদুপরি, পল্লীর সুন্দরীযুবতীদের ধরে এনে সাহেবদের ঘরে তুলে দিয়ে যে পাপ করছে, তার তো আর অন্ত নেই। তাই কতকটা অন্তরের গ্লানিবোধ থেকে এ কথাগুলি বলেছে।

জোরার বাড়ি যাবি আঁ -জবরা বা কঁসাইখানা অর্থাৎ কসাইখানায় পাঠান হবে। বেপালটে—বেকায়দায়। বিটেন টু জেলি—মেরে সপাট্ করা। এড়ো ঘরে না শুলে—বড় সর ঘরে না শুলে (ঘুম আসে না), ঘূর্ণি হয়েছে —মাথা ব্যথা করছে।

তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে—পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসায়, কলভাষিনী সরলতাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রাণ চঞ্চল তরুণী আজ মলিন বদন এবং নীরব।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাছারি

(উড, রোগ, ম্যাজিস্ট্রেট, আমলা আসীন। গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, বাদী-প্রতিবাদীর মোক্তার, নাজির, চাপরাসী, আরদালী, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান)

প্র মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। (সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান)

মাজি। আচ্ছা পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস্য)

সেরেস্তা। (প্র মেক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে? (দরখাস্তের পাতা উল্টায়ন)।

মাজি। (উড সাহেবের সাহিত কথোপকথনানন্তর হাস্য সংবরণ করিয়া) খোলোসা পড়।

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা, ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের পূনর্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা শঠতা প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ লইয়া মিথ্যা বলে, মোক্তারেরা অবিরত অপ্রকৃষ্ট কার্যে রত, বিবাহিত কামিনীকে বিসর্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অমরালয় বারমহিলালয়ে কালযাপন করে, জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে, তবে স্বকার্যসাধন হেতু তাহারদিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়। ধর্মাবতার, মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা। কিন্তু নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবরা খ্রীষ্টিয়ান—খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে ; পরদ্রব্য-অপহরণ, পরনারীগমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে অতিশয় ঘৃণিত, খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে অসৎ কর্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক্, মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকেস্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতেহয়। করুণা, মার্জনা, বিনয়, পরোপকার খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ধর্মাবতার, আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার, আমরা তাঁহারদিগের চরিত্র অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি, আমারদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তালিম দিতে সাহস হয় না, যেহেতু সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সূচ্যাগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতেপারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন—প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজুকুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল, —রাইয়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্মচ্যুত করিয়াছে এবং গোরিব ছাঁপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়াছে প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি) একসট্রিম প্রোভোকেশান, একসট্রিম প্রোভোকেশান।

বা মোক্তার। হুজুর ; হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল, যদ্যপি তাহারা তালিমি সাক্ষী হইত, তবে সেই সোয়ালেই পড়িত, আইন-কারকেরা বলিয়াছেন, "বিচারকর্তা আসামীর আডভোকেট স্বরূপ", সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল, তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে, অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্বার আনয়ন করিলে আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। ধর্মাবতার, সাক্ষিগণ চাস-উপজীবী দীন প্রজা, তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গাল ধরিয়া স্ত্রী-পুত্রের প্রতিপালন করে, তাহারদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহারদিগের আবাদ ধ্বংশ হইয়া যায়, বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে চাসের হানি হয় বলিয়া তাহারদের মেয়েরা গামছা বান্ধিয়া অন্নব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহারদের খাওয়াইয়া আইসে ; চাসারদিগের একদিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্বনাশ উপস্থিত হয়, এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহারদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়, ধর্মাবতার, ধর্মাবতার যেমন বিচার করেন।

মাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না, আমিন খালাসীর সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব, অথবা তাঁহার দেওয়ান, ঘোড়া চড়িয়া ময়দানে গমনপূর্বক উত্তম ২ জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন, পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন, দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে ২ বাড়ী যায়, যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে সে দেবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাত পুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন। রাইয়তেরা পাঁচ জন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ ২ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে, তাহারদিগের সলা-পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই মাথার ঘায়ে কুক্কুর পাগল, এমন রাইয়তে সাক্ষী দিয়া গেল যে তাহাদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল, কেবল আমার মক্কেল তাহারদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহারদের নীলের চাষ রহিত করিয়াছে, এ অতি আশ্চর্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্মাবতার, তাহারদিগের পুনর্বার হুজুরে আনান হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহারদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু করাল নীলকর নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাসাদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, এ কথা স্বীকার করি, এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেকবার সফলও হইয়াছেন তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য, নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না ; ধর্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক, তাহা জেলার সকল লোকে জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে—

গোলোক। বিচারপতি, আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুক্‌য়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারির

ভয়েতে ৬০ বিঘা নীলের দাদন চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন, "পিতা, আমারদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিংবা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকলাপি বন্ধ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না, কিন্তু যাহারদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, তাহারদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।" বড়বাবু এ কথা বিজ্ঞের মত বলিলেন, আমি কাজে কাজেই বলিলাম, তবে সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ৫০ বিঘায় রাজি করগে। সাহেব হাঁ, না, কিছুই কলেন না, গোপনে ২ আমাকে এই বৃদ্ধ দশায় জেলে দেবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই-ব্রাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদিও হাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর ২ সাহেবকে একশত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রায়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়?

প্র মোক্তার। ধর্মাবতার, যে ৪ জন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার একজন টিকিরি, তার কোন পুরুষে লাঙ্গাল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সারেজমিতে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই, সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই ২ কারণে আমি তাহারদের পূনর্বার কোর্টে আননের প্রার্থনা করি— ব্যবস্থাকর্তরা লিখিয়াছেন, নিষ্পত্তির অগ্রে আসামীকে সকলপ্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্তব্য, ধর্মাবতার, আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

মাজি। (লিপি লিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বা মোক্তার। হুজুর, এসময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি, সাক্ষীদিগকে আনান হয়, যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্মাবতার, গোলোক বসের কুচরিত্রের কথা দেশ-বিদেশ রাষ্ট্র আছে, যে উপকার করে তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এদেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমত মহাপুরুষদিগের মহৎ কার্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে,তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়?

মাজি। (লিপির শিরোনামো লিখন) চাপরাসী!

চাপ। খোদাবন্দ্। (সাহেবের নিকট গমন)

মাজি। (উডের সহিত পরামর্শ) বিবি উড্কা পাস্ দেও—খানসামাকো বোলো, বাহারকা সাহেবলোক আজ যাগা নেই।

সেবেস্তা। হুজুর, কি হুকুম লেখা যায়?

মাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে। (ম্যাজিস্ট্রেটের দস্তখত) ধর্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখত হয় নাই—

মাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে ২০০ শত টাকা তাইনে ২ জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সাফিনা জারী হয়।

(ম্যাজিস্ট্রেটের দস্তখত)

মাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল পেশ কর।

[ম্যাজিস্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসী ও আরদালীর প্রস্থান]

সেরেস্তা। নাজির মহাশয়, রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।

[সেরেস্তাদার, পেশকার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান]

নাজির। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে, বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি—

প্র মোক্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু কিছু নাই, (নাজিরের সহিত পরামর্শ) গহনা বিক্রি করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকও নাই, ব্যবসায়ও নাই, আবাদও নাই। এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে এক শত টাকায় রাজী হওয়া, চল আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন, ওদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কিনা। [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদ, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী

(নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন)

নবীন। আমার কাজে কাজেই বাড়ী যাইতে হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবো কি, দেখ পিতা যেন কোন মতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠাইয়া দিব, যে যতটাকা চাহিবে তাহাকে তাহাই দিবা।

বিন্দু। জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দেও মিনতিও কর। আহা! বৃদ্ধ শরীর! তিনদিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত মিনতি করিলাম—বলে, "নবীন! তিন দিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপমুখে কিছুমাত্র দিব না।"

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে দুটি অন্ন দিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস

মূঢ়মতি ম্যাজিস্ট্রটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন, তাহা এখন পর্যন্ত নামাইলেন না। পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইয়াছে, যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন। নীরব, শীর্ণকলেবর, স্পন্দনহীন, মৃতকপোতববৎ কারাগার-পিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চার দিন, আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে কি কষ্টই দিতেছ। বিন্দু, তোমাকেরাত্র-দিন জেলে থাকিতে দেয় তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বল্যে ধরে দেন, আমি একবার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্তা মশায়রে চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু, তুমি এমনি সাধুই বটে। আহা! ক্ষেত্রমণির সাংঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘনিশ্বাস) বড়বাবু, মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব? আমার যে আর নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক্ দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নির্ব্যাধি হইবে, ডাক্তারবাবুর আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর্য্যে ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

[ডেপুটী ইনস্পেকটারের প্রবেশ]

ডেপু। বিন্দুবাবু আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিসনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেফটেনান্ট গবর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপু। অমরনগরের আসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রট একজন মোক্তারকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক দিয়াছিল, তাহার ১৬ দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন কি হবে, গবর্ণর সাহেব অনুকূল হইয়াপ্রতিকূল ম্যাজিস্ট্রটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি খণ্ডন করবেন?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন। আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে।

[নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান]

ডেপু। আহা, দুই ভাই দুঃখে দগ্ধ হইয়া জীবনন্মৃত হইয়াছেন। লেফটেনান্ট গবর্ণরের নিষ্কৃতি অনুমতি সহোদরদ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জীবিতকরিবে। নবীনবাবু অতি বীর পুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, কিন্তু নির্দয় নীলকর-কুজ্ঝটিকায় নবীন বাবুর সদগুণসমূহ মুকুলেই ম্রিয়মাণ হইল।

[কালেজের পণ্ডিতের প্রবেশ]

আসতে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ম; রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েক দিন শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর, বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

ডেপু। বিষ্মুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে। বিষ্মু বাবুর জন্যে বিষ্মুতৈল প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয়, আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপু। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাই নে?

পণ্ডিত। তিনি এ স্ববৃত্তি ত্যাগ করিবারপন্থা করিতেছেন—সোনার চাঁদ ছেলে উপার্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার রাজার মত নির্বাহ হইবে। বিশেষ বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন কর্য্যে কালেজে যাওয়া-আসা ভাল দেখায় না, বয়স তো কম হয় নাই।

[বিন্দুমাধবের পুনঃপ্রবেশ]

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন—

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমন অবিচার করেছে। তোমরা শুনিতে পাও না, বড় দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার। কাজির কাছে হিন্দুর পরোব।

বিন্দু। বিধাতার নির্বন্ধ।

পণ্ডিত। মোক্তার দিয়াছিলে কাহাকে?

বিন্দু। প্রাণধন মল্লিককে।

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তারনামা দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত ; সকল দেবতাই সমান, ঠক বাচতে গাঁ উজোড়।

বিন্দু। কমিসনার সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার। যেমন মাজিস্ট্রেট, তেমনি কমিসনার।

বিন্দু। মহাশয় কমিসনারকে বিশেষ জানেন না, তাই এ কথা বলিতেছেন। কমিসনার সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি-আকাঙ্খী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণ ভগবানের আনুকূল্যে তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল। জেলে কি অবস্থায় আছেন?

বিন্দু। সর্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিনদিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। আমি এখনি জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিব।

[একজন চাপরাসীর প্রবেশ]

তুমি জেলের চাপরাসী না?

চাপ। মশাই, এটটু জলদি করে আসেন। দারগা ডেকেচেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ?

চাপ। আপনি আসেন। আমি কিছু বলতে পারি নে।

বিন্দু। চল বাপু (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না, আমি চলিলাম।

[চাপরাসী ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান]

পণ্ডিত। চল আমরাও জেলে যাই, বোধহয়, কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে। [উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা

(গোলকচন্দ্রের মৃতদেহ উড়ানি পাকান দড়িতে দোদুল্যমান। জেল দারোগা এবং জমাদার আসীন)

দারো। বিন্দুমাধব বাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে?

জমা। মনিরদ্দি গিয়েছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারে না।

দারো। মাজিস্ট্রট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমা। আজ্ঞে না, তাঁর আর চারদিন দেরি হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমারদিকের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখান চিটিতে এ গোরিবকে জেলের জমাদ্দার করিয়া দিয়াছেন।

দারো। আহা! বিন্দুবাবু পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছেন, এ দশা দেখলে প্রাণত্যাগ করিবেন।

[বিন্দুমাধবের প্রবেশ]

সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। এ কি, এ কি, আহা! আহা! পিতার উদ্ধন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি, কি মনস্তাপ। (নিজ মস্তক গোলোকের বক্ষে রক্ষা করিয়া মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্বক ক্রন্দন) পিতা, আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। বিন্দুমাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে "স্বরপুর-বৃকোদর" বলা শেষ হইল? বড় বধূকে "আমার মা, আমার মা" বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দ-বিবাদ, তাহার সন্ধিকরিলেন। হা! আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধ কর্তৃক হত হইলে শাবকবেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে জননী আমার তোমার উদ্ধন্ধন সংবাদে সেইরূপ হইবেন—

দারো। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দুবাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া অমৃতঘটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

[ডেপুটী ইনস্পেকটার এবং পণ্ডিতের প্রবেশ]

বিন্দু। দারগা মহাশয়! আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয় পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটীবাবুর সহিত করুন, আমার শোকবিকারে বাক্যরোধ হইয়াছে, আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি।

[গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্বক উপবিষ্ট]

পণ্ডিত। (ডেপুটি ইনস্পেকটরের প্রতি) বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি, তুমি বন্ধন উন্মোচন কর—এ দেবশরীর এ নরকে ক্ষণকালও রাখা নয়—

দারো। মহাশয়, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে হইবে—

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল? নতুবা এমত স্বভাব হইবে কেন?

দারো। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন—

[ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ]

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব। গডস্ উইল—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয়-আশয় সব গিয়াছে, অবশেষ পিতা আমাদিগকে পথের ভিক্ষারি করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন (ক্রন্দন) অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে?

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্বস্ব লইয়াছে—

ডাক্তার। পাদরি সাহেবদের মুখে আমি প্লানটার সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুটি হইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে, আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুইজন রাইয়ত বাজারে যাইল, এক জনের হস্তে দুগ্‌দো আছে, আমি দুগ্‌দো কিনিতে চাহিল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে কিঞ্চিৎ করে বলিল "নীলমামদো, নীলমামদো", দুগ্‌দো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কহিল, রাইয়ত দুইজন দাদনের ভয়েপলাইয়াছে। আমি দাদন লইয়াছি আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে। আমি বুঝিলাম আমাকেপ্লানটার লইয়াছে।রাইয়তের হস্তে দুগ্‌দো দিয়া আমি গমন করিলাম।

ডেপু। ভ্যালি সাহেবের কান্সারণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব যাইতেছিলেন। রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়েছে, নীলভূত বেরিয়েছে' বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদরিসাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শনকরিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর-পীড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত অন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহারা

তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল, এখন রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে "একে ঝাড়ের বাঁশ বটে—কোনখানায় দুর্গাঠাকুরণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।"

পন্ডিত। আমরা মৃত শরীরটী লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে। আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

[বিন্দুমাধব এবং ডেপুটী ইনস্পেকটার বন্ধনমোচনপূর্বক
মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান]

৮২.১৬ সারাংশ

নাটকের ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু ইন্দ্রাবাদ—ফৌজদারি কাছারি, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী এবং জেলখানা—তিনটি গর্ভাঙ্কে সন্নিবিষ্ট। প্রথমেই দেখা যায়, গোলোক বসু পরিবারের মোক্তার বিচারকের কাছে এই প্রার্থনা রেখেছে যে, আসামী (গোলোক বসু) ও তার মোক্তারের অনুপস্থিতিতে যাদের সাক্ষী নেওয়া হয়েছে, তাদের পুনর্বার হাজির করা হোক। নীলকরদের বেতনভোগী মোক্তার অযথা নীলকরদের স্তুতি করে এর প্রতিবাদ করে। তাঁর অন্যতম বক্তব্য দয়াশীল, ধর্মজ্ঞানী নীলকররা এদেশের গুপ্তনিধি বের করে এনে দেশের মঙ্গলসাধন ও রাজকোষ বৃদ্ধি করছে। সুতরাং এর যারা বিরুধাচরণ করে, তাদের কারাবাস করা উচিত। মোক্তার চরম হীনতার পরিচয় দিয়ে ধার্মিক নিরীহ গোলোক বসুর চরিত্র সম্বন্ধেও কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ করে। প্রতিবাদী মোক্তারের কোন তথ্য যুক্তিই তারা মানেনি।বিচারকের আসনের পাশে উড ও রোগ বসে থেকে সময়োচিত মত ও মন্তব্য প্রকাশ করে বিচারককে পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে। পরিশেষে তিনি আদেশ দিলেন—দুশ টকা জামিনে গোলোক বসুকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। অতঃপর ডেপুটি ইনস্পেক্টরের কাছ থেকে জানা গেল কমিশনার সুপারিশ করেছেন গভর্নর সাহেবের অনুমোদনক্রমে গোলোক বসুর মুক্তির ব্যবস্থা করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ধর্মভীরু, নিরীহ বৃদ্ধ গোলোক বসুর পক্ষে এই বিচার চরম লাঞ্ছনা বিশেষ। কারাবাসে থাকবার বিড়ম্বনা তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। সৎ, ন্যায়পরায়ন এই মানুষটি বিচারের এই প্রহসন মেনে নিতে পারেননি। অপমানিত বৃদ্ধের হৃদয় মন এর ফলে বিদীর্ণ হয়েছে । তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীনমাধবের কাছেও এ এক চরম সঙ্কটকাল। তিনি স্থির করেছেন, প্রয়োজনে সর্বস্ব বিক্রী করে পিতার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। বিন্দুমাধবের বাড়ীতে ইতোমধ্যে সংবাদ আসে জেল দারোগা তাকে সত্বর উপস্থিত হবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। বিন্দুমাধব জেলে গিয়ে দেখেন গোলোক অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে ঔদ্ধন্ধান আত্মহত্যা করেছেন বিন্দুমাধব গভীর শোকে আপ্লুত হলেন।

৮২.১৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মজুকুব—কর্মচারী। হেতুবাদ দেখা যায় না—উক্তিটি ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের। হেতু অর্থাৎ কারণ বা প্রয়োজন—অর্থাৎ সাক্ষীদের আনার প্রয়োজন নেই। আসামী ও তার মোক্তারের অনুপস্থিতি সাক্ষ্য নেওয়ায় প্রতিবাদী মোক্তার সাক্ষীদের পুনরায় আদালতে হাজির করবার কথা বলায়, উডের পরামর্শে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট একথা বলেছেন। বিচারের প্রহসনের এটি এ কটি উদাহরণ। উহার কাছে প্রজার বিচার—যেখানে বিচারক নিজেই নীলকরদের বশীভূত সেখানে নীলকরের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুবিচার হতে পারে না।

আপনি বুঝি নরকের দ্বারাপাল—উক্তিটি পণ্ডিত মহাশয়ের। পণ্ডিত ডেপুটি ইনসপেকটরকে উদ্বন্ধন থেকে গোলোকচন্দ্রকে বন্ধন মুক্ত করতে অনুরোধ করলে জেল দারোগা ডাক্তারের অনুমতি ব্যতিরেকে নামান যাবে না বলেন। পণ্ডিত মহাশয় তাকে নীলকরদের পক্ষভুক্ত মনে করে একথা বলেছেন।

কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠামো.....হাড়ির ঝুরি—উক্তিটি ডেপুটি ইনসপেক্টরের। সাধারণ প্রজারা সকলেই সাহেব মাত্রেই দুরাচারী—'নীলভূত', নীল মামদো' মনে করে। কিন্তু জনৈক সাহেব পাদরীর বদান্যতা, বিনয়, ক্ষমাসুন্দর আচরণ রাইয়তদের বিস্ময়াপন্ন করে। পাদরিদের প্রতি শ্রদ্ধায় মানত হয়। এ থেকেই তারা পারস্পরিক আলোচনায় আলোচ্য মন্তব্যটি করেছে। যার 'মূল অর্থ, এক ঝাড় থেকে বাঁশ কাটলেও, তা নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। কোনটি দিয়ে দূর্গা প্রতিমার কাঠামো যেমন হয় তেমনি কোনটি দিয়ে হাড়ি-বাগদীরা ঝুড়ি বানাবার কাজে লাগায়। পাদরী ও নীলকরেরা ইংরেজ হলেও, তাদের স্বভাবে ও আচরণের পার্থক্য জনিত কারণে একজন হয় ভক্তির পাত্র ওপর জন হয় ঘৃণা, নিন্দার যোগ্য।

৮২.১৮ নীল-দর্পণ মূলপাঠ—৫

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

[গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ]

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন করে?

গোপ। মোরা হলাম পত্তিবাসী, সারাক্ষুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি লেগেচি, নুন না থাকলি নুন চেয়ে

আনচি, তেলপলাডা তেলপলাডাই আনলাম, ছেলেডা কান্তি লাগলো গুড় চেয়ে দেলাম—বসিগার বাড়ী সাত পুরুষ খেয়ো মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকি নে?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায়?

গোপ। ঐ যে কি গাঁডা বলে, কলকাতার পচ্চিমি, যারা কায়েদগার পইতে কত্তি চেয়লো—যে বামুন আচে ইদিরি খেবয়ে ওটা যায় না আবার বামুন বেড়য়ে তোলে— ছোটবাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল সাহেব টুপি না খুলে এসতি পারে না। পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয়? ছোট বাবুর ন্যাকাপড়া দেখে চাসাগাঁ মানলে না। নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমক মারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না, কিন্তু বসিগার বৌর মত শান্ত মেয়ে তো আর চোকি পড়ে না, গোমার মা পত্যই ওনাদের বাড়ি যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েচে, এক দিন মুখখান দ্যাখতি প্যালে না। যে দিন বে করে আনলে মোরা সেই দিন দেখেলাম—ভাবলাম, সউরে বাবুরো ব্যাংরাজ-প্যাঁসা, তাইতে বিবির ন্যাকাৎ মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটী সর্বদাই শ্বাশুড়ীর সেবার নিয়ুক্ত আছে।

গোপ। দেওয়ানজী মশাই, বলবো কি, গোমার মা বল্লে, মোগার পাড়াতেও আষ্ট, ছোট বউ না থাকলি, যে দিনি গলায় দড়ির খবর শুনেলো, সেই দিনিই মাঠাকুরণ মরতো—শুনেলেম সউরে মেয়েগুলো মিন্‌সেগার ভ্যাড়া কর্য়ে আখে, আর মা-বাপেরি না খ্যাতি দিয়ে মারে, কিন্তু ও বউডোরে দেখে জানলাম, এডা কেবল গুজোব কথা।

গোপী। নবীন বসের মাও বোধ করি বউটিকে বড় ভাল বাসে।

গোপ। মাঠকুরণ যে পিরতিমির মধ্যে কারে ভাল না বাসেন, তাও তো দেখ্‌তি পাইনে। আ! মাগী যেন অন্নপুন্নো, তা তোমরা কি আর অন্ন একেচ যে তিনি পুন্নো হবেন—গোড়ার নীলি বুড়বে খেয়েচে, বুড়ীরিও খাবে ২ কত্তি নেগেচে।—

গোপী। চুপ কর গুওডা, সাহেব শুনলে এখনই অমাবস্যা বার করবে।

গোপ। মুই কি করবো,তুমি তো খুঁচিয়ে ২ বিষ বার কত্তি নেগেচো, মোর কি সাধ, কুটিতে বসি গোডার শালারে গালাগালি করি।—

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে—মিথ্যা মোকদ্দমা কর্য়ে মানী মানুষটোরে নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মার এই মলিন দশা দেখে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।—

গোপ। ব্যাঙ্গোর সর্দি—দেওয়ানজী মশাই খাপা হবেন না, মুই পাগল-ছাগল আছি, একটা তামাক সাজে আনবো?

গোপী। গুয়োজা নন্দর বংশ, ভোগোলের শেষ।—

গোপ। সাহেবেরাই সব কত্তি নেগেচে, সাহেবেরা কামার, আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোডার কুটিতে দ পড়ে, গেরামের নোক নেয়ে বাঁচে।—

গোপী। তুই গুওড়া বড় ভেমো, আমি আর শুনতে চাই না—তুই যা, সাহেবের আসবার সময় হইয়েছে।—

গোপ। মুই চল্লাম, মোর দুদির হিসেবডা কর্য়ে মোরে কাল একটা টাকা দিতি হবে, মোর গঙ্গাচ্ছানে যাব।—

[প্রস্থান]

গোপী। বোধ করি, ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুনবে, তা কেহ রাখিতে পারিবে না—সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসরের টাকা না পেয়েও ৫০ বিঘা নীল করিতে একপ্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে, তাতেও মন উঠিল না। পূর্ব মাঠের ধানি জমি কয়েকখানার জন্যেই এত গোলমাল, নবীন বসের দেওয়াই উচিত ছিল—শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এক কামড় কামড়াবে। — (সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই যে শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন। আমাকে হয় তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাকতে হয়।

[উডের প্রবেশ]

উড। এ কথা যেন কেহ না জানতে পারে, মাতঙ্গানগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব সেখানে থাকবে। এখানকার জন্যে দশজন পোদ সুড়্কিওয়ালা জোগাড় কর্য়ে রাখবে—আমি যাব, ছোট সাহেব যাবে, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পারবে না, বেমো আছে, কেমন করিয়া দারোগার মদৎ আন্তে পারবে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে, সড়কিওয়ালার আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে, বিশেষ জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতে ব্যাটা বড় শাসিত হইয়াছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্কেলের সুখ হইল—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা তেমনি করবে। শালা আমার কুটির বদনাম কর্য়ে দিয়াছে। হারামজাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার করবো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের মত হাকিম, আইলে বজ্জাত সব কত্তে পারবে।

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমার যে সূত্র করিয়াছে, যদি নবীন বসের এ বিভ্রাট না হতো, তবে এতদিন ভয়ানক হইয়া উঠিত—এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন, তিনি শুনিয়াছি, রাইয়তের পক্ষ আর মফস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম্ ভয় ভয় কর্কে হাম্কো ডেক্ কিয়া, নীলকর সাহেবকো কোই কামমে ডর হ্যায়? গিধ্বড়কি শালা, তোমারা মোনাসেফ না হোয়্ কাম ছোড় দো।

গোপী। ধর্মাবতার, কাজেই ভয় হয়—সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ৬ মাসের বাকী মাহিনা লইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন, দরখাস্ত করিলে পর আপনি হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাশ ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্মাবতার, চাকর কয়েদ হলে বিচার এই?

উড। আমি জানি না? ও শালা, পাজি নেমকহারাম বেইমান। মাহিনার টাকায় তোমাদের কি হইয়া

থাকে? তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর তবে কি ডেডলি কমিশন হইত? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে ২ পাদরি সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছি, মাল কম পরিলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব—অ্যার‍্যান্ট কাউয়ার্ড, হেলিশ নেভ।

গোপী। আমরা হুজুর, কসায়ের কুকুর—নাড়ী ভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্মাবতার, আপনারা, যদি মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেইরূপে নীল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না, আমীন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আর আমাকে 'গুপে গুওটা, গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না।

উড। তুমি গুওটা। ব্লাইন্ড, তোমার চক্ষু নাই—

[একজন উমেদারের প্রবেশ]

আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি, (আপন চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগর সঙ্গে বিবাদ করে। তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্মাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে, নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।

গোগী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ। কর্ম কিছু খালি নেই। (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু এরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম অবগত, হইলে শ্যামচাঁদ-শক্তিশেলে অনাহারী প্রজারূপ সুমিত্রা-নন্দন-নিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজন—মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না—আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে, শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে মহাজনের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্মাবতার, খাতকদিগের সংবৎসরের যত টাকা আবশ্যক, সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন, তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয়, বৎসরান্তে তামাক ইক্ষু তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে অথবা বাজারদরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্য যাহা জন্মে, তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাড়িতে অথবা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়, ইহার পর যাহা থাকে, তাহাতে ৩/৪ মাস ঘরখরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশতঃ কিংবা খাতকের অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিংবা ধান্য বাকি পড়ে, তাহা বকেয়া বলিয়া নতুন খাতায় লিখিত হয়, বকেয়া বাকি ক্রমে ২ উসুল পড়িতে থাকে, মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না, সুতরাং যাহা বাকি পড়ে, তাহা মহাজনদিগের আপাততঃ লোকসান বোধ হয় এই জন্য মহাজনেরা কখন ২ মাঠে যায়, ধানের কারকীত রীতিমত হইতেছে কি না দেখে, খাজানা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে, তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোন ২ অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্বদাই ঋণে বিরত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও

কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, "নীলমামদো" হইয়া যায় না (জিব কেটে) ধর্মাবতার, এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমার ছাড়ন্তো শনি ধরিয়াছে, নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ, নইলে তুই এত বেয়াদব হইয়াছিস কেন? বজ্জাত, ইন্‌সেস্‌চিউয়স ব্লুট।

গোপী। ধর্মাবতার, গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা, কুটিতে ডিসপেনসারি স্কুল হইলেই আপনারা, খুব-গুমি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমরা অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে, তা গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চৎকে একটা সাহসী কার্য করিতে বলি, শালা ওমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে—আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে—নবীন বসকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না?

গোপী। আপনি গরিবের মা বাপ, গরিব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বস্‌কে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপরাও, ইউ ব্যাসটার্ড অভ হোরস বিচ্। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাৎ মুলাকাৎ করেগা, শালা কাউয়ার্ড কায়েতবাচ্ছা (পদাঘাতে গোপীর ভূমিতে পতন) কমিস্যনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্বনাশ কত্তিস, ডেভিলিষ নিগার। (আর দুই পদাঘাত) এই মুখে তোম কাওটকা মাফিক কাম্ ডেগা—শালা কায়েত—কালকো কাম দেখ্‌কে হাম তোম্‌কা আপ্‌সে জেলমে ভেজ দেগা।

[উড এবং উমেদারের প্রস্থান

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে ২ উঠিয়া) সাতশত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়, নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন করে্যে? কি পদাঘাতই করিতেছে, বাপ্। বেটা যেন আমার কালেজ আউট-বাবুদের গৌনপরা মাগ।

(নেপথ্যে) ডেওয়ান্, ডেওয়ান!

গোপী। বন্দা হাজির। এবার কার পালা—

"প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ।"

[গোপীর প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

(আদুরী বিছানা করিতে করিতে ক্রন্দন)

আদুরী। আহা! হা হা, কনে যাব, পরাণ ফ্যাটে বার হলো, এমন কর্য্যেও ম্যারেচে, কেবল ধুক ধুক কত্তি নেগেচে, মা ঠাকুরণ দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে। কুটি ধর্য্যে নিয়ে গিয়েচে ভেবে তানারা

গাচ্‌তলায় আঁচড়া-পিচড়ি করি কান্তি নেগেচেন, কোলে করে যে মোদের বাড়ী পানে আনলে তা দেখতি পালন না।

(নেপথ্যে) আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব।

আদুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই।

[মূর্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করতঃ সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ]

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায়?

আদুরী। তানারা গাছতলায় দেঁড়য়ে দেখতি নেগেলেন, (তোরাপকে দেখায়ে) ইন যখন নে পেলয়ে গ্যালেন, মোরা ভাবলাম, কুটি নিয়ে গেল, তানারা গাছতলায় আঁচ্‌ড়া-পিচ্‌ড়ি কত্তি নেগ্‌লো, মুই নোক ডাক্‌তি বাড়ী আলাম। মরা ছেলে দেখে মাঠাকুরণ কি বাচবে? তোমরা এট্ট দাঁড়াও, মুই তানাদের ডাকে আনি।

[আদুরীর প্রস্থান]

[পুরোহিতের প্রবেশ]

পুরো। হা বিধাতঃ! এমন লোককেও নিপাত করিলে! এত লোকের অন্ন রহিত হইল। বড় বাবু যে আর গাত্রোস্থান করেন, এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মনুষ্যকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথীতীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রীঠাকুরাণীর অনুরাধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। শ্রাদ্ধের পর এ স্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন, আরও দুর্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না, তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন?

সাধু। বড় বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেকরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "যে কএক দিন এখানে থাকা যায়, আমরা কুআর জল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আদুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না।" বড় বাবু বলিলেন, "আমি ৫০ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পারে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না।" এই স্থির করিয়া বড় বাবু আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে ২ সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর, আমি আপনাকে ৫০ টাকা সেলামি দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল করিবেন না, আর যদি এই ভিক্ষা না দেন, তবে টাকা লইয়া গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের দিন পর্যন্ত বুনন বহিত করুন।" নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, বেটা বল্যে, "যবনের জেলে চোর-ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে, সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে" এবং পায়ের জুতা বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, "তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।"

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত দান)

সাধু। অমনি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়্যে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুটির জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশজন সুড়কীওয়ালা বড়বাবুকে ঘেরাও করিল, ইহাদিগকে বড়াবাবু একবার ডাকাতি মকদ্দমা হতে বাঁচাইয়াছেন, বেটারা বড় বাবুকে মারিতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল। বড়সাহেব উঠিয়া জমাদ্দারকে একটা ঘুষি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর মাথায় মারিল, বড়বাবুর মস্তক ফাটিয়া গেল এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতরে যাইতে পারিলাম না, তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড়াবাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ কর্য়ে বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন, "তুই এট্টু তফাৎ থাক্, জানি কি ধরা পাকড়া করে নে যাবে।" মোর উপর সুমিন্দিদের বড় গোসা, মারা মারি হবে জানলি মুই কি নুকয়ে থাকি? এট্টু আগে যাতি পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচয়ে আনতি পাত্তাম, আর দুই সমিন্দিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড় বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মদ্যে গেল, তা সমিন্দিগার মারবো কখন—আল্লা! বড়বাবু মোরে এত বার বাঁচালে, মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না। (কপালে ঘা মারিয়া রোদন।)

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি।

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পৌঁছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়, বড়াবাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

"বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্ত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরো জানাতি সারতাম্।।"

বড়বাড়ীর জনপ্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপর গ্রামনিবাসী ভিন্নজাতি তোরাপ বড়াবাবুর নিকটে বস্যে রোদন করিতেছে। আহা! গোরিব খেটে খেগো লোক, হস্তখানি একেবারে কাটিয়া দিয়াছে—উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তরোয়াল মারিলে পর, নেজ মাড়িয়ে ধরিলে বেঁজি যেমন ক্যাচ ক্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে তেমনি বড় সাহেবের নাক কাম্ড়ে লইয়া পালাইয়াছিল।

তোরাপ। নাকটা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি, বড়বাবু বেঁচে উটলি দ্যাখাবো, এই দেখ (ছিন্ন নাসিকা দেখাওন)। বড়বাবু যদি আপনি পালাতি পাত্তেন, সমিন্দির কান দুটো মুই ছিঁড়ে আনতাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম আছেন, শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল, বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি নুক্‌য়ে থাকি, নাত কর্‌য়ে পেল্‌য়ে যাব, সমিন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেট্‌য়ে দেবে।

[নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার সেলাম করিয়া প্রস্থান]

সাধু। কর্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েছেন, বড়বাবুর এ দশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না, আপনি একবার ডাকুন দিকি।—

পুরো। বড়বাবু! বড়বাবু! নবীনমাধব! (সজল নয়নে) প্রজাপালক! অন্নদাতা!—চক্ষু নাড়িতেছেন। আহা! জননী এখনি আত্মহত্যা করিবেন। উদ্বন্ধনবার্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দশদিবস পাপ পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিবেন না, অদ্য পঞ্চম দিবস, প্রত্যূষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং বলিলেন, "মাতঃ, যদি অদ্য আপনি আহার না করেন, তবে মাতৃ-আজ্ঞা-লঙ্ঘন-জনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্বক আমি হবিষ্য করিব না, উপবাসী থাকিব।" তাহাতে জননী নবীনের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি রাজমহিষী ছিলেম, রাজমাতা হলেম, আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না, যদি মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পরিতাম, এমন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল? এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা, তোমার এবং বিন্দুমাধবের চেয়ে আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব, তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেল না।" বলিয়া নবীনকে পঞ্চম বর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

[নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি]

আসিতেছে।

(সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী, নবীনের খুড়ী এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীর প্রবেশ) ভয় নাই, জীবিত আছেন—

সাবিত্রী। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব! বাবা আমার, বাবা আমার, বাবা আমার, কোথায়, কোথায়,—উহুহু!

[মূর্চ্ছিত হইয়া পতন]

সৈরি। (রোদন করিতে করিতে) ছোটবউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণ ভর্‌য়ে দর্শন করি। (নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্টা)

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত, পতিরতা সুলক্ষণা ভার্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত হয়, চক্ষু নাড়িতেছেন, নির্ভয়ে সেবা কর। সাধু, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জ্ঞানসঞ্চার হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে থাক।

[প্রস্থান]

সাধু। মাঠাকুরুণের নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বহিতেছে, কিন্তু মাথা দিয়া এমন আগুন বাহির হতেচে, যে আমার গলা পুড়ে যাচ্যে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আন্‌তে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন নাকি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই।

[প্রস্থান]

সৈরি। আহা! আহা! প্রাণনাথ' যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, সেই জননী তোমার নিকটে মূর্ছিত হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলে না! (সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন—প্রাণনাথ। একবার নয়ন মেল্যে দেখ, একবার দাসীরে অমৃতবচনে দাসী বল্যে ডেকে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর—মধ্যাহ্নসময় আমার সুখ-সূর্য অস্তগত হইল— আমার বিপিনের উপায় কি হইবে? (রোদন করিতে ২ নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন)

সর। ওগো, তোমরা দিদিকে কোলে করেব ধর।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম, আহা। এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুটিতে ধর্য্যে নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল। কাঙ্গালিনী জননী আমায় নিয়ে মামার বাড়ী যান, পতিশোকে সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়, মামারা আমাকে মানুষ করেন, আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর কর্য্যে তুলে লয়্যে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, আমি জনক-জননীর শোক ভুলে গিয়েছিলাম, প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন, (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার সকল শোক নূতন হইতেছে, আহা! সর্বাচ্ছাদক স্বামিহীন হইলে আমি আবার পিতামাতাবিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব।

(ভুতলে পতন)

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন, মা! বিন্দুমাধবকে ডাক্তার আন্‌তে লিখে দিয়াছে, ডাক্তার আইলেই ভাল হবেন।

সৈরি। সেজো ঠাকুরুণ, আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম, আলপনায় হস্ত রাখিয়া বল্যেছিলাম, যেন রামের মত পতি নাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই। সেজোঠাকুরণ, বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন, আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী, অবিরল অমৃত-মুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী, স্নেহপূর্ণ-লোচন প্রফুল্লবদন বধূমাতা বধূমাতা বলেই চরিতার্থ, দশ দিক্ আলো-করা শ্বশুর ; শারদকৌমুদীবিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর। মা গো! সকলি মিলেছে, কেবল একটি ঘটনার অমিল দেখেতেছি—আমি এখনও জীবিত আছি, রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন

উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণশ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পারণের জন্যই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন। (একদৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—ওগো, তোমরা আমার বিপিনকে একবার পাঠশালা হতে ডেকে এনে দাও, আমি একবার (সাশ্রুনয়নে) বিপিনের হাত দিয়া স্বামীর শুষ্কমুখে একটু গঙ্গাজল দি। (মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি)

সকলে। আহা! হা!

খুড়ী। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এখন এমন কথা মুখে এনো না, (ক্রন্দন) মা, যদি বড়দিদির চেতন থাক্‌তো, তবে এ কথা শুনে বুক ফেটে মর্‌তেন।

সৈরি। মা, স্বামী আমার ইহলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পরলোকে পরম সুখী হন এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাক্‌বে, প্রাণনাথ? তুমি পরম ধার্মিক, পরোপকারী, দীনপালক, তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত! দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা, আহা, মরি মরি এ কি সর্বনাশ!
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস।।
কি করিব কোথা যাব কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদ্-বান্ধব কর বিপদে বিধান।।
রক্ষ রক্ষ রমানাথ! রমণী-বিভব।
নীলানলে হয় নাশ নবীনমাধব।।
কোথা নাথ দীননাথ। প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী করিয়ে আমায়।।
(নবীনের বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস)
পরিহরি পরিজন পরমেশ-পায়।
লয় গতি দিয়ে পতি বিপদে বিদায়।।
দয়ার পয়োধি তুমি পতিতপাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ জীবন-জীবন।।

সর। দিদি, ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখ বিকৃত করিতেছেন। (রোদন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপ নয়নে কখন তা দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরি। আহা, আহা ঠাকুরুণ সরলতাকে এমনি ভাল বাসেন যে এ অজ্ঞানবশতঃ একটু রুষ্ট চক্ষে চাহিয় সরলতা-চাঁপাফুল বালির খোলায় ফেলিয়া দিয়াছেন—দিদি, কেঁদো না, ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে তোমায় আবার চুম্বন করবেন এবং আদরে পাগ্‌লীর মেয়ে বলবেন।

(গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে ২)

সাবি। প্রসববেদনার মত আর বেদনা নাই—কিন্তু যে অমূল্যরত্ন প্রসব করিয়াছি, মুখ দেখে সব দুঃখ গেল। (রোদন করিতে ২) আরে দুঃখ! বিবি যদি যমকে চিঠি লিখে কত্তারে না মার্‌তো, তবে সোনার খোকা **দেখে কত আহ্লাদ** কত্তেন। (হাত তালি)

সকলে। আহা! আহা! পাগল হয়েচেন।

সাবি। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাইবউ—ছেলে একবার আমার কোলে দাও, তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কত্তার .. করে খোকার মুখে একবার চুমো খাই। (নবীনের মুখচুম্বন)

সৈরি। মা, আমি যে তোমার বড়বউ, মা দেখতে পাচ্চ না—তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েচেন, কথা কহিতে পাচ্যেন না।

সাবি। ভাতের সময় কথা ফুট্‌বে। আহা, হা! কত্তা থাক্‌লে আজ কত আনন্দ, কত বাজ্‌না বাজ্‌তো। (ক্রন্দন)

সৈরি। সর্বনাশের উপর সর্বনাশ। ঠাকুরূণ পাগল হলেন?

সর। দিদি, জননীকে বিছানা-ছাড়া করিয়া দাও, তাঁরে আমি শুশ্রুষা দ্বারা সুস্থ করি।

সাবি। এমন চিটিও লিখেছিলেন, এমন আহ্লাদের দিন বাজ্‌না হলো না!

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া সকলে গাত্রোত্থানপূর্বক সরলতার নিকটে গিয়া)

তোমার পায়ে পড়ি বিবি ঠাক্‌রুণ, আর একজন চিটি লিখে যমের বাড়ী থেকে কত্তারে ফিরে এনে দাও, তুমি সাহেবের বিবি, তা নইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মা গো, তুমি আমাকে জননী অপেক্ষাও স্নেহ কর, মা, তোমার মুখে এমন কথা শুনে আমি যমযন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইলাম। (দুই হস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা, তোমার এ দশা দেখে আমার অন্তঃকরণে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

সাবি। খান্‌কি বিটি, পাজি বিটি, মেলেচ্ছো বিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি। (হস্ত ছাড়ায়ন)

সর। মা গো, আমি, তোমার মুখে এ কথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পারি নে। (সাবিত্রীর পদদ্বয় ধারণপূর্বক ভূমিতে শয়ন) মা, আমি তোমার পাদপদ্মে প্রাণ ত্যাগ করিব। (ক্রন্দন)

সাবি। খুব হয়েচে, গস্তানিবিটি মরে গিয়েচে, কত্তা আমার স্বর্গে গিয়েছেন, তুমি আবাগী নরকে যাবি। (হাস্য করিতে ২ করতালি)

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আহ! আহা! সরলতা আমার অতি সুশীলা, আমার শাশুড়ীর সাত আদরের বউ, জননীর মুখে কুবচন শুনে অতিশয় কাতর হয়েছে। (সাবিত্রীর প্রতি) মা, তুমি আমার কাছে এস।

সাবি। দাইবউ, ছেলে এক রেখে এলে বাছা, আমি যাই। (দৌড়ে নবীনের নিকট উপবেশন)

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাঁগা মা, তুমি যে বল্যে থাক, ছোট বউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোটবউরি না খেব্‌য়ে তুমি যে খাও না, তুমি সেই ছোটবউরি খান্‌কি বল্যে গাল দিলে। হ্যাঁগা মা, তুমি মোর কথা শোন্‌চো না—মোরা যে তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাতি দিয়েচো।

সাবি। আমার ছেলের আট্‌কৌড়ের দিন আসিস্, তোরে জলপান দেব।

খুড়ী। বড়দিদি, নবীন তোমার বেঁচে উটবে, তুমি পাগল হইও না।

সাবি। তুমি জান্‌লে কেমন করে? ও নাম তো আর কেউ জানে না, আমার শ্বশুর বল্যেছিলেন, বউমার ছেলে হোলে "নবীনমাধব" নাম রাখ্‌বো, আমি খোকা পেয়েচি, ঐ নাম রাখ্‌বো। কত্তা বলতেন, কবে খোকা হবে, "নবীনমাধব" বলে ডাক্‌বো। (ক্রন্দন) যদি বেঁচে থাক্‌তেন, আজ সে সাধ পুর্‌তো।

(নেপথ্যে শব্দ)

ঐ বাজ্‌না এয়েছে। (হাততালি)

সৈরি। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোট বউ, উঠে ওঘরে যাও।

[কবিবাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ]

[সরলতা, রেবতী এবং প্রতিবাসিনীদের প্রস্থান]

(সৈরিন্ধ্রী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

সাধু। এই যে মাঠাকুরূণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবি। (রোদন করিয়া) আমার কত্তা নেই বল্যে কি তোমরা আমার এমন দিনে ঢোল্‌-বাড়ী রেখে এলে?

আদুরী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞেন আছে, উনি অ্যাকেবারে পাগল হয়েচেন। উনি ঐ বড় হালদারের বল্‌চেন "মোর কচি ছেলে" আর ছোট হালদারনিরি বিবি বল্যে কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদার্নি খেঁদে ককাতি নেগেলো। তোমাদের বল্‌চেন বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

কবি (নবীনের নিকট উপবিষ্ট হইয়া) একে পতিশোকে উপবাসী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা—সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব এবং নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিকটা দেখা আবশ্যক, কর্ত্রী ঠাকুরূণ, হস্ত দেন। (হাত বাড়াইয়া)

সাবি। তুই আঁটকুড়ীর বেটা কুটির নোক্‌, তা নইলে ভাল মানুষের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস্‌ কেন? (গাত্রোত্থান করিয়া) দাইবউ, ছেলে দেখিস্‌ মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখান চেলির শাড়ী দেব। [প্রস্থান]

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না, আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি। (নবীনের হস্ত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যামাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না। ডাক্তার ভায়ারাও অন্য বিষয়ে গোবৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল ; ব্যয় বাহুল্য, কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্তব্য—

সাধু। ছোট বাবুকে ডাক্তারের সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।

[চারজন জ্ঞাতির প্রবেশ]

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময়, কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে, কি দুর্দৈব। অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুইশত রাইয়তে লাঠি হস্তে করিয়া মার ২ করিতেছে, এবং "হা বড়বাবু! হা বড়বাবু!" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহারদিগের স্ব ২ গৃহে যাইতে কহিলাম ; যেহেতু একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাততঃ তার্পিন তৈল লেপন কর ; পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধিক্যের মূল—কোনরূপ কথাবার্তা এখানে না হয়।

[কবিরাজ, সাধুচরণ এবং জ্ঞাতিগণের এক দিকে এবং আদুরীর অন্য দিকে প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রীর উপবেশন। যবনিকা পতন।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের ঘর

(ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি, এক দিকে সাধুচরণ, অপরদিকে রেবতী উপবিষ্ট)

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও মা, বিছেনা ঝেড়ে দে।

রেবতী। যাদু মোর, সোনার চাঁদ মোর, ওমন ধারা কেন কচ্চো মা? বিছানা ঝেড়্যে দিইচি মা, বিছানায় তো কিছু নেই রে মা, মোদের ক্যাঁতার ওপরে, তোমার কাকিমারা যে নেপ দিয়েচে, তাই তো পেড়ে দিয়েচি মা।

ক্ষেত্র। স্যাঁকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, মরি গ্যালাম, মা রে মলামরে বাবার দিগি ফির্‌য়ে দে।

সাধু। (আস্তে আস্তে ক্ষেত্রমণিকে ফিরায়ে, স্বগত) শয্যাকন্টকি মরণের পূর্বলক্ষণ। (প্রকাশ্যে) জননী আমার দরিদ্রের রতনমণি, মা, কিছু খাও না মা, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনেচি মা, তোমার যে চুনুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাও তো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমি আহ্লাদ করিলে না মা।

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলে সোমোন্‌তোনের সমে মোরে সাঁক্‌তির মালা দিতে হবে—আহা হা! মার মোর কি রূপ কি হয়েছে, কর্‌বো কি, বাপোরে বাপোঃ'। (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি) সোনার ক্ষেত্র মোর কয়লাপানা হয়ে গিয়েচে, দেখ, দেখ, মার চকির মণি কনে গ্যাল।

সাধু। ক্ষেত্রমণি, ক্ষেত্রমণি ভাল করে চেয়্যে দেখ্ না মা।

ক্ষেত্র। খোন্তা, কুড়ুল, মা! বাবা! আ! (পার্শ্বপরিবর্তন)

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাক্‌বে।

[অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত]

সাধু। কোলে তুলিস্‌নে, টাল্ যাবে।

রেবতী। এমন পোড়া কপাল করেলাম, আহা হা! হারান যে মোর মউর-চড়া কাত্তিক, মুই হারানের রূপ ভোল্‌বো ক্যামন করে, বাপো! বাপো! বাপো!

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এল না।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাগের মুখথে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁটকুড়ির বেটা এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খসে গেল, তার পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা! হা! দৌউ ত্র হয়েলো, রক্তোর দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়েলো, আঙ্গুলগুলো পর্যন্ত হয়েলো। ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড় সাহেব বড়াবাবুরি খালে। আহা হা! কাঙ্গালের কেউ রক্কে করে না।

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে, দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব।

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরা মাচ্ হু—হু—হু—

রেবতী। নমীর আৎ বুঝি পোয়ালো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি। মোরে মা বল্যে ডাক্‌বে কেডা, ই কত্তি নিয়ে এইলে? (সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন)

সাধু! চুপ্ কর্, এখন কাঁদিসনে, টাল্ যাবে।

[রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ]

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? সে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই—যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল, তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে—এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরমকালের পূর্বলক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা কত্তি নেগেচে, এত পুরু কর্য্যে বিছানা কর্য্যে দেলাম তবু মা মোর ছট্‌ফট্ কচ্চেন—আর একটু ভাল ওষুধ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও—মোর সাধের কুটুম্ব গো। (রোদন)

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ—"ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান, পিতা-মাতার শেষ পর্যন্ত আশ্বাস, দেখুন যদি কোন পন্থা থাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক, পূর্ণমাত্রা সুচিকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ, ও ঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্য বড় রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়।

[রাইচরণের প্রস্থান]

রেবতী। আহা! অন্নপুন্নো কি চেতন আছেন, তা আপ্‌নি আলোচাল হাতে কর্য্যে মোর ক্ষেত্রমণির দেক্‌তি আস্‌বেন, মোর কপাল হতিই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয়, কর্ত্রী ঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে, অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড়বাবুকে অদ্য কিরূপ দেখিলেন? আমার বোধ হয়, নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? চৈতন বিলের একশত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে, তাহাও আমি সহ্য করতে পারি ; ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদ্‌রি কাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগবগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পারি, অমাবস্যার রাত্রিতে হারে রে হৈ হৈ শব্দে নির্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল, সুবিদ্ধান্‌ একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া সম্মুখে পরমাসুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাসগর্ভবতী সহধর্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সুপ্তপুরুষার্জিত ধনসম্পত্তি অপহরণপূর্বক আমার চক্ষু তলোয়ার-ফরকায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি ; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয়, তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাংঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি, দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল। নবীনের কায়স্তিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদ্‌গতির উপায়াগুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা! মাঠাকুরূণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন, তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন। ডাক্তারবাবুও মাথার ঘা সংঘাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তারবাবুটি অতি দয়াশীল, বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন, "বিন্দুবাবু, তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ-সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি, সেই বেহরায় যাইব, তাহাদের আপনার কিছু দিতে হবে না।" দুঃশাসন ডাক্তার হল্যে কর্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত। বেটাকে আমি দুইবার দেখিছি, বেটা যেমন দুর্মুখো, তেমনি অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোটবাবু ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে কর্য়ে ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর অত্যাচারে অন্নাভাবে দেখে ক্ষেত্রমণির নাম কর্য়ে ডাক্তার বাবু আমারে দুই টাকা দিয়া গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তার হল্যে হাত না ধর্য়ে বল্‌তো বাঁচবে না, আর তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সর্বস্ব বেচে টাকা দিতি পারি; মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচ্‌য়ে দেয়।

[চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ]

কবি। চালগুলিন প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

(রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ)

জল অধিক দিও না—এ বাটিটি তো অতি পরিপাটি দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উটেচেন, গাল চেপড়ে মরেন বল্যে হাত দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে এখেচে।

কবি। সাধু, খল আনয়ন কর, আমি ঔষধ বাহির করি।

(ঔষধের ডিপা খুলন)

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি ; রাইচরণ, এদিকে আয়।

রেবতী। ও মা, মোর কপালে কী হলো। ও মা, মুই হারানের রূপ ভোল্‌বো কেমন কর্যে, বাপো, বাপো, ও ক্ষেত্র, ও ক্ষেত্র , ক্ষেত্রমণি, মা—আর কি কথা কবা না, মা মোর, বাপো, বাপো, বাপো! [ক্রন্দন]

কবি। চরমকাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ, ধর্ ধর্।

[সাধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শয্যাসহিত ক্ষেত্রকে বহিরে লইয়া যাওন]

রেবতী। মুই সোনার নক্কি ভেস্‌য়ে দিতি পার্‌বো না মা রে, মুই কনে যাব রে—সাহেবের সঙ্গি থাকা সে মোর ছিল ভাল মা রে, মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মা রে, হো, হো, হো।

[পাছা চাপড়াইতে ২ ক্ষেত্রমণির পশ্চাৎ ধাবন]

কবি। মরি, মরি, মরি, জননীর কি পরিতাপ—সন্তান না হওয়াই ভাল। [প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর বাটীর দরদালান

(নবীনমাধবের মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা)

সাবি। আয় রে আমার জাদুমণির ঘুম আয়—গোপাল আমার বুক জুড়ানে ধন, সোনার চাঁদের মুখ দেখ্‌লে আমার সেই মুখ মনে পড়ে। (মুখচুম্বন) বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে। (মস্তকে হস্তামর্ষণ) আহা মরি, মরি, মশায় কাম্‌ড়ে করেচে কি?—গর্‌মি হয় বল্যে কি কর্‌বো, আর মশারি না খাট্‌য়ে শোব না। (বক্ষঃস্থলে হস্তামর্ষণ) মরে যাই, মার প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এমনি কামড়েচে, বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বাছার বিছানাটা কেউ করে দেয় না ; গোপালেরে শোয়াই কেমন কর্যে? আমার কি আর কেউ আছে, কর্তার সঙ্গে সব গিয়েছে। (রোদন) ছেলে কোলে কর্যে কাঁদিতেছি, হা পোড়াকপালি। (নবীনের মুখাবলোকন কর্যে) দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখ-চুম্বন করিয়া) না বাবা, তোমারে দেখ্যে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েচি, আমি কাঁদিতেছি না, (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও, গোপাল আমার, মাই খাও—গস্তানি বিটির পায় ধর্‌লাম, তবু কত্তারে একবার এনে দিলে

না। গোপালের দুদ যোগান কর্য়ে দিয়ে আবার যেতেন ; বিটির সঙ্গে যে ভাব, চিটি লিখ্‌লিই যমরাজা ছেড়ে দিত। (আপনার হস্তের রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়্যে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না—চীৎকার কর্য়ে কাঁদিতে লাগ্‌লাম, তবু আমারে শাকা পব্‌য়ে দিলে—প্রদীপে পড়ুয়্যে ফেলিচি, তবু আছে। (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জু ছেদন) বিধবা হয়্যে গহনা পরা সাজেও না, সয়ও না, হাতে ফেস্কা হয়েচে। (রোদন) আমার শাকা পরা যে ঘুচ্‌য়েচে, তার হাতের শাকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে ; (মাটিতে অঙ্গুলি মট্‌কায়ন) আপনিই বিছানা করি। (মনে ২ শয্যাপাতন) মাজুরটো কাচা হয় নাই। (হস্ত বাড়াইয়া) বালিশ্‌টে নাগাল পাইনে—কাঁতাখানা ময়লা হয়েচে, (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই। (আস্তে আস্তে নবীনের মৃত শরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা, সচ্চন্দে শুয়ে থাক, থুথকুড়ি দিয়ে যাই। (বুকে থুথু দেওন) বিবি বিটি আজ যদি আসে, আমি তার গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো—বাছারে চোকছাড়া কর্‌বো না, আমি গণ্ডি দিয়ে যাই। (অঙ্গুলি দ্বারা নবীনের মৃত শরীর বেড়ে ঘরের মেঝের দাগ দিতে ২ মন্ত্রপঠন) ঃ

সাপের ফেণা বাঘের নাক।
ধুনোর আগুন চরোক্ পাক।।
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধুত্‌রো ফুল।।
নীলের বিচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া।।
হন্নে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডি।।

[সরলতার প্রবেশ]

সর। এঁরা সব কোথায় গেলেন—আহা! মৃত শরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন—বোধ করি, প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তিবশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রা-দেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিদ্রে। তোমার কি লোকাতীত মহিমা! তুমি বিধবা সধবা কর, বিদেশীকে দেশে আন, তোমার স্পর্শে কারাবাসীদের শৃঙ্খল ছেদ হয়, তুমি রোগীর ধন্বন্তরি, তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই, তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয় না ; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ, নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃতপুত্রকে কিরূপে আনিলেন? জীবিতনাথ পিতা-ভ্রাতা-বিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে ২ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে। মা গো, তুমি কখন্ উঠিয়া আসিয়াছ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি, আমি কি এত অচৈতন্য হয়্যে পড়েছিলাম? তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের

ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত ; আকাশমণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত ; প্রাণিমাত্রেই কালনিদ্রানুরূপ নিদ্রায় অতিভূত ; সকলি নীরব ; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্করনিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ ; এমত ভয়াবহ নিশীথ-সময়ে জননি, তুমি কীরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া মৃত পুত্রকে আনয়ন করিলে?

[মৃত শরীরের নিকট গমন]

সাবি। আমি গণ্ডি দিইচি, গণ্ডির ভেতর এলি।

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদর-বিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকবে না। (ক্রন্দন)

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস্, ও সর্বনাশি, রাঁড়ি আঁটকুড়ীর মেয়ে, তোর ভাতার মরে—বার্ হ, এখান থেকে বার্ হ, নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার্ কর্‌বো।

সর আহা। আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর এমন সুবর্ণষড়ানন জলের মধ্যে গেল!

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্ নে, তোরে বারণ কচ্চি—ভাতারখাগি। তোর মরণ ঘুন্‌য়ে এয়েচে দেখচি।

[কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন]

সর। আহা! কৃতান্তের করাল কর কি নিষ্ঠুর। আমার সরল শাশুড়ীর মনে তুমি এমন দুঃখ দিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাক্‌চিস্, আবার ডাক্‌চিস (দুই হস্তে সরলতার গলা টিপে ধরিয়া ভুমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, যমসোহাগি, এই তোরে মেলে ফেলি। (গলায় পা দিয়ে দণ্ডায়মান) আমার কত্তারে খেয়েচ, আবার দুদের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাক্‌চো—মর্ মর্ মর্ মর্। (গলার উপর নৃত্য।)

সর। গ্যা—অ্যা, অ্যা, অ্যা। (সরলতার মৃত্যু)

[বিন্দুমাধবের প্রবেশ]

বিন্দু। এই যে এখানে পরিয়া রহিয়াছেন—ও মা, ও কি! আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে জননি! (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ-পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

[রোদনানন্তর মুখচুম্বন]

সাবি। কাম্‌ড়ে মেরে ফেল্ নচ্ছার বিটিকে—আমার কচি ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাক্‌ছেল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলিচি।

বিন্দু। হে মাতঃ, জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখবিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয়, তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতা বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা, তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না? আপনার জ্ঞানসঞ্চার

আর না হওয়াই ভাল। আহা মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্রতা কি সুখপ্রদ। মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তর-প্রাচীরে বেষ্টিত, শোক-শার্দুল আক্রমণ করিতে অক্ষম। মা, আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলো?

বিন্দু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারিনে—জননি, পিতার উদ্ধন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলতাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবি। কি? নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই?—মরি মরি বাবা আমার! সোনার বিন্দুমাধব আমার, আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি—ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়্যে মেরে ফেলিচি। (সরলতার মৃত শরীর সঙ্গো ধারণ করিয়া আলিঙ্গান) আহা! হা! আমি পতিপুত্রবিহীন হয়্যেও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ কর্য্যে আমার বুক ফেটে গেল—হো, ও, মা। (সরলতাকে আলিঙ্গানপূর্বক ভুতলে পতনানন্তর মৃত্যু)।

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম, তাহাই ঘটিল। মাতার প্রাণসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল। কি বিড়ম্বনা! জননী আর ক্রোড়ে লয়্যে মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার মা বলা কি শেষ হইল! (রোদন) জন্মের মত জননীর চরণধুলি মস্তকে দি! (চরণের ধুলি মস্তকে দেওন) জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি। (চরণের ধুলি-ভক্ষণ)

[সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ]

সৈরি। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিও না। সরলতার কাছে বিপিন আমার পরমসুখে থাকবে—এ কি! এ কি' শাশুড়ীবয়ে এরূপ পড়ে কেন!

বিন্দু। বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করিয়াছেন, তৎপরে সহসা প্রাণঙ্গার হওয়াতে, আপনিও সাতিশয় শোকসন্তপ্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সৈরি। এখন? কেমন কর্য্যে? কি সর্বনাশ! কি হলো! কি হলো! আহা! আহা! ও দিদি, আমার যে বড় সাধের চুলের দড়ি, তুমি যে যে আজো খোঁপায় দেউ নি। আহা! আহা! আর তুমি দিদি বলে ডাকবে না! (রোদন) ঠাকুরূণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে, আমার যেতে দিলে না। ও মা, তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে একদিনও মনে করিনি।

[আদুরীর প্রবেশ]

আদু। বিপিন ডর্য়্যো উটেছে, বড়হালদার্নি, তুমি শীগ্‌গির এস।

সৈরি। তুই সেইখান হতে ডাক্‌তে পারস্‌নি, একা রেখে এয়েচিস।

[আদুরী সহিত বেগে প্রস্থান]

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদসাগরে ধ্রবনক্ষত্র! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুল্য গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চ কুলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব শোভা। লোচনানন্দপ্রদ নবীন দুর্বাদলাবৃত ক্ষেত্র, অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুপু, কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান, কোথাও নবদুর্বাদল-লোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা ; আহা! তথায়

ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের-সুললিত ললিত তানে এবং প্রস্ফুটিতবনপ্রসূনসৌরভামোদিত মন্দ ২ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চিড়দর্শন, অচিরাৎ শোভাসহ কুল ভগ্ন হইয়া গভীর নীরে নিমগ্ন। কি পরিতাপ। স্বরপুরনিবাসী বসুকূল-নীল-কীর্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল—আহা! নীলের কি করাল কর।

নীলকর বিষধর বিষপোড়া মুখ।
অনলশিখায় ফেলে দিল যত সুখ।।
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন।।
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী।।
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ-পারাবার।।
শোকশূলে মাখা হলো বিষ-বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা।।
কোথা পিতা কোথা পিতা ডাকি আনিবার।
হাস্যমুখে আলিঙ্গান কর একবার।।
জননী জননী বলে চারিদিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্তি দেখতে না পাই।।
মা বলে ডাকিলে মাথা অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে।।
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা।।
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা।।
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটি নাই।।।
নয়ন মেলিয়া দাদা দেখ একবার।
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার।।
আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায়।।
রূপবতী গুণবতী পতিপরায়ণা।
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না।।
সহাস বদনে সতী সুমধুর স্বরে।

বেতাল করিতে পাঠ মম করে ধরে।।
অমৃত পঠনে মন হতো-বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বনবিহঙ্গ-সঙ্গীত।।
সরলা সরোজকান্তি কিবা মনোহর।
আলো কর্য়ে ছিল মম দেহসরোবর।।
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়।।
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার।।

আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল—তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়—যায় —আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!

(সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন)

যবনিকা পতন

সমাপ্তমিদং নীলদর্পণং নাম নাটকম্।

৮২.১৯ সারাংশ

বেগুনবেড়ের কুঠিতে গোপীনাথ ও একজন উমেদারের কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, বসু পরিবার যথার্থই সম্ভ্রান্ত, উদার ও পরোপকারী। সাবিত্রী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। দেওয়ান গোপীনাথ নীলকরদের সীমাহীন শোষণ নির্যাতনের অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। গোলোক বসুর উদ্বন্ধনে মৃত্যুর পর গোপীনাথের কিঞ্চিৎ অনুশোচনা হয়েছে। গোপীনাথ দুঃখ করে বলেছে যে, তার জন্য মিথ্যা মামলায় মানী মানুষটির মর্যাদা নষ্ট হয়েছে। সে তাই উডকে সরকিওয়ালা নিয়ে নবীনমাধবদের পুকুর পাড়ের জমিতে নীল বোনা থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছে। উড নবীনমাধবের অশৌচের সুযোগ নিতে আগ্রহী। সে বাধা দিতে এলে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরতে চান। প্রথম গর্ভাঙ্কে নীলকরদের অর্থ লালসা ও নবীনমাধবের ওপর ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে উড-রোগ লেঠেল সরকিওয়ালাদের সঙ্গে নিয়ে বসু বাড়ীর পুকুর পাড়ে নীল বুনতে এলে নবীন ৫০ টাকা নজরানা দিয়ে তাদের অনুরোধ করে এ বছর এ জমিতে নীল বোনা স্থগিত রাখতে, অন্যথায়, অন্ততঃ শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্যন্ত 'বুনন' রহিত রাখতে। উত্তরে উড অসঙ্গত মন্তব্য করলে, নবীন ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যান। পরে তার বুকে পদাঘাত করেন। উড সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নবীনের মাথায় লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করে ফাটিয়ে দেয়। সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। অদূরে প্রতীক্ষমান তোরাপ বড় সাহেব উডের নাক কামড়ে নেয়। ওদিকে দু'শত রায়ত লাঠি হাতে বড়বাবুর প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য প্রতিহিংসার প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী

ও সরলতা নবীনমাধবের অবস্থা দেখে হাহাকার করে ওঠে। আদুরী শোকে অভিভূত হয়ে কেঁদে ওঠে। স্বামীর অপমৃত্যু এবং অচিরেই পুত্রের এই রক্তাক্ত অচৈতন্য অবস্থা দেখে সাবিত্রী অকস্মাৎ উন্মাদিনী হয়ে গেলেন।

সাধুচরণের বাড়ীতে রোগের অত্যচারে ক্ষেত্রমণির গর্ভপাত হয়। দীর্ঘ অসুস্থতার জন্য শয্যাশ্রয়ী ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি দেখা দেয়। রেবতী কন্যার কষ্ট সহ্য করতে পারে না—দিনরাত কাঁদে। কন্যা আর জামাতাকে হারাবার আশঙ্কায় বিচলিত হয়। ওদিকে কবিরাজ জানান কর্তৃঠাকুরূণ সম্ভবতঃ নবীনমাধবের আগেই পরলোক গমন করবেন। সাধুচরণের ধারণা নবীনমাধবের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নীলকরদের অত্যাচারের অবসান ঘটবে। ক্ষেত্রমণিরও চরমকাল দেখা দিল। সাধু ও রাইচরণ তাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যায়।

নবীনমাধবের মৃতদেহ উন্মাদিনী সাবিত্রী আগলে রাখেন। তিনি মন্ত্র পাঠ করে দেহের চতুর্দিকে গণ্ডী তৈরী করেন। ছোট বৌ সরলতা ভাসুরের মৃতদেহ ও শাশুড়ীর উন্মত্ততা দেখে কাঁদতে লাগলেন। সাবিত্রী সরলতাকে সর্বনাশিনী মনে করে তার গলায় পা দিয়ে হত্যা করেন। বিন্দুমাধবের উপস্থিতি ও ডাকে সাবিত্রীর চেতনা ফিরল। তিনি নবীনের মৃত্যু ও তাঁর কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনায় প্রাণ ত্যাগ করেন। সৈরিন্ধ্রী এসব দৃশ্য দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তথাপি পুত্র বিপিনের কথা স্মরণ করে তাকে বাঁচতেই হয়। বিন্দুমাধব ও সৈরিন্ধ্রী বিপিনের জীবনের আশার প্রদীপটি ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল করে রাখে।

(পঞ্চমাঙ্কে তিনটি মৃত্যুর বর্ণনা আছে। একমাত্র নবীন মাধবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকটি শেষ হলে শিল্পসম্মত হত। নাটকীয় বিষয়বস্তু ও তার গতিপ্রবাহ নবীনমাধবকে কেন্দ্র করে চতুর্থ অঙ্কে চরমোৎকর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই পঞ্চমাঙ্কের সূচনাতেই নাটকীয় গতিবেগের অবরোহ প্রত্যাশিত ছিল। পাশ্চাত্য আলংকারিকদের ভাষায় এখানেই ঘটেছে Denovement, সাহিত্য দর্পনের মতে উপসংহৃতি বা নির্বহন।)

৮২.২০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঠকমারা—ছলাকলায় পারদর্শী ; ভেমো—নির্বোধ ; মদৎ আন্তে পারবে—সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারবে। ডেক-রিয়া—জ্বালাতন করা, মোনাসেফ—মনঃপূত। ডেডলি কমিশন—নীলকরদের অত্যাচারের স্বরূপ পর্যালোচনার জন্য স্যার জন গ্রান্ট কমিশন নিযুক্ত করেন। নীলকরেরা একেই 'ডেডলি' (Deadly) বা ভয়ঙ্কর কমিশন বলেছে।

বেনার বোঝার ন্যায়—উলুখড় বা বিন্না ঘাসের বোঝার মত।

ডাকাতি মাদ্দা—ডাকাতির মোকর্দমা

সেঁজোতির ব্রত—কুমারীগণ মনোমত স্বামীলাভের জন্য সন্ধ্যায় দ্বীপ জ্বালিয়ে এই ব্রত পালন করে।

সেঁজোতি < সন্ধ্যাবর্তিকা। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত পালন করা হয়। চার বছর পর এই ব্রত উদযাপন করা হয়।

গস্তানি বিটি—ভ্রষ্টা। সাবিত্রী উন্মাদগ্রস্ত হয়ে সরলতা সম্পর্কে; এই মন্তব্য করেছেন।

৮২.২১ অনুশীলনী - ২

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন। পরে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

(ক) "টাকা ঘোড়া, লাঠিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে।"—বক্তা ঃ (উড সাহেব/ রোগ সাহেব / নবীনমাধব)।

(খ) "গোড়ার পা য্যান বলদে গোরুর খুর।"—বক্তা ঃ তোরাপ / প্রথম রায়ত / গোপীনাথ)।

(গ) 'ঝরকা' অর্থ ঃ (ঝরণা / জানালা / ঝড়)।

(ঘ) গারনীল অর্থ ঃ (জনৈক নীলকর / গভর্ণর / মালী)।

২। "বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে।" কে কার সম্বন্ধে এ কথা বলেছেন? মূল প্রসঙ্গটি কী?

৩। "মোরে বড়্ডি ভাল বাস্‌তো।"—বক্তা কে? কাকে বলেছে? কার সম্পর্কে বলেছে?

৪। "দাদন গাদনিই তো হয় না, চসা চাই।"—বক্তা কে? কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? বক্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৫। দীনবন্ধু মিত্রের 'সর্বব্যাপিনী সহানুভূতির' দুটি উদাহরণ দিন।

৬। দীনবন্ধু মিত্র দু'ধরনের নাট্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন। নবীনমাধব ও তোরাপের দুটি করে সংলাপের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দিন।

৮২.২২ উত্তর সংকেত (অনুশীলনী—১, ২)

অনুশীলনী — ১

১। (ক) আন্দোলনের, বিপ্লবাত্মক।

(খ) কালাচাঁদ মিত্র, গন্ধর্ব নারায়ণ।

(গ) সংবাদ প্রভাকরে।

(ঘ) লুসাই যুদ্ধের, ডাক ব্যবস্থা, কাছার।

২। (ক) সংকেত নিষ্প্রয়োজন। ২.৪ অংশটি ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

অনুশীলনী—২

১। (ক) উড, (খ) প্রথমরায়ত, (গ) জানালা (ঘুলঘুলি), (ঘ) গভর্ণর.

২। গোপী, নবীনমাধব সম্পর্কে বলেছে। কথাটি হোল, 'গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি,

নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। (১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)।

৩। বক্তা আদুরী, সরলতাকে বলেছে। বলেছে তার স্বামী সম্পর্কে। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

৪। বক্তা তোরাপ। তৃতীয় অঙ্কের, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রোগ সাহেবের কামরায় পদী ময়রাণী ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে গেলে সে তার শ্লীলতাহানি করতে উদ্যত হয়। ক্ষেত্র নানাভাবে তার প্রতিরোধ করে। এমনি সময় নবীনমাধব ও তোরাপ জানলার খড়খড়ি ভেঙ্গে রোগের কামরায় প্রবেশ করে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তোরাপ মারমুখী হয়ে উঠলে—নবীন রোগ সাহেবের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। ফলে তোরাপ আলোচ্য মন্তব্য করে ছোট সাহেবকে চিৎ করে ফেলে চলে যায়।

৫/৬ নির্দেশ নিষ্প্রয়োজন। মূল নাটক থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত আহরণ করুন।

৮২.২৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। নীলদর্পণ ঃ দীনবন্ধু মিত্র রচনাবলী। সংসদ সংস্করণ।

২। নীলদর্পণ ঃ দীনবন্ধু মিত্রের রচনাবলী। বসুমতী সংস্করণ।

৩। নীলদর্পণ ঃ দীনবন্ধু মিত্র রচনাবলী। সাক্ষরতা প্রকাশন।

এছাড়াও 'নীলদর্পণ' নাটকের যে কোন সম্পাদিত গ্রন্থ।

একক ৮৩ ❑ নীল-দর্পণ ঃ আলোচনা ও বিশ্লেষণ

গঠন

৮৩.১ উদ্দেশ্য

৮৩.২ প্রস্তাবনা

৮৩.৩ নীল-দর্পণ ঃ দেশ, কাল ও নাটক রচনা

৮৩.৪ সারাংশ

৮৩.৫ নীল-দর্পণ নাটকের কাহিনী বিশ্লেষণ ও আলোচনা

৮৩.৬ নীল-দর্পণ নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ ও আলোচনা

৮৩.৭ সারাংশ

৮৩.৮ নাটকের রস বিচার ঃ রস পরিণতি-ট্র্যাজেডি-মেলোড্রামা

৮৩.৯ নীল-দর্পণ নাটকের সংলাপ ঃ আলোচনা ও বিশ্লেষণ

৮৩.১০ সারাংশ

৮৩.১১ নীল-দর্পণের নাটকের দোষগুণ বিচার

৮৩.১২ নীল-দর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পর্যালোচনা

৮৩.১৩ সারাংশ

৮৩.১৪ অনুশীলনী

৮৩.১৫ উত্তর সংকেত

৮৩.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৮৩.১ উদ্দেশ্য

দীনবন্ধু মিত্র নীল-দর্পণ রচনা করেন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। এটি তাঁর প্রথম নাটক। প্রথম রচিত নাটকে দীনবন্ধু মিত্র অনেকগুলি ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আপনি বর্তমান এককটি পাঠ করে নীল-দর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

- নাটক পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি বাংলাদেশে নীলচাষ ; ইংরেজ কুঠিয়ালদের শোষণ ও নির্যাতনের

পরিচয় পেয়েছেন। সেইসঙ্গে নীলচাষী বা রায়তদের কুঠিয়ালদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ রচনার চেষ্টাও যে পাশাপাশি চলছিল সে পরিচয়ও পেয়েছেন।

- এই এককটি পড়ে আপনি নাটক রচনার সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।
- এককের পর্যায়ক্রমিক আলোচনা থেকে আপনি নীল-দর্পণ নাটক হিসাবে কতটা সার্থক এবং রচনাটির নাটকীয় রসপরিণতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন।
- নাটকের কুশীলবদের শ্রেণী ভিত্তিক পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংলাপের বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করতে পারবেন।
- নাট্যকার নীল-দর্পণে যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন, তার পরিচয় পাবেন।
- বাংলা ট্র্যাজেডি নাটক সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

৮৩.২ প্রস্তাবনা

নীল-দর্পণ নাটকের পাঁচটি অঙ্ক স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করে আপনি নাটকটি যে বিশেষ দেশকালের প্রেক্ষাপটে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল সেটি উপলব্ধি করতে পারবেন। দীনবন্ধু মিত্র ডাকবিভাগে চাকরী করতেন। তাই নাটকটির তিনি রচয়িতা হলেও স্বনামে প্রকাশ করতে পারেন নি। কারণ নাট্যকার দরিদ্র নীল চাষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি নাটকে ইংরেজ কুঠিয়ালদের শোষণ ও নির্মম আচরণের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। সে সময় ইংরেজ শাসক ও ইংরেজ কুঠিয়ালরা পারস্পরিক যোগাযোগ রেখে কাজ করতেন। সাধারণ প্রজা ইংরেজ কোন কুঠিয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সুবিচার পেত না। বিচারের নামে প্রহসন হোত। বর্তমান এককে এই নাটকটির সাহিত্যিক অবদান ও বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে নীল-দর্পণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতটা তা প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে উপলব্ধি করতে পারবেন। সুতরাং নীল-দর্পণ নাটক পড়বার সময় তার সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণটি জানা প্রয়োজন। পরবর্তী বিভাগে তার সূচনা করা হোক।

৮৩.৩ নীল-দর্পণ ঃ দেশ, কাল ও নাটক রচনা

দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগের পরিদর্শক পোস্টমাস্টার হিসেবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। বাংলাদেশের নদীয়া, ফরিদপুর, পাবনা, যশোহর, খুলনার গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক এলাকা পরিক্রমার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে নীলদর্পণ রচনা করন। এ সময় নীলচাষ ও রঞ্জকদ্রব্য হিসেবে নীল প্রস্তুত লাভজনক ছিল। ইংরেজ নীলকরেরা গ্রামাঞ্চলে কুঠি স্থাপন করে রায়তদের বলপূর্বক দাদন দিয়ে নীলচাষে বাধ্য করত। দীনবন্ধু নীলচাষীদের দুরবস্থা নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই নীলকরদের পীড়ন সম্পর্ক সবিস্তারে অবগত ছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক সহানুভূতি সূত্রে পীড়িত প্রজাদের দুঃখ তাঁর হৃদয়কে বিচলিত করত। তিনি তাঁর একান্ত অভিজ্ঞাতালব্ধ কাহিনীসমূহ অবলম্বনে 'নীল-দর্পণ' লেখেন।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা তাঁর বর্তমান নাট্যকাহিনীর প্রেক্ষাপট। নাটকে বর্ণিত ক্ষেত্রমণির কাহিনীও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত। নদীয়ার গ্রামাঞ্চলের সুন্দরী চাষী-কন্যা হরমণি ক্ষেত্রমণি চরিত্রের উৎস। নীলকর আর্চিবল্ড হিলস্ তাকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আটকে রাখে। পরিকল্পনার প্রধান অমর নগরের ম্যাজিস্ট্রেট (১ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক) বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হারসেলের পুত্র ডাবলু জে. হারসেল।

জনৈক ফরাসী লুই বোনার ভারতবর্ষে প্রথম নীল চাষ করেন বলে জানা যায়। তিনি হুগলী জেলার তালডাঙ্গায় প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন। সেটি পরে চন্দননগরের গোদলাপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের মিনিটস্ থেকে জানা যায়, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশে নীলচাষের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমপাদেও নীলচাষ হোত। এসময়ে বাংলার নীল চাষীরাই তাদের জমিতে নীলচাষ করে দেশে বিদেশে নীলের চাহিদা মেটাত। ধূর্ত ইংরেজ ও দেশীয় কতিপয় নীলকর এটা বোঝামাত্র অতি মুনাফার লোভে নীল চাষীদের ওপর শোষণ ও সীমাহীন পীড়ন করতে শুরু করে। প্রজাদের বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করা, বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খাটান, কুঠিতে কয়েদ রাখা—এই জাতীয় মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার দেশের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ভাব পুঞ্জীভূত হয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে দৈহিক উৎপীড়ন অর্থদণ্ড, পারিবারিক সম্ভ্রম হানি করা হোত। বাংলাদেশের বেশ কিছু সংবাদ সাময়িকপত্রে এর বিরুদ্ধে এ সময় মন্তব্য লেখা হতে থাকে। অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী'তে মন্তব্য করেন (১৮৫৮), জমিদারদের থেকে নীলকরদের অত্যাচার অনেক বেশী, ফলে প্রজারা নির্মূল হবার উপক্রম হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে লেখেন (১৮৫৪), নীলকররা দরিদ্র প্রজাদের বলপূর্বক বেগার ধরে নীলবীজ বোনান ও জলসেচ করান আর লাঠির বলে ফসল কেটে নেন। ইংরেজ বিচারকরা কুঠিয়ালদের অতিথি হয়ে কুঠীতে পান-ভোজন ও তাদের পরিবারের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হন। ফলে, নীলকরদের বিরুদ্ধে কোন মামলায় বিচার পাওয়া যায় না।—"নীলকুঠী সংক্রান্ত নিষ্ঠুরতা ও হত্যাঘটিত মোকদ্দমা কতবার সুপ্রীম কোর্টে উপস্থিত হইল ..... তাহাতেও এ পর্যন্ত কোন উপকার হইল না।" অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ এবং 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রায়তদের পক্ষে তথ্য সমৃদ্ধ নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় রচনার মধ্য দিয়ে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

কোম্পানীর শাসনে জমিদার-মহাজনদের নিপীড়নে দেশের সাধারণ কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বারবার প্রতিবাদ প্রতিরোধ রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছে। সে প্রকাশ অনেক সময় শক্তিশালী শাসকদের অত্যাচারে সফল না হলেও, এটা বুঝিয়ে দিয়েছে বঙ্গপ্রদেশের মানুষ, মাথা নত করে সব মেনে নেয় না—প্রতিবাদ করতে পারে ও প্রতিবাদ করে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৮৩-১৮০০), ওয়াহবী বিদ্রোহ (১৮২৪-৭০) সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) এবং পরিশেষে ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতজোড়া সিপাহী বিদ্রোহের আগুন ১৮৫৯-৬০ সালে নিভে এলেও নিম্নমধ্যবিত্ত কিছু মানুষের সহায়তায় নীলচাষীরাও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। শেষে বাধ্য হয়েই

প্রতিবাদ প্রতিরোধের জন্য লাঠি ও বল্লম নিয়ে নীলকুঠির মালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন (১৮৫৯-৬০)।

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক এই পটভূমিকায় রচিত (১৮৬০)। নীলকররাও অবশেষে বুঝেছিলেন, চাষীদের এই সংঘবদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে নীলচাষ আর সম্ভব হবে না। নীলচাষ প্রথমে স্তিমিত হয়ে একদিন বন্ধ হয়ে গেল। জার্মানীর রাসায়নিক নীল উদ্ভাবনের পর নীলচাষও আর লাভজনক হোল না, তাই বাংলাদেশ থেকে ক্রমান্বয়ে নীলচাষ উঠে গেল। আজ পড়ে আছেন জীর্ণ নীলকুঠির পরিত্যক্ত প্রাঙ্গন।

৮৩.৪ সারাংশ

বাংলাদেশে নীল আবাদ ও নীল রং প্রস্তুত করা, রঞ্জক হিসেবে তার ব্যবহার অত্যন্ত লাভজনক ছিল। নীলকররা রায়ত ও চাষীদের তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে প্রচুর উপার্জন করতো। দীনবন্ধু মিত্র নাটকের ভূমিকায় এ সম্পর্কে আভাস দিয়েছেন। লিখেছেন, "তোমরা দশমুদ্রা ব্যয় করে প্রজাদের ক্লেশ দিয়ে শতমুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করো।" নীলকরদের ধনস্পৃহা ও ক্ষমতার গর্ব ক্রমশ বেড়ে ওঠায় তারা ইজারা বহির্ভুত ব্যাপক এলাকায় প্রজাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে দাদন দিয়ে চুক্তিপত্র লিখিয়ে নিত। পরে দেওয়ান, আমিন, পাইক লেঠেলদের দ্বারা বলপ্রয়োগ করে জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করতে লাগল। এর অন্যথা ঘটলে অবাধ্য রায়তদের যে কোন ধরনের পীড়ন করতে দ্বিধা করত ন। পাইক লাঠিয়ালদের সাহায্যে ধরে এনে মারধর, গুদামঘরে বন্দী করে রাখা, চামড়ার তৈরী চাবুক (শ্যাঁমচাঁদ) দিয়ে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা, লুঠতরাজ এমন কি গ্রামের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে ইংরেজ শাসককুলের কাছ থেকে কোন সুবিচার পাওয়া যেত না। পরিণামে কুঠিয়ালদের আক্রোশ শতগুণ বৃদ্ধি পেত—রায়তদের ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করা হোত।

এইসব অবিচারের জন্য সাধারণ প্রজা দাদন নিতে অনিচ্ছুক ছিল। একবার দাদন নিলে, তা হিসাবের কারচুপিতে কখনো পরিশোধ হোত না। প্রজারাও তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পেত না। তথাপি নানা অছিলায় বলপূর্বক উর্বর ধানী জমিতে নীলচাষে বাধ্য করা হোত। একে কুঠিয়ালদের অত্যাচারে প্রজারা জর্জরিত, তদুপরি কুঠির কর্মচারীদের অত্যাচার এ পীড়নকে শতগুণে বাড়িতে দিত। কর্মচারীরা একদিকে প্রজাদের অর্থ আত্মসাৎ করত, উৎকোচ না দিলে নানা ধরনের বিপদে ফেলত বা ফেলবার ভয় দেখাত। ফলে নীলচাষীরা সর্বস্বান্ত হতে লাগল।

দীনবন্ধু ডাকবিভাগের কর্মসূত্রে বহু জায়গায় পরিভ্রমণ করেছেন। বাংলার নদীয়া, যশোর, খুলনা ২৪ পরগণায় নানা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়েছেন। সেখানকার মানুষের বিশেষতঃ নীলচাষীদের দুঃখ-দুর্দশা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অসহায় দরিদ্র চাষীদের জন্য তার হৃদয় ব্যথিত হওয়ায় 'নীল-দর্পণ নাটক' রচনার সুত্রপাত। নদীয়ার গুয়াতোলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নীল-দর্পণ নাট্যকাহিনীর প্রাথমিক ভিত্তি। নীলদর্পণে

নীলকরদের স্বৈরাচারী ভূমিকা সম্পর্কে শাসককুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য মধুসূদন সেটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। পাদ্রী লঙ্ সেটির প্রকাশত হতে স্বীকৃত হেন। ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশের পর মানহানির দায়ে লঙ্-এর এক হাজার টাকা জরিমানা ও কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ সেটাকা আদালতে জমা দেন।

এইসব ঘটনা পরম্পরা দীনবন্ধু ও তাঁর নীল-দর্পণ, মধুসূদন ও পাদ্রী লঙ্-কে বাঙালী জনগণের কাছে স্মরণীয় করেছে।

৮৩.৫ নীল-দর্পণ নাটকের কাহিনী বিশ্লেষণ ও আলোচনা

জীবন-নাটকের কাহিনী কালানুক্রম অনুসরণ করলেও, নাট্যরস সৃষ্টির জন্য নাট্যকার কাহিনীটিকে কতকগুলি কার্যকারণ সুত্রে বিধৃত করেন। ফলে সরলরৈখিক কাহিনী সূত্রকে নাটকীয়তার জন্য অগ্রপশ্চাৎ ক্রমে সজ্জিত করা হয়। এই বিন্যাসযুক্ত কাহিনী প্লট বা নাট্যবৃত্ত নামে পরিচিত। বস্তুত নাট্যবৃত্ত ঘটনার সৃষ্টি—এরা যুক্তি সংগত কার্য-কারণ সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ। দৃঢ়পিনদ্ধ ঘটনাপঞ্জী ফুটিয়ে তোলে এক একটি নাট্যবৃত্তকে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে নাটকের গঠন বিন্যাস বিপর্যস্ত হয়।

সুগঠিত নাট্যবৃত্তে আরম্ভ, মধ্যস্তর ও পরিণতি দেখা যায়। নাট্যবৃত্ত তাই ইচ্ছামত শেষ করা যায় না। নাট্যবৃত্তটি সুষম ও সুগঠিত না হলে ঘটনার আবর্ত নাটকীয় বিভিন্ন চরিত্রে ঘাত-প্রতিঘাত স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতে পারে না। তাই সার্থক নাটকের জন্য প্রয়োজন সুসম্বদ্ধ নাট্যবৃত্ত যা যথার্থ ভাবগত সংহতির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত নাট্যরস সৃষ্টি করতে সক্ষম।

গ্রীক নাটকে নাট্য কাহিনীর একমুখীনতা সূচনা, মধ্যস্তর, পরিণতি ক্রমে বিন্যস্ত। এগুলি যথাক্রমে পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করে উপস্থাপিত হয়। ভারতীয় নাট্য চিন্তাতেও পঞ্চসন্ধির কথা বলা হয়। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে দীনবন্ধু তাঁর নাটকটি ইংরেজি নাট্যাদর্শ অনুসরণে রচনা করেছেন। নীল-দর্পণ পঞ্চাঙ্ক নাটক। প্রত্যেকটি অঙ্ক নাট্যবৃত্তকে কয়েকটি গর্ভাঙ্ক পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছে।

প্রথম অঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক আছে। অঙ্ক-গর্ভাঙ্ক পরম্পরায় নাটকীয় ঘটনা, নাট্যদ্বন্দ্বের আভাস, নাটকীয় চরিত্রগুলির সঙ্গে শুধু পরিচয় ঘটেছে তাই নয়, নাটকীয় দ্বন্দ্বের সূত্রটিও পাওয়া গিয়েছে। গোলোক বসু-সাধুচরণের সংলাপ থেকে নীলকরদের অত্যাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সাধু-রাইচরণদের সবচেয়ে ভাল জমিতে নীলের দাগ দিলে, তারা প্রতিবাদ করে। নীলকরদের পেয়াদা আমিন এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ধৃত দুই রায়তের উপর নির্যাতন দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। সেখানে নবীন মাধব গিয়ে সাহেবদের কাছে দুই ভাইয়ের পক্ষে সওয়াল করলে সেও লাঞ্ছিত হয়। চতুর্থে গোলোক বসু পরিবারের সহজ স্নেহময় পরিবেশটি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অঙ্কে স্বরপুরের গৃহস্থজীবন কিভাবে বেগুনবেড়ের নীলকুঠিয়ালদের দ্বারা বিপন্ন হচ্ছিল তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে নাট্যঘটনায় ক্রমশ গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। এখানে তিনটি গর্ভাঙ্ক স্থান পেয়েছে। তোরাপ বসু পরিবারের অনুগত, তাকে আটক করে গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তার সঙ্কল্প 'জান কবুল'—তবু মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারবে না। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিন্দু মাধবের চিঠি থেকে জানা গেল গোলাক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু হয়েছে। চারটি গর্ভাঙ্কসহ তৃতীয় অঙ্কে ঘটনা প্রবাহ চরমোৎকর্ষে পৌঁছেছে। রোগ সাহেবের ঘর থেকে ক্ষেত্রমণির উদ্ধার ও নবীনমাধবের ইন্দ্রাবাদ যাত্রায় দু একদিন অতিবাহিত হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কের দৃশ্যগুলি বেগুনবেড়ের কুঠি, নবীনমাধবের বাড়ী ও রোগ সাহেবের কামরায় সন্নিবিষ্ট। তিনটি গর্ভাঙ্ক চতুর্থ অঙ্কের ঘটনাপ্রবাহ ক্রমশঃ করুণ পরিণামের দিকে ধাবিত হয়েছে। ইন্দ্রাবাদে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যর সাহায্যে গোলোক বসুর হাজত বাসের আদেশ, জেল হাজতে আত্মাবমাননা হেতু তিনদিন অনশনে থাকার পর 'উদ্বন্ধনে' গোলোকের আত্মহত্যা। নীলকরদের চক্রান্তের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি চতুর্থ অঙ্কের বিষয়।

নীলকরদের সঙ্গে বসু পরিবারের সংঘাতের শেষে গোলোকের মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে এই পরিণতি, নাটকের ঘটনাপ্রবাহের অবরোহ (falling action) রূপে বর্ণিত হয়েছে। এই অঙ্কের বর্ণিতব্য স্থান হোর ইন্দ্রাবাদের আদালত, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী এবং জেলখানা।

পঞ্চম অঙ্কে বসুপরিবার ও সাধুচরণের পরিবারের করুণ পরিণতির পর, পিতৃশ্রাদ্ধের পর নবীন গ্রাম ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে নীলকরেরা বাধা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হোল। তারা নীল চাষের জন্য, নবীনের পিতৃশ্রাদ্ধ ও নিয়মভঙ্গ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী হোল না। পরিবর্তে নবীনকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়, ফলতঃ সে সাহেবের বুকে আঘাত করে। নীলকরের সড়কিওয়ালারা নবীনের মাথা ফাটিয়ে দেয়, পরিশেষে তার মৃত্যু ঘটে। ওদিকে ক্ষেত্রমণির গর্ভপাত ঘটে, শেষে শয্যাকণ্টকিতে তার মৃত্যু হয়।

নাটক পড়ে সাধারণ পাঠকের 'নীল-দর্পণ' নাটকের' বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়, তা হোল ক্ষমতা গর্বোদ্ধত অত্যাচারী ইংরেজদের সঙ্গে বাংলাদেশের সাধারণ কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষ, শত অত্যাচার সত্ত্বেও প্রতিরোধ শক্তিহীন হওয়ায়, মর্মন্তুদ পরিণামের শিকার হয়েছে। নাট্যাকার নীলকরদের অত্যাচারের স্বরূপ তুলে ধরার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বর্ণনা পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। ক্ষেত্রমণির শ্লীলতাহানির মত প্রত্যক্ষ ঘটনার পাশাপাশি বেগুনবেড়ের কুঠিতে অবরুদ্ধ রায়তদের কথোপকথনের এবং মিথ্যা মামলায় হারিয়ে গোলোক বসুর মর্যাদা হানি করার মত ঘটনা থেকে সপ্রমাণিক। এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রতিকার অসমর্থ চাষীদের ক্ষোভ ও নবীন মাধবের নেতৃত্বে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আয়োজন নাটকীয় সংঘাতের তীব্রতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। নাট্যকারের ঘটনা বিন্যাসের চাতুর্যে সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত নাটকীয় গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। অসম শক্তির সঙ্গে মূল দ্বন্দ্বের পরিণতির জন্য দর্শক উৎকণ্ঠা শেষাবধি বজায় ছিল।

নীলদর্পণ উদ্দেশ্যমূলক নাটক। দীনবন্ধুর নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি আশা করেছিলেন, এই নাটকের মধ্যে দিয়ে নীলকরদের স্বরূপ তুলে ধরতে পারবেন, প্রজারা একদিন

যথার্থ সুবিচার পাবে। তাই তিনি নাটকে নীলকরদের মনুষ্যত্ব-বর্জিত শোষণ-পীড়নের রূপটি তুলে ধরেছিলেন। নীলকররা জোর করে দাদন নিতে বাধ্য করে, ভাল জমিতে নীল চাষের জন্য মার্কা করে, উৎপন্ন নীলের ন্যায় সঙ্গত দাম দেয় না। বিষয়টি যথাযথ উপস্থাপনার জন্য নাট্যকার নাট্যকাহিনীটি গোলোক বসু ও সাধুচরণের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তোরাপ ও অন্যান্য রায়তরা। গোলক বসু পরিবারের কাহিনীর প্রাধান্যই পাঠক দর্শকের শেষে উপলব্ধির বিষয় হয়ে উঠেছে। নবীনমাধব নিপীড়ন উপেক্ষা করে প্রজাদের দুঃখ দুর্গতি থেকে মুক্তির চেষ্টা করেছে, এইসব বিবেচনায় নাট্যকার তাকে নায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু নীলকরদের সঙ্গে তাঁর সংঘাতের দৃশ্য পরোক্ষভাবে বর্ণিত হওয়ায় নাটকের পরিণতির দৃশ্যটি দুর্বল হয়েছে। আর আখ্যানের মধ্যভাগে গোলোক বসুর আত্মহত্যা, ক্ষেত্রমণির মৃত্যু, আর আখ্যানের শেষভাগে নবীন বসু, নবীনের মা সাবিত্রী, নবীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ সরলতার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে করুণ রসকে প্রগাঢ় করে তুলতে চাওয়া হয়েছে। ফলতঃ নাটকটিতে ট্র্যাজেডির উদাত্তরূপ প্রকটিত হতে পারেনি।

৮৩.৬ নীল-দর্পণ নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ ও আলোচনা

নাটকীয় চরিত্রের যথাযথ বিকাশ ও পরিণতির মধ্য দিয়ে নাটকের সাফল্য অনেক সময় নির্ভর করে। আধুনিক নাটক চরিত্রপ্রধান। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের বিশেষতঃ নীলদর্পণের রসগত সাফল্য, পরিস্ফুট হয়েছে নাটকের নিম্নগোষ্ঠীর মানুষদের চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে এবং সেটি বাস্তব হয়েছে দীনবন্ধুর তন্নিষ্ঠ জীবনদৃষ্টির জন্য। এই শ্রেণীর চরিত্রগুলির প্রতি নাট্যকারের গভীর সহানুভূতির জন্যই এটি সম্ভব হয়েছে। তাঁর তোরাপ শুধু নয়—সাধুচরণ, ক্ষেত্রমণি, রাইচরণ ও অন্যান্য রায়ত, গুপীর মতো দেওয়ান, বিশেষ করে আদুরী, পদী ময়রাণী প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টিতে দীনবন্ধুর নিরাসক্ত মানব সত্যবোধ ও নাটকীয় বস্তুর বাস্তবতা বোধ যে অতি উচ্চস্তরের ছিল তা বোঝা যায়। নীলদর্পণে কৃষকশ্রেণীর একটি চরিত্রগত ঐক্য সত্ত্বেও, তাদের স্বাতন্ত্র্যগুলিও নাট্যকার তুলে ধরতে ভোলেন নি।

দীনবন্ধু মিত্র কর্মজীবনে বাংলা, বিহার, আসাম অঞ্চলে পরিভ্রমণ সূত্রে তাঁর সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ঘটেছিল। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ সম্বন্ধেও তাঁর ধ্যানধারণা এবং মধ্যশ্রেণীর চরিত্রগুলির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি বাস্তবে যা দেখতেন তা তাঁর প্রাণে সাড়া দিত, বিশেষ অত্যাচারিতের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল। তাই সাধুচরণের পরিবারের বিপর্যয়, বসু পরিবারের দুর্দশা—নবীনমাধবের পারিবারিক ট্রাজেডির বিষয়টি উপেক্ষিত হয়নি।

বসু পরিবারের গৃহকর্তা গোলোকচন্দ্রকে এই নাটকে তিনবার দেখা গেছে। নাটকের সূচনায় প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে তিনি প্রতিবেশী রায়ত সাধুচরণের সঙ্গে কথোপকথনে রত। তাঁদের পারস্পরিক সংলাপের মধ্য থেকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের আভাস দেওয়া হয়েছে। নাট্যকার এভাবে সুকৌশলে নাটকের প্রস্তাবনার কাজটি সেরে নিয়েছেন। দ্বিতীয় বার গোলোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে, ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারী কাছারিতে। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাকে বিচারকের

সামনে দাঁড় করান হয়েছে। তৃতীয় ও শেষবার তাঁকে দেখা যায় চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—জেলখানায়, যেখানে তিনি উদ্ধন্ধনে প্রাণত্যাগ করেছেন। এই আকস্মিক শোকাবহ পরিণতি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর শান্ত স্বভাব ও ধীরস্থির সংযত জীবনযাপন, ধর্মভীরু ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ নয়, আকস্কিক মানসিক ধৈর্য্যচুতি এবং আত্মহত্যার মত ধর্মবিগর্হিত কাজ বরং অনেকটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গাত উল্লেখ করা যেতে পারে এই নাটকে বস্তুতঃ গোলোকচন্দ্রকে কোথাও কোনরকম প্রত্যক্ষ নাট্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়নি। নবীনচন্দ্রের উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্র মহিমা পরোক্ষে তুলে ধরা হয়েছে। এ হেন গোলোকচন্দ্রের শেষ পরিণতির দৃশ্যটির মাধ্যমে নাট্যকার উৎপীড়নের স্বরূপ তুলে ধরে পাঠক দর্শকের মনকে প্রতিবাদ মুখর করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

নবীনমাধব—নীল-দর্পণ নাটকের নায়ক হিসেবে কল্পিত। তিনি সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, বলিষ্ঠ চরিত্র, সঙ্কল্প সাধনে, অন্যায়ের প্রতিবাদে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মধারা দুর্গত প্রজাদের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল নিয়ে সাধারণ প্রজাদের ওপর শোষণ পীড়নের প্রতিবাদ করতে নীলকরদের মুখোমুখী হতে দ্বিধা করেন না। নীলকররা তাদের ব্যক্তিগত চাষের জমিতে অন্যায়ভাবে নীল চাষের জন্য চিহ্নিত করলে তিনি প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেন নি। নবীন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, তাঁর গত সনের নীলের দাম না দিলে, কিছুতেই এক বিঘাও নীল চাষ করবেন না—"এতে প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছাড়।" নবীনের এই দৃঢ়তা নায়কোচিত বলা যায়।

দীনবন্ধু মিত্র সম্ভবতঃ নীল-দর্পণের নায়ক হিসেবে নবীনমাধবকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। নবীন তথাকথিত মধ্যবিত্ত চরিত্রের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করলেও নাটকের ঘটনা প্রবাহকে নাটকের পরিণতির দিক নিয়ে যেতে পারেননি। নবীনকে 'স্বরপুর-কেশরী' বা তার "ভ্যালা সাহসের" উল্লেখ সত্ত্বেও তাঁর সাহসিকতার পরিচয় আচরণে, কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি। সাধুচরণ ও রাইচরণের মুক্তির জন্য উড সাহেবের কাছে আবেদন এবং তোরাপকে সঙ্গে নিয়ে বেগুনবেড়ের কুঠীতে রোগ সাহেবের ঘরের জানালা ভেঙ্গে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করার দুটি মাত্র দৃশ্য ছাড়া কোথাও নবীনকে সক্রিয় ও বাস্তব ভূমিকায় দেখা যায়নি। বরং নবীনের দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ সংলাপ নাট্যক্রিয়া ও নাট্যরস পরিস্ফুটনে অন্তরায় হয়েছে।

নাটকের শেষ পর্যায়ে পিতা গোলোক বসু জেলে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করলে নবীন হৃদয়হীন নীলকরদের পঞ্চাশ টাকা সেলামী দিয়ে সকরুণ আবেদন জানায়—শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গ পর্যন্ত যেন তারা পুকুর পাড়ের জমিতে নীলচাষ স্থগিত রাখে। দুবৃর্ত্তদের কাছে নবীনের এই আবেদন তাঁর দুর্বল চিত্ততার পরিচায়ক। তাই নীলকর সাহেব তাঁর বুকে পায়ের জুতা ঠেকিয়ে অপমানিত লাঞ্ছিত করার সাহস পায়। ক্রোধান্ধ নবীন সাহেবের বুকে লাথি মারলে, সাহেবের লাঠিয়ালরা তার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করায় নবীনের অকাল জীবনাবসান হয়। নবীনের এই আচরণ পৌরুষব্যঞ্জক নয়। দুর্বৃত্তের কাছে আবেদনের যে কোন মূল্য নেই, আর অসম সংঘাতের পরিণতি সম্পর্কে নবীনের বোধের অভাব, তাঁর বাস্তবজ্ঞানের দৈন্যকেই প্রকাশ করেছে।

সাধুচরণ বসু পরিবারের একান্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, গৃহস্থ চাষী। চাষী পরিবারের সন্তান, তার কথাবার্তায়, আচারে-ব্যবহারে সৌজন্যে-সৌহার্দ্য অনেকটা গ্রাম্যতামুক্ত—কখনো কখনো তার আচরণ মনে হয় কৃত্রিম। মার্জিত রুচি ও রীতিনীতির প্রতি তার একান্ত আকর্ষণ লক্ষণীয়ভাবে প্রকট।

গাঁয়ের স্কুলে সামান্য লেখাপড়া শিখেছে, তাই তার আচরণে কিছুটা সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ভাষা ব্যবহারে 'সাধু' ভাষার প্রতি তার একান্ত আসক্তি, তাঁকে অনেকক্ষেত্রে হাস্যাস্পদ করেছে। পাঠ্য বইয়ে ব্যবহৃত সাধু গদ্যে সে কথাবার্তা বলে। তার চরিত্রে একটি সহজাত, সারল্য, অসহায়তা জীবন জটিলতা সম্পর্কে অজ্ঞতা দৃশ্যমান।

সাধু সামান্য লেখাপড়া শিখে এবং বসু পরিবারের সান্নিধ্যে নীলের দাদনের বিষময় ভূমিকা সম্পর্কে বুঝে নীল চাষীদের দাদন না নেবার পরামর্শ দিয়েছে। নীলকররা এজন্য তার প্রতি রুষ্ট হয়ে, কুঠীতে ধরে এনে চরম নিগ্রহ করেছে। শ্যামচাঁদের শত প্রহারেও সে কাতরোক্তি করেনি। নীলকরেরা তাঁর ন-বিঘে জমি নীল চাষের জন্য চিহ্নিত করলে, আক্ষেপ করে বলেছে, "দেড় খানা লাঙলে" চাষ করতে গেলে "হাঁড়ি শিকেয় উঠবে।"

সাধু নবীনমাধবের মতো আদর্শবাদী বিধায় চাষীসুলভ আদিম বলিষ্ঠতার পরিচয় কোথাও পাওয়া যায়নি। সে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য কৃষিকাজটুকুও কখনো করেনি। ছোট ভাই রাইচরণের ওপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে ভারমুক্ত থেকেছে। নীলকরদের সীমাহীন জুলুমে পরিবারের সমূহ ক্ষতি সত্ত্বেও সামান্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া তাকে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। নবীনমাধব নীলকরদের দ্বারা প্রহৃত হলে, সাধুচরণ বড়বাবুর জন্য ব্যাকুল হয়েছে, কিন্তু একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণির শোচনীয় মৃত্যুতে রেবতীর হাহাকারের মধ্যে সাধুচরণকে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। নাট্যকার চরিত্রটিকে আদর্শবাদী করে আঁকতে চেয়েছেন, ফলে সে নাটকের উপযোগী বাস্তবসম্মত ও জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।

রাইচরণ—সাধুচরণের ছোট ভাই, একেবারে বস্তুনিষ্ঠ ও জীবন্ত চরিত্র। সে প্রকৃত চাষী, তার মাটির সঙ্গে নাড়ীর যোগ, কঠিন পরিশ্রমী ও বাস্তববাদী। তাদের সাঁপোলতার জমি নীলচাষের জন্য চিহ্নিত হয়েছে, তাই বিচলিত হয়ে বলেচে, "আহা জমি তো নয়, য্যান সোনার চাঁপা। এক কোন কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম।" এই "সোনার চাঁপা" জমিতে আমিন দাগ দিয়েছে বলে তার মনে যে দুঃসহ মর্মবেদনা হয়েছে, তা বুঝাতে সে যে উপমা ব্যবহার করেছে তা একান্তভাবেই গ্রাম্য কৃষকের "মুই বলবো কি, জমিতি দাগ মারতি লাগলো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়য়ে দিতে লাগলো।" "গোবার নীলি'র হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে আমিনের কাছে অনুনয় বিনয় করে ব্যর্থ হয়ে, টাকা দিতে চেয়েও যখন কোন সুরাহা হোল না তখন ক্ষোভে যে ফৌজদারী করার হুমকি দিয়েছে। ফলতঃ পেয়াদাসহ আমিন এসে রাইচরণ ও সাধুচরণকে কুঠিতে ধরে নিয়ে যায়। সাধু উড সাহেবের সঙ্গে যুক্তি তর্কের অবতারণা করল, সাহেব তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য শ্যামচাঁদ তুলে নেন। দাদা সাধুচরণের ওপর সম্ভাব্য পীড়নের আশঙ্কায় ও ক্ষুধার তাড়নায় রাইচরণ বলে, "ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্ছে ন্যাকে দে, ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ি পড়লো।' রাইচরণ বলিষ্ট, পরিশ্রমী, দাদা সাধুচরণের অনুগত,

দুঃসাহসী না হলেও, নিতান্ত ভীরু স্বভাবের নয়। তার সংলাপে সাধারণ, ভাষা-ভঙ্গী ও আচরণ রক্তমাংসের সাধারণ গ্রাম্য রায়তের সঙ্গে বাস্তবানুগ।

তোরাপ:—দীনবন্ধু মিত্রের অন্যতম স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি। এই মুসলমান কৃষকের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, প্রাণশক্তির উচ্ছলতা, হিন্দু মনিবের প্রতি আনুগত্য বোধ, অবিচল কৃতজ্ঞতা এবং ধর্মপ্রাণতার পরিচয় চরিত্রটিকে অনন্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। তোরাপ নবীনমাধবের আশ্রিত। তাকে প্রথমে দেখা গেছে বেগুনবেড়ের গুদামঘরের কয়েদখানায়। তারপর ক্ষেত্রমণিকে বেগুনবেড়ের কুঠিতে ধরে নিয়ে গেছে, এই সংবাদে সে নবীনমাধবের সঙ্গে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধারের জন্য গিয়েছে। এই দ্বিতীয়বার সে রাত্রিতে জানালার খড়খড়ি ভেঙে নবীনমাধবের সঙ্গে সাহেবের ঘরে অতর্কিতে প্রবেশ করে ক্ষেত্রকে উদ্ধার করেছে। শেষবার তাকে দেখা গেছে উড সাহেবের লাঠির আঘাতে সংজ্ঞাহীন নবীনমাধবের গৃহাঙ্গনে। 'শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্যন্ত বুনন' বন্ধের অনুরোধ করেও যখন নবীন অপমানিত হয়ে সাহেবের বক্ষস্থলে পদাঘাত করলে, উড সাহেবের লাঠির আঘাতে অচৈতন্য, তোরাপ তখন "একগুঁয়ে মহিষের মত" সমস্ত বাধা ভেদ করে নবীনকে কোলে নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় বড় সাহেবের নাক কামড়ে নিয়ে পালিয়েছিল।

তোরাপের কৃতজ্ঞতাবোধ সীমাহীন। বড়বাবুর কাছে সে এতই উপকৃত যে গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বললে, সে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে, "খুই কখনুই পারবো না—জান কবুল।" অন্যত্র দেখি নবীনমাধবকে বাঁচাতে না পেরে অনুতপ্ত তোরাপ কপালে করাঘাত করে কেঁদে বলেছে—"আল্লা, বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে, মুই বাবুকে একবার বাঁচাতে পাল্লাম না।" এ হেন তোরাপের মুখে ব্যবহৃত নাট্য সংলাপ গ্রামবাংলার অশিক্ষিত ধর্ম বিশ্বাসী, সরল অথচ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তির মুখের সংলাপ। তোরাপ যথার্থ অর্থেই পল্লী বাংলার একান্ত বিশ্বস্ত চরিত্র।

সাবিত্রী-সৈরন্ধ্রী-সরলতা—এই তিনটি নারীচরিত্র বাংলার ভূমিকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আদর্শ গৃহবধূ রূপে চিহ্নিত হবার যোগ্য। স্বচ্ছল পরিবারের গৃহিণী সাবিত্রী দেবসেবা, অতিথি সৎকার, আত্মীয় স্বজন পালন, সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে সতত দৃষ্টি, তাঁর নারী ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাঁর কর্তব্য পরায়ণতা, পতিব্রতা, পুত্র বাৎসল্য, পুত্রবধূদের প্রতি সদা স্নেহ পারবশ্য এবং প্রতিবেশীদের প্রতি সতত মমতা ও তাদের আপদে বিপদে একান্ত করুণাময়ী আপনজনের মত অংশগ্রহণ করায় তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে।

ছোট সাহেবের নির্দেশে পদীময়রাণীর ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে বিচলিত রেবতী সাবিত্রীর কাছে তার সঙ্কটের কথা জানালে ধর্মপরায়ণা সাবিত্রী বলেছে, "ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে হবে"—সাবিত্রী মনে করে ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত এ সংসারে বিপদমুক্তির কোন পথ নেই। কিন্তু এ হেন সাবিত্রীও ক্ষেত্রমণি অপহরণের সংবাদে কর্তব্যবোধের প্রেরণায় পত্র নবীন মাধবকে বলেছেন, যদি নীল বানরের হাত থেকে 'পবিত্র মাণিক্য' অপবিত্র না হতেই আনতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে ধারণ করেছি জানব। (৩/২)

সাবিত্রী কোমল হৃদয়া কর্তব্য পরায়ণা গোলোক বসুর আদর্শ সহধর্মিনী। স্বামীকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করে ইন্দ্রাবাদে জেলে আটক করলে পরিবারের সকলেই যখন বিব্রত বোধ করেছে, সাবিত্রী তাঁর

স্থিতধী প্রজ্ঞায় সকলকে সংযত থাকতে বলেছেন, প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। অপমান ও লাঞ্ছনায় গোলোক উদ্ধন্ধনে আত্মহত্যা করলে তিনি পুত্রদ্বয়ের কথা ভেবে সে শোকভার সংযতভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নীলকরদের লাঠির আঘাতে নবীন রক্তাক্ত। পরে মৃত্যু ঘটলে সাবিত্রী উন্মাদ হয়ে পুত্রবধূ সরলতাকে হত্যা করে, পরে জ্ঞানলাভে মানসিক আঘাত ও অনুশোচনায় প্রথমে মূর্চ্ছা ও পরে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। পর পর তিনটি মানুষের এভাবে মৃত্যু খুব স্বাভাবিক মনে না হলেও যেমন ভয়াবহ, তেমনি আকস্মিকতা সত্ত্বেও শোকাবহ।

সৈরিন্ধ্রী বসু পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ। নবীনের স্ত্রী। শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি সেবা, স্বামীর প্রতি গভীর ভালবাসা, দেবর বিন্দু ও ছোট জা-র প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ তাঁর চরিত্রকে বিশিষ্ট করেছে। ছোট বৌ তার মতে "বড় পয়মন্ত, (তার) নাম করে যা করি তাই ভাল হয়।" সরলতার প্রশংসায় বড় বৌ পঞ্চমুখ— "আহা চুল তো নয়, শ্যামা ঠাকুরণের কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্বদা হাস্য বদন।" সৈরিন্ধ্রী বলেছে, "লোকে বলে যাকে যায় দেখতে পারে না।.....ছোট ব'য়ের মুখ দেখ্‌লে আমার তো বুক জুড়য়ে যায়।" সে আরও বলেছে "আমার বিপিনও যেমন ছোটবউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।" দেবরের প্রতিও তাঁর স্নেহ মমতার অন্ত নেই। দাদার প্রতি তাঁর ভক্তি, চিঠিপত্রের ভক্তিপূর্ণ ভাষা, তাঁর মনকে ভরিয়ে রেখেছে। পরিচারিকা আদুরীও তাঁর স্নেহের পাত্রী। নীলকরদের মিথ্যা মামলায় গোলোক বসু জেলে আটক। নবীনমাধব মামলা পরিচালনার জন্য যে সময় অর্থচিন্তায় বিব্রত, সেই সময় পতিব্রতা বধু সৈরিন্ধ্রী তাঁর সমস্ত অলঙ্কার স্বামীর হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করেনি। নবীনকে সৈরিন্ধ্রী বলেছে—"তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শাশুড়ীর দীর্ঘ নিশ্বাস, ছোট বয়ের বিরস বদন,.....রায়তদের হাহাকার" এসব দেখে কি মনে আনন্দ থাকে? বড় বৌ-এর এ আচরণ তাঁর চরিত্রের মাধুর্য, কর্তব্যজ্ঞান ও যথার্থ সাংসারিক জ্ঞানের পরিচায়ক। নবীন নীলকরের লাঠিয়ালের লাঠির ঘায়ে শয্যাশায়ী হলে এহেন সৈরিন্ধ্রীকে ভেঙ্গে পড়তে দেখতে পাওয়া যায়। নবীনের মৃত্যু তাকে শোকাকুল করে তোলে।" সর্বাচ্ছাদক স্বামী" হীন হলে সে যে আবার পথের কাঙালিনী হবে। তবু বিপিনের মুখ চেয়ে তাঁকে তো বাঁচতেই হবে। দীনবন্ধু মিত্র সৈরিন্ধ্রী চরিত্রাঙ্কনে আদর্শবাদিতার পরিচয় দিলেও, তাঁর একটি বাস্তব ভিত্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু তাঁর মুখে ব্যবহৃত সংলাপে বাস্তবের কোন সংস্পর্শ নেই। তাঁর কথাগুলি হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নয়, গ্রন্থে আরোপিত কৃত্রিম ভাষা প্রাণের কথা প্রকাশের ভাষা নয়। তাঁর সংলাপের দুর্বলতা স্বীকার করে নিলেও, সৈরিন্ধ্রী চরিত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

সরলতা—বসু পরিবারের ছোট বৌ, বিন্দুমাধবের স্ত্রী। রক্ত কমলের মত তার রং, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্বদাই হাস্যবদন। সে সবসময় প্রাণরসে উচ্ছল, তাঁর মুখে কথার খৈ ফোটে, হাসিতে ঝর্ণা বয়। সরলতা লেখা পড়া জানে। বড় জা তার কাছে বিদ্যাসাগরের বেতালের গল্প শুনতে চান। বিন্দুর কাছে সে সেক্সপীয়রের বঙ্গানুবাদ, বঙ্কিমের উপন্যাস নিয়ে আসবার আবেদন জানায়। গোলোক বসুকে মিথ্যা মামলায় ইন্দ্রাবাদের জেলে নিয়ে গেলে, এ হেন সরলতার উচ্ছলতা স্তব্ধ হয়ে গেল। শাশুড়ী সাবিত্রী বলেছেন, 'তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই.....বাসীফুলের মত

মলিন হয়েছেন।" নবীনের মৃত্যু পরিবারে নতুনতর বিপর্যয় নিয়ে এলে, সরলতা এই আকস্মিক বেদনার আঘাতে ম্লানমুখী ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে।

শাশুড়ী সাবিত্রী সরলতার প্রাণরসে পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছলতায় মুগ্ধ, তিনিই নবীনের শোকে উন্মাদ হয়ে গেলে সরলতা তাঁর সেবা করেছে, তথাপি বিকৃত মস্তিষ্ক সাবিত্রী তার গলায় পা দিয়ে তাকে হত্যা করেছে। সরলতার এই মৃত্যু মর্মান্তিক। পাঠক-দর্শক এই দৃশ্যে বেদনাতুর হয়ে পড়ে। সরলতা নাট্যকারের অভিনব সৃষ্টি।

রেবতী-ক্ষেত্রমণি—সাধুচরণের স্ত্রী ও কন্যা। রেবতী চাষী পরিবারের গৃহিণী। স্নেহশীলা, কর্তব্যপরায়ণা, বাস্তববোধ সম্পন্ন নারী। কুঠির আমিনের নির্দেশে মাঠ থেকে সদ্য প্রত্যাগত, ক্ষুধার্ত রাইচরণকে বেঁধে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করলে, সাধুচরণ বিপদে হাল ছেড়ে দিয়ে শুধু আক্ষেপই করেছে। রেবতী এই বিপদে তাদের ভরসাস্থল, নবীনমাধবের কথা স্মরণ করে, সাধুচরণকে তাঁর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। অপর দিকে আমিনের কাছে অনুরোধ করেছে, "দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও।" রেবতীর এই ব্যাকুলতা, দেবরের প্রতি তার স্নেহার্দ্র হৃদয়ের পরিচায়ক।

গোপীনাথ রোগ সাহেবকে ক্ষেত্রমণির রূপযৌবনের কথা বলেছে। পদীময়রাণীকে রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকে কুঠিতে নিয়ে যাবার জন্য দূতী হিসেবে পাঠিয়েছে। বিচলিত রেবতী সাবিত্রীর পরামর্শের জন্য দ্বারস্থ হয়েছে। সাবিত্রী আশ্বাস দিলেও রেবতী স্বস্তি পায়নি। সে বাস্তববোধ থেকে জানে, "মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পুরুষদের নীলের দাদনে বাধ্য করা হয়।" রেবতী চাষীবধূ হলেও অনেক সংবাদ রাখে। গোলোক বসু মহাশয়কেও ফাঁদে ফেল বার চেষ্টা হচ্ছে। গর্ভবতী ক্ষেত্রমণিকে ধরে নিয়ে গেলে রেবতী নবীনমাধবের কাছে আবেদন করেছে, "মোর ক্ষেত্রমণিরি অ্যানে দাও"। নবীন ও তোরাপ তাকে উদ্ধার করে আনে। ছোট সাহেবের অত্যাচারে ক্ষেত্রর শয্যাকণ্টকি হয়েছে এবং তার গর্ভপাত হয়। ক্ষেত্রর জন্য ব্যাকুলতার সঙ্গে রেবতী জামাইকে হারাবার ভীতিতে আকুল হয়ে ওঠে। রেবতী নীলকরদের এই অত্যাচারে শোকাপ্লুত হয়ে বলেছে "ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্রকে ..... কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে না।" রেবতীর এই আকুল আবেদন সর্বকালের অসহায় দরিদ্রের মর্মবেদনা তুলে ধরেছে।

নাট্যকার রেবতীর চরিত্র একটানা দুঃখের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। রেবতী বেদনার প্রতিমূর্তি রূপেই চিত্রিত। অসহায় দুর্বলের উপর শক্তিমদমত্ত দুর্বৃত্তের হৃদয়হীন অত্যাচারের শাশ্বত করুণ-কাহিনী রেবতীকে আশ্রয় করে রূপ পরিগ্রহ করেছে। স্বামী, দেবর কন্যার ওপর অত্যাচার ও পরিশেষে একমাত্র কন্যার মৃত্যু এই অসহায় জননী হৃদয়কে কি পরিমাণ বিচলিত করতে পারে তা সাধারণভাবে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে রেবতী যখন শোকে বিলাপ করে বলে, "সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল, ... মুখ দেখে জুড়োতাম .....।" রেবতীর মাধ্যমে গ্রাম বাংলার অসহায় জননীর এ যেন আর্ত-কান্না। দীনবন্ধু রেবতীর বাস্তবচিত্র এঁকেছেন।

ক্ষেত্রমণি—সাধুচরণ রেবতীর একমাত্র সন্তান। পিতামাতার একান্ত স্নেহ ও আদরের পাত্রী। সুন্দর

স্বাস্থ্যের অধিকারিণী শ্রী ও কান্তিমণ্ডিত চেহারা। সে বিবাহিত সন্তান-সম্ভবা। নীলকুঠীর আমিন সাধুচরণ রাইচরণের "সোনার চাপা-র মতো জমিতে দাগ দিতে এসে ক্ষেত্রমণির সুঠাম সুশ্রী চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে ভাবল" "এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন জিনিস পেলে লুপে নেবে।" তদুপরি পদী জানিয়েছে, ছোট সাহেব নিজেও তাকে দেখে পাগল হয়েছে। এভাবে ক্ষেত্রমণির ওপর নীলকর ছোট সাহেবের লুব্ধ দৃষ্টি এসে পড়ায় সে সৃষ্টির আগুনে সাধুচরণ-রেবতীর ঘর-সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

দীঘিতে জল আনতে গেলে কুঠির লেঠেলরা ক্ষেত্রকে জোর করে নিয়ে যায়। ক্ষেত্র কৃষক পরিবারের সাধারণ মেয়ে হলেও নাট্যকার চরিত্রটির মধ্যে অসাধারণ দৃঢ়তা সঞ্চারিত করেছেন। দেহলোলুপ রোগ সাহেব তাকে স্পর্শ করতে গেলে তার মধ্যে যে কাঠিন্য লক্ষ্য করা যায়, তা এই নিরক্ষর নারীটির, সহজাত প্রতিরোধ শক্তির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। তার এই শক্তি জননীর আদিম স্বভাবত প্রবৃত্তি থেকে প্রাপ্ত, তার নিশ্বাসবায়ুর মতই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সতীধর্মের প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠা, যাকে সে ধ্রুবতারার মত একান্ত লক্ষ্য হিসাবে আশ্রয় করেছে—শত প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শনেও তাকে বিচলিত ও বিচ্যুত করতে পারেনি। রোগ সাহেবের লোলুপ দৃষ্টি ও বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও সে সতীত্ব রক্ষার সঙ্কল্পে অটল থেকেছে। পদী ময়রানী প্রদত্ত প্রলোভন, তাকে বিচলিত করতে পারেনি, "চট পরে থাকি সে-ও ভাল তবু য্যান বিবির পোষাক পরতি না হয়।"

রোগ ক্ষেত্রর শ্লীলতা নষ্ট করতে উদ্যত হলে, গ্রাম্য মেয়েটি বলেছে, "ও সাহেব, তুমি মোর বাবা", উত্তরে কামোন্মত্ত নীলকর উত্তর দিয়েছে, "তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে।" ক্ষেত্রমণি গর্ভের সন্তানের দোহাই দিয়ে একান্ত মিনতি জানিয়েছে—"মোর ছেলে মরে যাবে..... মুই পোয়াতি।" দৈহিক শুচিতা রক্ষার জন্য ক্ষেত্রমণি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সাহেবকে বাধা দিয়েছে, বলেছে, "মোর গায়ে যদি হাত দিবি তোর হাত মুই, এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো টুকরো করবো।" পরিশেষে গর্ভপাতের ফলে ক্ষেত্রমণির অকালে মৃত্যু হয়েছে। তথাপি, ক্ষেত্রমণি চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সতীধর্মে সুগভীর আস্থার জন্য স্মরণীয়তা লাভ করেছে। আরও একটি কারণে ক্ষেত্রমণি চরিত্রটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীলদর্পণ নাটকে একমাত্র ক্ষেত্রমণি চরিত্রটি নানা রকম নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হওয়ায় জীবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আদুরী ও পদীময়রাণী—আদুরী বসু পরিবারের পরিচারিকা, পদীময়রাণী দুরাচারিণী, রোগ সাহেবের রক্ষিতা। আদুরী বসু পরিবারের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িত। সে প্রাণোচ্ছল ও রঙ্গ পরিহাস প্রিয়তার গুণে সকলের প্রিয়। তার স্বতোৎসারিত রসিকতা সর্বত্র শালীনতার মাত্রা রক্ষা করতে না পারলেও, স্বাভাবিক গণ্ডী অতিক্রম করেনি। আদুরী যৌবন অতিক্রান্তা। বয়োধর্মে কানে কম শোনে এবং দাঁত পড়লেও "ডান" হতে রাজী নয়। ডান হওয়ার মতো সে বৃদ্ধ হয়নি বলে তার বিশ্বাস। বয়স তার যাই হোক, প্রাণের সহজ, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি। তার কথাবার্তায় সরলতা ও প্রগলভতা দুই-ই লক্ষ্য করা যায়। তার স্বামীর কথা উঠলেই প্রতিশ্রুত বাউটি-পৈঁছার জন্য শোক করে। আদুরী মনে

দাম্পত্যজীবনের স্মৃতি অন্তরে লালন করে চলেছে। তার স্বামী তাকে ভালোবাসতো কিনা পরিহাস ছলে সরলতা এই প্রশ্ন করলে তার মনে এক কোমল অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। দাম্পত্য জীবনের মধুর স্মৃতি তার হৃদয়কে আবেগে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সে ঘুমে ঝিমুলে তার স্বামী বলতো "ও পরাণ ঘুমুলে।"

বসু পরিবারের বধূদের প্রতি সে অপরিসীম স্নেহপরায়ণ। ননদসুলভ সরল রসিকতা করতে সে কখনো ছাড়েনি। বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ উঠতেই আদুরী তার সংস্কার বশে বলেছে, "সেই নগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা.....মুই আজাদের দলে।" আদুরী সাধারণ সংস্কারবশতঃ বিধবা বিবাহ আপাত সমর্থন না করলেও, সে যে মনে মনে বিদ্যাসাগরের পক্ষপাতিনী তা বোঝা যায় কতিপয় সংলাপ থেকে। তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে অপরিতৃপ্ত জীবনাকাঙ্খী সুপ্ত ছিল, সামান্য সুযোগেই তা অকস্মাৎ বিদ্যুত চমকের মতো বেরিয়ে আসে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রোগ-ক্ষেত্রমণি প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে। আদুরী বলেছে, "থু থু থু—গোন্দো। প্যাজির গোন্দো। সাহেবের কাছে কি মোর যাতি পারি, গোন্দো থু থু।" একথা থেকে এটুকু বোঝা যায় পেঁয়াজের গন্ধটুকু ছাড়া আর কিছুতে যেন তার আপত্তি নেই। পুনরায় সে বলেছে, "মা গো যে দাড়ি। কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছারলি মুই তো কখনুই যাতি পারবো না, থু থু থু।" অর্থাৎ দাড়ি পেঁয়াজ ছাড়লে সে সাহেবের কাছে যেতেও রাজী।

আঁদুরী দীনবন্ধুর অনন্য সৃষ্টি, অন্যতম সার্থক চরিত্র সৃষ্টি, আদুরী জীবন্ত, প্রাণোচ্ছল ও বাস্তবানুগ।

পদী ময়রাণীর জাতও গেছে ধর্মও নষ্ট হয়েছে। কলঙ্কিত তার জীবন। সে রোগ সাহেবের উপপত্নী এটিই একমাত্র পরিচয় নয়, সে অর্থের জন্য আঁড় কাঠির কাজ করে। কামাতুর রোগ সাহেবকে গ্রাম্য অল্পবয়স্কা মেয়েদের জোগান দেয়। সে নিজ দেহটি বিক্রি করেইছে, সরলা গ্রাম্য মেয়েদেরও সর্বনাশ করে চলেছে। রোগ-এর আকাঙ্খা পূরণের জন্য ক্ষেত্রমণিকে উপহার দিতে গিয়ে বলেছে, "এমন সোনার হরিণ কি প্রাণে ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে।" মানুষ অনেক নীচে নামলেও তার মনুষ্যত্ববোধ বিসর্জন দিতে পারে না। তাই পথে নবীন বসুকে দেখে সে লজ্জা পায়—"ও মা কি লজ্জা। বড় বাবুকে মুখ দেখালাম!—বলে মাথার ঘোমটা টেনে দেয়। পদী দুশ্চরিত্রা, পাপীয়সী, সে কেবল তার একার দোষে নয়। পদীর এই খলন তার স্বভাব ধর্মে নয় দারিদ্র্যের কারণে অর্থের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির তার এই পরিণতির জন্য দায়ী। পদী অধঃপতিত হলেও স্ত্রীধর্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি। রোগ সাহেবের ঘরে ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে যাবার পর, ক্ষেত্রমণি ধর্ম রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে যখন পদীর সাহায্য চাইছে, অনুতপ্ত পদী বলেছে—"আমার জাতও গেছে, ধর্মও গেছে।" এই উক্তির মধ্যে যেন পদীর দীর্ঘ নিশ্বাস শুনতে পাওয়া যায়। সে পাপীয়সী কিন্তু ঘৃণার পাত্রী নয়। তারও যেন সামান্য করুণা প্রাপ্য।

নাট্যকার এছাড়াও তার নারী সুলভ মমতার আর একটি দিক তুলে ধরেছেন। পদী বলেছে, "আমিন.....বেটাই তো দেশ মজাচ্ছে। তা না হলে, আমার কি সাধ, কচি কচি মেয়ে সাহেবদের ধরে দিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারি।"

দীনবন্ধু পদী চরিত্র সৃষ্টিতে সমাজবাস্তবতার সঙ্গে সহানুভূতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

গোপীনাথ নীলকুঠির দেওয়ান, কুঠীর স্বার্থে কিছু অন্যায় কাজ করলে, ছয়মাস কারাদণ্ড হলেও কাজে বহাল থাকে। সব ধরনের কুকর্মে গোপীনাথ পারঙ্গম। নীলকরদের লাভের জন্য প্রজাদের কয়েদ করা, গুদামে আটকে রাখা, অযথা পীড়ন, সামান্য দাদনের বিনিময়ে ভাল ভাল জমি নীলের জন্য চিহ্নিত করা—এ সবই তার কাজ। এতৎ সত্ত্বেও নীলকর সাহেবরা তাকে বিশ্বাস করে না। উডের ধারণা কুঠির কর্মচারীরা নীলের দাদনের টাকা চুরি করে, তাই নীল কমিশন বসেছে। এক্ষেত্রে গোপীনাথ সাহেবকে বুঝতে চেষ্টা করে যে তারা 'কসায়ের কুকুর'—সামান্য নাড়ীভুঁড়িতেই পেটের ক্ষুধা মেটায়। গোপীনাথ কারণে অকারণে লাঞ্ছিত হলেও তাকে সহজভাবে গ্রহণ করে। সাহেবের পদাঘাত সত্ত্বেও চটুল মন্তব্য করতে ছাড়ে না—"বেটা যেন আমার কলেজ আউট বাবুদের গৌণ পরা মাগ।"

সাহেবদের শত অত্যাচার সহ্য করেও কর্মে পারদর্শীতার জন্য পেস্কারি থেকে দেওয়ান পদে উন্নীত হয়েছে। যে কোন হীন কাজে তার দক্ষতা সীমাহীন হলেও, নাট্যকার চরিত্রে সামান্য সমবেদনার স্থান রেখেছেন। নবীন উড সাহেবের কুঠিতে গিয়ে সাধুচরণকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে অপমানিত হন। গোপীনাথ এতে অস্বস্তি বোধ করে নবীনকে বাড়ী চলে যেতে অনুরোধ করে। গোলোক বসুর অস্বাভাবিক মৃত্যু, সাবিত্রীর দুর্দশা গোপীনাথকে ব্যথিত করে। সে অনুশোচনা করে বলেছে, 'মিথ্যা মোকদ্দমা করে মানী মানুষটারে নষ্ট করলাম।

দীনবন্ধু মিত্র গোপীনাথকে শুধু দুষ্কর্মের প্রতীক রূপে আঁকেন নি, তার একটি সহানুভুতিশীল ও সামান্য সদগুণের পরিচয়ও তুলে ধরেছেন।

রোগ-উড দুজনই নীলকর। একই কুঠির বড় ও ছোট সাহেব। উড নীলের মুনাফা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন—এ জন্য প্রজাপীড়ন, মিথ্যা মামলা, বিচারব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ প্রভৃতির মাধ্যমে কুঠির মুনাফার জন্য যে কোন ব্যবস্থা নিতে দ্বিধাহীন। তার নিজের ভাষায় "আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়েছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি জরু কয়েদ করিয়াছি"—কারণ এতে রায়তেরা সবচেয়ে বেশি জব্দ হয়। উডের মধ্যে কোন শালিনতাবোধ, মানবিকতাবোধ, ধর্মবোধ নেই। গোলোকের মৃত্যুর পর বসু পরিবারের অশৌচ অবস্থায় তাঁদের পুকুর পাড়ে নীলচাষের ব্যবস্থা করে। এ একমাত্র প্রতিহিংসা পরায়ণ মুনাফালোভী শ্বেতাঙ্গ-এর পক্ষেই সম্ভব। তোরাপের ভাষায়, "বেলাতের ছোটলোক।"

রোগ সাহেবও উডের মত অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক, মুনাফালোভী, স্বার্থপর, দুর্বিনীত নিম্নশ্রেণীর শেতাঙ্গ সমাজের উপযুক্ত—যে কোন সভ্য সমাজের কলঙ্ক স্বরুপ। পিপাসার্ত তোরাপ জল চাইলে বুটের গুঁতো দিয়ে বলেছে—"তোর মুখে পেসাব করে দেব।" তার অপর স্খলন স্ত্রীলোকের প্রতি তীব্র আসক্তি—সেখানে কোন বাছবিচার বা ধর্মবোধ নেই। অন্তঃসত্ত্বা ক্ষেত্রমণিকে বশে আনতে না পেরে তার পেটে লাথি মেরেছে। কুঠির লাঠিয়ালদের আঘাতে নবীন অচৈতন্য হয়ে পড়লে, রোগ তার ওপর তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে।

দীনবন্ধু হীন নীলকর চরিত্র অঙ্কনে এদিক থেকে সার্থক। এখানেও তার নির্লিপ্ত বস্তুনিষ্ঠা, সাধারণ মানুষের প্রতি একান্ত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

৮৩.৭ সারাংশ

দীনবন্ধুর নীল-দর্পণ নাটকের চরিত্র সৃষ্টির পেছনে নাট্যকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিদ্যমান। তিনি স্বশ্রেণীর চারিত্র্যধর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তার অসামান্য কৃতিত্ব সমাজের নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র চাষী ও তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অনুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা। নীলচাষীদের আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে নাটকটিতে সমান্তরালভাবে মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা যুক্ত হয়ে যাওয়ায় নাট্য ঘটনা বর্ণনায় অস্বাচ্ছন্দ অনুভব না করলেও, দুটি শ্রেণী চরিত্রের মধ্যে সম্যক সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি মধ্যবিত্ত থেকে অনেকাংশে বাস্তবসম্মত ও জীবন্ত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'জীবন্ত আদর্শ মামনে রেখে চিত্রকরের মত তিনি ছবি আঁকতেন। কিন্তু এ ছবি সেখানেই সার্থকতার রূপ পেয়েছে, যেখানে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত।' এ নাটকের দরিদ্র কৃষক ও নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র—তোরাপ, রাইচরণ-এর মত দৃঢ়চেতা কৃষক এবং আদুরীর মত দাসী, বাংলা সাহিত্যে বিরল।

তোরাপ সহায় সম্বলহীন দরিদ্র কৃষক হলেও, তার চারিত্রিক দৃঢ়তা যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে রুখে দাঁড়াতে পরোয়া করে না। সে সুনিশ্চিত বিপদ সত্ত্বেও কুঠিতে প্রবেশ করে ক্ষেত্রমনি ও নবীনমাধবকে উদ্ধার করে এনেছে। সে আদিম আইনে বিশ্বাসী—দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ—এটি সে একমাত্র বোঝে। কিন্তু এরও মধ্যে অন্তঃসলিলা প্রস্রবণের মত, তার হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যধর্ম বিরাজ করে—তারই বলে সে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, অকৃত্রিম প্রভুভক্তি ও একান্ত মানবিক প্রীতির পরিচয় নাটকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি লাভ করেছে। চরিত্র আলোচনায় এ সবই সম্যক ব্যাখ্যাত।

সাধুচরণ ও রাইচরণ-দু'ভাইয়ের মধ্যে রাইচরণই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধুচরণ অনেকটাই আদর্শায়িত—হিসাবী, সাবধানী, সহিষ্ণু ও আপোষপন্থী, তার সংলাপ নাট্যসৃষ্ট ভদ্র চরিত্রগুলির সংলাপের মত আড়ষ্ট ও কৃত্রিম। পক্ষান্তরে, রাইচরণ একজন খাঁটি চাষা—গোয়ার, বেপরোয়া ও চিন্তালেশহীন, পেটের জ্বালার কাছে তার বিষয়চিন্তা বড় হয়ে ওঠেনি।

আদুরী নাট্যকারের অনবদ্য সৃষ্টি। বসু পরিবারের দাসী হলেও, সর্বত্র সে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। নাটকের বিষাদঘন পরিবেশে সদা কৌতুকরস ধারার স্পর্শে সকলকে সঞ্জীবিত রেখেছে। তার রসাল ছড় ও সরস মন্তব্য স্ত্রীমহলকে হাসির ফোয়ারায় অবগাহন করিয়েছে। সব বিষয়েই তার নিজস্ব মত প্রকাশ করতে বিলম্ব করেনি। যেমন, নাড়ের বিয়ে দেয় যে সাগর, সে তার দলে নেই; দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়লে সে কখনোই সাহেবের কাছে যাবে না, কুঠির বিবির পরপুরুষের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া পছন্দ করে না—প্রভৃতি মন্তব্য অন্তঃপুরিকা মহলে তার গুরুত্ব বাড়াবার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রভু পরিবারের

সঙ্গে আদুরীর আন্তরিক সম্পর্ক, তাঁদের দুঃখ বেদনায়, একান্ত একাত্মতা বোধ তার চরিত্রকে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে।

দীনবন্ধু তাঁর সর্বব্যপী সহানভুতির গুণে গোপীনাথ পদীময়রাণীর চরিত্র তাঁর সমস্ত আন্তরিকতা নিয়ে এঁকেছেন। তাদের প্রতি নাট্যকার ঘৃণা প্রকাশ করেননি। গোপীনাথ নীলকর পদলেহী, লোভী, নীচ স্বার্থপর কর্মচারী বিশেষ। নাট্যকার তাঁর মধ্যেও একটি বেদনা করুণ সংবেদনশীল মনের পরিচয় তুলে ধরেছেন সদাময়রাণী নষ্ট চরিত্রা কুট্টিনী, অনেকের সর্বনাশ করলেও একেবারে যে হৃদয়হীন হয়ে পড়েনি, নাট্যকার তা দেখিয়েছেন। সকলের কাছ থেকে ঘৃণা ও পরিহাস কুড়িয়েও সে নিজের কলঙ্কিত মুখটি সমাজের দৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। নবীনমাধবকে দেখে সে বলেছে, 'ও মা, কি লজ্জা বড়বাবুকে মুখখানা দেখালাম।' পদী নিজের কাজ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন বলেই, নিজের প্রতি সে ধিক্কার দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। সে নিজে সাহেবের উপপত্নী হয়েও সাহেবের লালসা চরিতার্থের জন্য কচি কচি মেয়েদের ধরে এনে দেওয়া যে কত ঘৃণ্য তা সে অনুভব করে।

বসু পরিবারের মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলির মধ্যে নবীনমাধবই অপেক্ষাকৃত সক্রিয়, সে উৎপীড়নের প্রতিরোধ করতে গিয়ে সবংশে ধ্বংস হয়েছে। নীলকরের চক্রান্তে গোলোক বসু কারারুদ্ধ হন, সেখানে তিনি অপমানে আত্মহত্যা করেন। নীলকরদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে নবীন কুঠির লেঠেলদের লাঠির ঘায়ে চরম শারীরিক আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। স্বামী পুত্রকে হারিয়ে সাবিত্রী শোকোন্মত্ত হয়ে ছোট বৌ-এর গলা টিপে হত্যা করেন, পরে হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনায় মৃত্যুবরণ করেন।

৮৩.৮ নাটকের রস বিচার ঃ রস পরিণতি—ট্র্যাজেডি-মেলোড্রামা

নীল-দর্পণ নাটকের পরিণতি বিষাদান্তক হলেও নাট্যকার এটিকে যথার্থ অর্থে ট্র্যাজেডি নাটকের রুপ দিতে পারেন নি। নাটকে বেশ কয়েকটি মৃত্যু দৃশ্য আছে, এগুলি সাময়িক বেদনা সৃষ্টি করলেও করুণরস সঞ্চায়ক হয়নি। ট্রাজেডি করুণ রসাত্মক নাটক। এই নাটকে গোলোক বসুর উদ্বন্ধনে মৃত্যুসহ পরিবারের নানা বিপর্যয় চিত্র যা দৃশ্যমান হয়েছে, তার সবটাই প্রায় অন্ধ অমোঘ নিয়তি তাড়িত ঘটনা। এক্ষেত্রে নায়কের কোন প্রত্যক্ষ দোষ—তাঁর চরিত্রগত বিশেষ সীমাবদ্ধতা নাট্যকার তুলে ধরেননি। বস্তুতঃ এই নাটকে নবীনমাধব অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও, প্রকৃত নায়ক হয়ে ওঠেনি। তাই নায়ক চরিত্রের যে ছিদ্রপথ দিয়ে নায়কের তথা নাটকের ট্রাজেডি বা বিষাদান্তক পরিণতি ঘটে, তা বাস্তবে পরিস্ফুট হয়নি।

য়ুরোপীয় নাটকে ট্র্যাজেডি দুই রকম—(১) গ্রীক ট্র্যাজেডি ও (২) সেক্সপীরীয় বা রোমান্টিক ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডির উদ্ভব গ্রীসদেশে ডায়োনিসাস, দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য, সমবেত কণ্ঠে যে স্তোত্র আবৃত্তি করা হোত তা থেকে ট্র্যাজেডির উদ্ভব। এই ট্র্যাজেডিতে স্থান-কাল ও গঠনগত ঐক্য—এই তিনটির প্রাধান্য

ছিল। তিনজন গ্রীক নাট্যশিল্পী—ঈস্কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিদিস। পরবর্তীকালে অ্যারিস্তোতল, 'তাঁর পোয়েটিকস্' গ্রন্থে সবিস্তারে ট্র্যাজেডি বা বিষাদান্তক নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগে মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ, বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে চেতনা ও উচ্চ কাব্যরস সমৃদ্ধ প্রকাশভঙ্গী ট্র্যাজেডির ধারার পরিবর্তন ঘটায়। সেক্সপীয়র এই পরিবেশে আবির্ভূত হন। সেক্সপীয়রের নাটকের নায়ক-নায়িকাদের স্বকীয়তা আছে, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রতীক তাঁরা, শৌর্য-বীর্য সম্পন্ন হৃদয়বোধের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, চরিত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন আতিশয্য বা ত্রুটির জন্য, পরিণামে বিষাদান্তক পরিণতির শিকার হন। পক্ষান্তরে, গ্রীক নাটকের নায়কেরা অকারণে বা দৈববশে, আকস্মিক কোন ঘটনার আবর্তে অজ্ঞেয় অন্ধ-ক্রুর নিয়তির দ্বারা আক্রান্ত হন। নায়ক এখানে নিয়তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র, তাঁর পৌরুষ তাঁর শৌর্য-বীর্য এখানে সবই ব্যর্থ। কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকের নায়ক অসাধারণ বলবীর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রের রন্ধ্রপথে কতকগুলি দোষ-ত্রুটির প্রবেশ করে, যার ফলে সর্বনাশা বিষাদান্তক পরিণাম অনিবার্য হয়ে ওঠে। নায়ক নিজেই ফলতঃ তাঁর পরিণতির জন্য দায়ী হন।

'নীল-দর্পণে' ট্রাজেডির উপকরণ আছে। অসহায় প্রজাদের ওপর ইংরেজ নীলকরদের নির্মম অত্যাচার নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। বসু ও সাধুচরণ রাইচরণ পরিবারের বিপর্যয় নাটকের মূল বিষয়বস্তু। নীলকরদের চক্রান্ত ও মিথ্যা মামলায় গোলোক বসুর হাজত বাস ও উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা, উডের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নীলকরদের লাঠিয়ালদের আঘাতে নবীনমাধবের মাথায় আঘাত, রক্তক্ষরণ, মৃত্যু। স্বামীপুত্রের এই আকস্মিক মৃত্যুতে জননী সাবিত্রীর মানসিক ভারসাম্যের অভাব, পুত্রবধু সরলতাকে হত্যা, পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বকৃত কর্মের জন্য অনুশোচনা ও মৃত্যু। বসু পরিবারের এই শোকাবহ ঘটনার পাশাপাশি সাধুচরণের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণি রোগ সাহেব কর্তক ধর্ষিতা ও লাঞ্ছনার ফলস্বরুপ গর্ভপাত হেতু অকাল মৃত্যু—এই পাঁচটি মৃত্যুর ঘটনা নাটকটিকে গভীর কারুণ্যে ভারাক্রান্ত করলেও, যথার্থ ট্র্যাজেডি হতে পারেনি। কারণ মৃত্যু ট্র্যাজেডির শেষ কথা নয়, জীবনের সকল সম্ভাবনার শোকাবহ অপচয়ের কারুণ্য ট্র্যাজেডির উৎস।

নীল-দর্পণ নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র নবীনমাধবের মধ্যে ট্র্যাজেডির নায়কের যে অনমনীয় সংলাপ ও দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হয়, তার একান্ত অভাব আছে। তাঁর চরিত্রে নৈতিক ও অপরাপর গুণাবলী বিদ্যমান। তিনি প্রজাহিতৈষী, তাদের দুঃখ বেদনায় পাশে দাঁড়ান। নীলকরদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি চলে যেতে পারেননি, প্রজাদের কথা ভেবে। সাধু রাইচরণের ফসলের জমিতে উড দাগ দিয়ে দাদন নেবার জন্য বাধ্য করতে উদ্যত হলে, নবীন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সাধুর কন্যা ক্ষেত্রমণিকে তোরাপের সাহায্যে রোগ সাহেবের কুঠি থেকে উদ্ধার করেছে প্রভৃতি ঘটনা থেকে নবীনের মহানুভবতার, নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেলেও ট্র্যাজেডির নায়কের অনমনীয় সংকল্পদৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়নি। ফলে নাটকের অঙ্গীরস করুণ হলেও ট্র্যাজেডি হয়নি। পরিবর্তে নাটকের পাঁচ পাঁচটি অবাঞ্ছিত মৃত্যুদৃশ্য কার্যতঃ কোন কার্যকারণ সূত্রে বিধৃত নয়। পাঁচটি জীবনের অপচয় মর্মান্তিক হলেও,

তা নায়ক চরিত্রের কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা জনিত, কার্যকারণ সুত্রে আবদ্ধ ঘটনার পরিণতি নয়। তাই নীল-দর্পণ রোমক নাট্যকার সেনেকার নাটকের লোমহর্ষক বিভীষিকা (horror) ও অতি নাটকীয় ঘটনার বাহুল্যে মেলোড্রামা বা অতিনাটকীয় হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর সমারোহে করুণরসের আতিশয্য নাট্যকারের শিল্পবোধের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেছে। ফলে অতিনাটকীয় পরিণতি অনিবার্য হয়েছে। ট্র্যাজেডির সঙ্গে মেলোড্রামার পার্থক্য হোল "It tended to become increasingly more sensational" নাটকের শেষ দৃশ্যে অঙ্কিত চরিত্রগুলির আচরণ ও সংলাপ কারুণ্য সঞ্চারী হলেও অযথা অসংযত ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

৮৩.৯ নীলদর্পণ নাটকের সংলাপ ঃ আলোচনা ও বিশ্লেষণ

সংলাপ নাটকের প্রকাশ মাধ্যম, নাটকের প্রাণ। সংলাপ নাটকীয় চরিত্রগুলিকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে। বাস্তবানুগ সংলাপ জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টির যেমন সহায়ক তেমনি নাটকে গতিবেগ সঞ্চারের অনুকুল। সংলাপ আড়ষ্ট ও মন্থর হলে নাট্যরস সঞ্চারে বাধার সৃষ্টি হয়। সংলাপ আবেগ, জীবনের নানা ভাবমূর্তি প্রকাশে, চরিত্রানুগ সঙ্গতি রক্ষা করে রচিত হলে নাটক শিল্পসমৃদ্ধ হয়। সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম ভাষা। দীনবন্ধুর সময়েও গদ্য সুনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশক হয়ে ওঠেনি। তাই দীনবন্ধু নাট্যসংলাপ রচনায় কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এই দ্বিধার কারণেই তিনি সমাজের দুটি স্তরের মানুষের সংলাপ রচনায় দুটি ধারার প্রবর্তনা ঘটিয়েছেন। নাটকের উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলি, সামান্য আলোকপ্রাপ্ত বিধায় তাঁদের মুখে সমকালীন সন্ধি-সমাসবহুল সাধু গদ্য ভাষার প্রয়োগ করেছেন। আর দরিদ্র নিরক্ষর রায়তদের মুখে আঞ্চলিক দোষদুষ্ট অমার্জিত গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। বসু পরিবার এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে স্বল্প শিক্ষিত সাধুচরণ তৎকালে প্রচলিত সাহিত্যিক গদ্য রচনায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ঘেঁষা সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন, যা কোন অঞ্চলেরই সজীব মুখের ভাষা নয়। যেমন—

নবীন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবী। তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাতঃ। (১/৩)

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে। আমার কপালে এত যাতনা প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো.....। (৩/২)

সাধুচরণ। নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্বাপিত করিলেন। (৪/৩) বিকৃত মস্তিষ্ক সাবিত্রী পুত্রবধু সরলতাকে গলা টিপে হত্যা করার পর সরলতার স্বামী বিন্দুমাধব মাকে সম্বোধন করে বলেছে, "আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখ বিস্মারিকা ক্ষিপ্তপর অপগম হয়, তবে আপনিও সরলতা বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন।"(৫/৪)

এই কৃত্রিম সাধুভাষা ব্যবহারের ফলে, সাহিত্যের সত্যকে যথার্থভাবে প্রকাশ করা যায়নি। ফলে বসু পরিবারের মর্মান্তিক পরিণাম আমাদের মনকে কোনভাবেই প্রভাবিত করেনি।

অথচ ভদ্রেতর চরিত্রগুলির সংলাপ অনেকটা বাস্তবোচিত হওয়ায় চরিত্রগুলিও জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। তোরাপ, আদুরী, ক্ষেত্রমণি, রাইচরণ প্রভৃতির নাট্যসংলাপ অনেকটা বস্তুনিষ্ঠ ও সজীব। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় দীনবন্ধুর ভাষার বাস্তবধর্মের জন্য একটা আস্ত তোরাপ.....আদুরী ও ক্ষেত্রমণিকে পেয়েছি। দৃঢ়চেতা তোরাপ গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। এজন্য তাকে বেগুনবেড়ের কুঠিতে অন্যান্য রায়তদের সঙ্গে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উড সাহেবের শ্যামচাঁদের আঘাতে সকলেই জর্জরিত, কেউ বা সাহেবের 'প্যারেক মারা' জুতোর আঘাতে রক্তাক্ত। তোরাপ এ সব অভিজ্ঞতার কথা শুনে বলেছে, 'সমিন্দিরে অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এমনি বাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়য়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড করা হের ভেতর দে বার করি'। এই ভাষা রুচির দিক থেকে আপত্তিকর বোধ হলেও গ্রাম্য চাষার প্রাণের ভাষা। তোরাপ পল্লীবাংলার রায়ত সমাজের প্রতিনিধি।

আদুরী বর্ষীয়সী পরিচারিকা। তার স্থূল গ্রাম্য পরিহাস শালীনতার গণ্ডী মেনে চলে নি। একে রুচির দোহাই দিয়ে নিন্দা করলে, বাস্তবজীবন বোধের পরিচায়ক হোত না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "কাটা আদুরীকে' পেতাম। সৈরিন্ধ্রী রান্নাঘরের ডানদিকে গেলে, সে ভিন্নার্থে সেটিকে গ্রহণ করে বলেছে, 'মুই ভাল হতে গ্যালাম ক্যান। মোপার কপালের দোষ। ক্ষেত্রমণিকে ছোট সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাবার কথা শুনে আদুরী বলেছে, "থু, থু, থু, গোন্দো। প্যাজির গোন্দো। সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি। থু, থু,! আদূরীর এই ভাষা গ্রাম জীবন থেকে স্বতোৎসারিত নিখাদ জীবনবোধের নিবিড়তায় দর্শক, পাঠকের মনকে সহজেই স্পর্শ করেছে। 'নীল-দর্পণ নাটকে' দীনবন্ধু মিত্র ব্যবহৃত ভাষা কোন বিশেষ জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু তাঁর নাট্যসংলাপ নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ও স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করেছে।

৮৩.১০ সারাংশ

সেক্সপীয়রের নাটক থেকে বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডির ধারণা গড়ে উঠেছে। সেখানে জীবনের সুখ দুঃখ বেদনার নানা ঘাত প্রতিঘাত, নিয়তির বিরুদ্ধে পৌরুষের সংগ্রাম ও তার পরিণতি নাট্যকার যুক্তিযুক্তভাবে উপস্থিত করেন। এক্ষেত্রে দৈবের সঙ্গে পুরুষকারের সংগ্রাম প্রায়ই বিষাদান্ত পরিণতিতে শেষ হয়।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকে সেক্সপীয়রীয় রীতি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছেন। 'নীল-দর্পণ' করুণ রসাত্মক নাটক হলেও ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠেনি।

গ্রীক নাট্যাদর্শে নিয়তির অমোঘ শক্তি, মান্যতা পেয়েছে। দুর্ভাগ্য অকস্মাৎ এসে মানুষকে বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু সেক্সপীয়রীয় নাটকে ট্র্যাজেডির বীজ নায়ক চরিত্রে উপ্ত থাকে। বহুগুণের আধার হয়েও সামান্য ত্রুটির জন্য তার জীবনে বিপর্যয় ঘটে।

নীল-দর্পণে ট্র্যাজেডির উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যথার্থ ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠেনি। দুই প্রতিপক্ষ সমশক্তির অধিকারী নয়, বিষম এ সংগ্রামে দুর্বলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ফলতঃ এই নাটকের সংঘাত একান্তই অসম হওয়ায় পাঠকের মনে করুণার সঞ্চার হয়, গভীর উৎকণ্ঠা বা ভীতি-বিহ্বলতা সঞ্চার করে না। বরং পাঁচ পাঁচটি মৃত্যুর ঘনঘটা দর্শক পাঠককে বিমর্ষ ও কারুণ্যে ভারাক্রান্ত করলেও, মৃত্যুদৃশ্যের বাহুল্য বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি, ফলে ট্র্যাজেডি হয়নি। মৃত্যু দৃশ্যের আতিশয্য রোমাঞ্চকর পরিবেশ রচনা করেছে, ফলে নীল-দর্পণ অসংযত ঘটনা ভারাক্রান্ত হয়ে মেলোড্রামা বা অতিনাটকীয় হয়েছে।

'নীল-দর্পণ নাটকের' ভাষা স্পষ্টতঃ দুভাগে বিভক্ত। সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবার আর রায়ত এবং গ্রাম্য নিরক্ষর নারী সমাজের ভাষা সবদিক থেকে স্বতন্ত্র। মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলি মাটির সংস্পর্শহীন, সংস্কৃত প্রভাবিত কৃত্রিম সাধূভাষা ব্যবহার করায় তাদের সংলাপ হয়েছে নিষ্প্রাণ ও আড়ষ্ট। অপরদিকে তোরাপ, রাইচরণ, ক্ষেত্রমণি, আদুরী প্রভৃতির মুখে নাট্যকার যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা বাস্তবোচিত ও স্বভাবধর্মে জীবন্ত। ফলতঃ নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি প্রাণধর্মে সজীব ও স্বাভাবিক হয়েছে।

৮৩.১১ নীলদর্পণ নাটকের দোষগুণ বিচার

নীলদর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই নাটকের মাধ্যমে নীলকুঠির অত্যাচারী সাহেবদের শোষণ-পীড়নের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রচেষ্টা একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরি করেছিল। যশোর, খুলনা, নদীয়ার নীলচাষীদের সম্মিলিত প্রতিবাদ নীল কমিশনের মাধ্যমে নীলকরদের সংযত করতে প্রয়াস পেয়েছিল। সমাজকল্যাণ সাধনায় এই নীল-দর্পণ নাটকের সবিশেষ গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, নাটকটি দোষ-ত্রুটি মুক্ত নয়।

নীলকরদের অত্যাচার ও অন্যায় শোষণের স্বরূপ তুলে ধরবার জন্য নাট্যকার দুটি পরিবারের বিপর্যয়ের চিত্র আঁকতে গিয়ে নীলকর সাহেবদের অসংগত অর্থলোভের চিত্র নিপুনতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। গোলোক বসু ও সাধুচরণের পরিবারের প্রতি নীলকরদের অন্যায় নিপীড়নের বর্ণনা দিতে গিয়ে গোলোকের ধানজমি গ্রাস করা, পুকুরপাড়ের জমি নীলচাষের জন্য চিহ্নিতকরণ, সাধুচরণের সাঁপোলতলার জমিতে দাগ দেওয়া, প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। নীলদর্পণ নাটক এই দুই পরিবারের ওপর নিপীড়ন ও অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। কিন্তু দুটি কাহিনী সর্বতোভাবে একান্ত হয়ে ওঠেনি— স্বতন্ত্র রয়ে গেছে।

এই নাটকে সাধুচরণ পরিবারের সঙ্গে বসু পরিবারের মমতার সম্পর্ক থাকলেও, নাট্য কাহিনী দুইয়ের মধ্যে সংহতি সাধন করতে পারেনি। গোলোক বসু ও সাধুচরণের পারিবারিক কাহিনী নিজ নিজ গতিপথ অনুসরণ করে চলেছে! ক্ষেত্রমণির ওপর রোগ সাহেবের নিপীড়ন ও গর্ভপাতে তার মৃত্যু বসু পরিবারের কাহিনীর সঙ্গে অন্বিত হয়নি। এর ফলে নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে একাধিক উপকাহিনী যুক্ত হওয়ায় ঘটনায় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও, কোন রকম সংহতির পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাই বলা যায় নীল-

দর্পণের বর্হিঘটানাধীন, কেন্দ্রীয় চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় কাহিনী বিন্যাসে শিথিলতার পরিচয় আছে।

যে কোন শিল্পকর্ম সৃষ্টির পেছনে, স্রষ্টার একটি বক্তব্য প্রচ্ছন্ন থাকে। দীনবন্ধুর এই নাটক রচনার প্রধান প্রেরণা নীলকরদের অত্যাচারের রুপটি সবিস্তারে তুলে ধরা। প্রজাপুঞ্জের প্রতি তাঁর সর্বব্যাপিনী সহানুভুতি নীলকরদের অত্যাচার অনাচারের মাত্রাতিরিক্ত বর্ণনায়, শিল্পীসুলভ কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। সে সংযম, পরিমিতি বোধ ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকলে দৃশ্যমান জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উপাদানগুলি গ্রহণ- বর্জনের মধ্য দিয়ে আঁকা যা, দীনবন্ধুর সে শক্তি ছিল না। তিনি সংঘটিত ঘটনাবলীর বাস্তব চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাকে শিল্পসম্মত উপস্থাপনার দ্বারা রসসঞ্চার করতে পারেননি। তিনি বস্তুতঃ নাট্যক্রিয়া ও নাট্যরসের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে নীল-দর্পণ হয়েছে মুখ্যতঃ প্রচার ও উদ্দেশ্যমূলক রচনা। রসসমৃদ্ধ নাটক না হয়ে, হয়েছে কতকগুলি খণ্ডিত নাট্যচিত্রের সমাহার।

নীল-দর্পণের অপর ত্রুটি মধ্যবিত্ত ভূস্বামী শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণে ব্যর্থতা। দীনবন্ধুর মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম, লালন ও শিক্ষা। কর্মসুত্রেও তিনি মধ্যবিত্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তথাপি তাঁর আঁকা বসু পরিবারের চিত্র বাস্তবতার স্পর্শবর্জিত ও তাঁদের সংলাপ কৃত্রিম সাধুভাষা প্রভাবিত। পক্ষান্তরে, দরিদ্র রায়ত শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ দীনবন্ধুর, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল অসহায়, শোষিত মানুষগুলি তাঁর সহানুভূতি বেশি করে আকর্ষণ করেছে এবং এঁদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল ব্যাপক ও গভীর। কিন্তু সে তুলনায় প্রাগসর নবোদ্ভুত মধ্যবিত্ত সমাজ অসহায় ছিল না, দীনবন্ধুর সহানুভুতি তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, ফলে চরিত্র সৃষ্টিতেও সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়েছে।

দীনবন্ধু নাট্য সংলাপ রচনায় যে রীতিমত দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন, তা বোঝা যায় সমাজের দুটি শ্রেণীর সংলাপের ভাষা প্রয়োগ থেকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি কিছু উন্নত আদর্শ আরোপ করতে গিয়ে চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন। নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সাবিত্রী চরিত্রগুলি আদর্শায়িত হওয়ায় এরা বাস্তবজীবনের সংস্পর্শহীন আদর্শলোকে বিচরণ করেছে। ফলতঃ এঁদের মুখের ভাষা বাস্তববর্জিত কৃত্রিম সাহিত্যিক সাধু গদ্য ব্যবহারে ভারাক্রান্ত হয়েছে। নাটকে ব্যবহৃত ভাষা একদিকে যেমন ভাবপ্রকাশ করে, অপরদিকে নাটকের গতি সঞ্চারে সহায়তা করে। ভদ্র চরিত্রের ভাষায় প্রবাহমানতা না থাকায়, তা স্বাভাবিক হয়নি।

নীল-দর্পণ নাটকে ক্রোধান্ধ তোরাপ বা পরিহাসপ্রিয় আদুরী সরলতার সঙ্গে রঙ্গচ্ছলে যে ভাষা ব্যবহার করেছে, তা সর্বত্র শালীনতা রক্ষা করেনি, অনেক সময় কুরুচিপূর্ণ গ্রাম্যতায় আচ্ছন্ন। আধুনিক মার্জিত রুচিবোধের মাপকাঠিতে এগুলি অশ্রাব্য মনে হলেও, দীনবন্ধুর সমকালে রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের স্থূলরুচির যুগে, অনেকটা স্বাভাবিক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "আগেকার লোক

কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত, এমন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। তাই একালের পাঠকের কাছে নীল-দর্পণ নাটকের ভাষা স্বভাবতই স্থূলরুচির পরিচায়ক মনে হতে পারে।

৮৩.১২ নীলদর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পর্যালোচনা

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশে রঞ্জক দ্রব্য হিসাবে নীলচাষের প্রবর্তন হয়। নীলকুঠির ইংরেজ কুঠিয়ালরা মুনাফার লোভে প্রথমে চাষীদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে পরে ছলেবলে কৌশলে বা বলপ্রয়োগে নীল চাষে বাধ্য করত। মাত্রাতিরিক্ত অর্থসামর্থ্যে বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে পাইক বরকন্দাজ, লাঠিয়াল নিয়োগ করে কুঠিগুলিকে দুর্গে পরিণত করেছিল। দীনবন্ধুর ডাকবিভাগের পরিদর্শক হিসাবে বাংলাদেশের জেলাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। নীলচাষীদের সীমাহীন দুরবস্থা দেখে তিনি আন্তরিক বেদনা অনুভব করেন। ইতিমধ্যে দেশের সংবাদ-সাময়িক পত্রিকায় ইতঃস্তত প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এই প্রেক্ষাপটে রচিত। নীল-দর্পণ সমকালীন ঘটনাবলীর জীবন্ত চিত্র কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক নয়। ইতিহাসের কোন বিশেষ পাত্রপাত্রী এ নাটকের নায়ক বা নায়িকা নয়। কাহিনীর একটি বাস্তব ভিত্তি আছে, পূর্বাপর কাল্পনিক নয়। দীনবন্ধু সংবাদপত্রে প্রকাশিত নদীয়ার গুয়াতোলির মিত্র পরিবারের দুর্দশাকাহিনী অবলম্বনে তাঁর নাটক রচনা করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রজাকুলের অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়নের রূপটি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। এদিক থেকে নাটকটি সমকালীন সমাজজীবনের দলিলরূপে গৃহীত হতে পারে। একদা আমেরিকার কালা মানুষদের দাসত্বমোচনের অভিপ্রায়ে 'টমকাকার কুটি'র রচিত হয়েছিল, নীল-দর্পণ দাদন গ্রহণে অনিচ্ছুক মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র রায়তদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। 'নীল-দর্পণ' কুঠিয়ালদের অত্যাচারের স্বরূপ তুলে ধরে অত্যাচার পীড়িত বাঙালির সমাজজীবনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটক শান্তিপূর্ণ অথচ জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলবার প্রেরণা জুগিয়েছে। নীল-দর্পণ অভিনয়ের সাফল্যে দেশবাসী সকল ঘটনার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে সমগ্র দেশকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। রেভারেণ্ড লঙ্ প্রকাশিত নীল-দর্পণের ইংরেজি অনুবাদ, নীল আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরেছে। এখানেই নাট্যকার ও নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

৮৩.১৩ সারাংশ

নীল-দর্পণ নাটকে ইংরেজ কুঠিয়ালদের মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার ও অনাচারের পরিচয় দিতে নাট্যকার শিল্পীসুলভ উচ্চাঙ্গের কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। যা ঘটে, তাই সত্যি নয়। দৃশ্যমান জগতের অগণিত ঘটনা প্রবাহের মধ্য থেকে গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ায় জীবনসত্যকে প্রকাশ করতে হয়। দীনবন্ধু বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত ঘটনার চিত্র এঁকেছেন, তা যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করতে পারেনি। ফলে নীল-দর্পণ প্রচারধর্মী ও উদ্দেশ্যমূলক হয়েছে।

এই নাটকের কোন একটি চরিত্রকে নায়ক বলা যায় না। কোন একটি ব্যক্তি বা নায়কের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব মূল ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। নাটকীয় ঘটনা সংঘাতও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে 'নীল-দর্পণ' প্রয়োজনীয় সংহতি ও গাঢ়বন্ধরূপ পায়নি। কতকগুলি নাটকীয় খণ্ডচিত্রের সমাহারে পরিণত হয়েছে।

নীল-দর্পণ নাটকে মধ্যবিত্ত বসু পরিবারের চরিত্রচিত্রন ও তাদের মুখের ভাষা ব্যবহারে স্বাভাবিকতা রক্ষা করতে পারেননি। অঙ্কিত চরিত্রগুলি এরফলে নিষ্প্রাণ ও অস্বাভাবিক হয়েছে। প্লট গঠনের ক্ষেত্রেও ঘটনা পরম্পরা সর্বত্র কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ হয়নি। নীল-দর্পণে বর্ণিত নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, অবিচার, শোষণ-বঞ্চনা সর্বদেশের ও সর্বকালের ঘটনা। দীনবন্ধু এই ঘটনা পরম্পরাকে সার্থক ট্র্যাজেডির রূপ দিতে পারেন নি। নাটকীয় ঘটনাকে কার্যকারণ সূত্রে বিষাদান্ত পরিণতি অনিবার্য করে তোলে, দীনবন্ধু, তা সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরতে পারেননি। নাটকে পাঁচটি মৃত্যু কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত হয়নি। ফলে নীল-দর্পণের ট্র্যাজেডির উপাদান থাকলেও বাস্তবে অতিনাটকীয় (মেলোড্রামা) হয়েছে।

তথাপি, নীল-দর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে। নীলকরদের স্বেচ্ছাচারিতা, অসংযত আচরণ, দীনবন্ধুর নীল-দর্পণ নাটক রচনা ও মধুসূদনকৃত অনুবাদ, প্রকাশক হিসেবে পাত্রী লঙ্ সাহেবের অনমনীয় দৃঢ়তায় বহুল প্রচারের সুযোগ পেয়েছিল। এরফলে নীলকরদের আচরণ অনেকটা সংযত হয়েছিল। এই নাটকের মাধ্যমে শোষণ নির্যাতনক্লিষ্ট বাঙালী মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায় প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে কোথাও কোথাও সংঘবদ্ধভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সমকালীন লেখকদের মধ্যে একমাত্র দীনবন্ধুই এই যুগান্তকারী ঘটনার অবতারণা করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৮৩.১৪ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তরশেষে ১১১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১) নীচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন ঃ

কবুল, কসম, কসুর, কুড়ো, গস্তানি, গিধ্ধড়, চাবালি, ঝরকা, টিকিরি, ডর্‌কা, তেরোনাল, নোনাফেনা, পয়জার।

২) "আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই, ব্রাহ্ম সমাজ নাই," —বক্তা কে? কি প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন?

৩) "দাদন গাদালিই তো হয় না, চসা চাই।" —বক্তা কে? কাকে বলেছেন? প্রসঙ্গটি কি?

৪) "আহা জমি তো না, য্যান সোনার চাঁপা"। —কে, কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলেছে?

৫) "সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা!" বক্তার নাম উল্লেখ করে মন্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৬) "আমরা হুজুর, কসায়ের কুকুর,—নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি।" বক্তা কে কাকে বলেছেন? মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৭) "নীল-দর্পণ বিষাদান্তক নাটক।" আলোচনা করুন।

৮) "নীল-দর্পণ" নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৯) নীলদর্পণ নাটকের দোষ-গুণ বিচার

১০) নীল-দর্পণের নাট্য সংলাপ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮৩.১৫ উত্তর সংকেত

১) স্বীকার, সম্মত; দিব্যি, শপথ; দোষ; অপরাধ; বিঘা, জমির মাপ; কুলটা, দুশ্চরিত্রা; শকুন, শেয়াল চোয়াল; জানালা; ঠিকা মজুর; উঠতি বয়সের (ছেলে বা মেয়ে); তরোয়াল; অনুর্বর, চটি জুতা বা জুতা।

২) বিরহকাতর সরলতা, বিন্দুমাধবের প্রতীক্ষায় ছিল। শহরে জরুরী কাজের জন্য সে আসতে পারবে না। সরলতা এই পরিস্থিতিতে তাঁর হৃদয় বেদনার কথা প্রকাশ করতে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায় তাঁরা একান্তই অন্তঃপুরিকা, বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত, ফলে মনের ভাব কমাবার ন্যুনতম আয়োজনও তাঁদের নেই।

৩) ৩য় অঙ্ক ৩য় দৃশ্যে তোরাপ নবীনবসুর সঙ্গে রোগ সাহেবের কামরায় জানলার খড়খড়ি ভেঙে প্রবেশ করে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করতে যায়। সেখানে রোগ সাহেব তাদের দেখে স্তম্ভিত। তোরাপ রোগের গলা ও গাল টিপে ধরে, কাল মলে ওহাঁটু দিয়ে গুঁতো দেয়। পরিশেষে রোগ সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দেয় নীলবোনার জন্য বলপূর্বক দাদন দিলেই হয় না, চাষীর চাষ করবার ক্ষমতা আছে কিনা সেটাও দেখা দরকার।

৪) ১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্কে রাইচরণ, তাদের সোনার চাপা সদৃশ্য চাষের জমিতে নীলবোনার জন্য চিহ্নিত করায় ক্ষুব্ধ হয়ে এ মন্তব্য করেছে।

৫) ১ম অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্কে আদুরীর মন্তব্য। মূল প্রসঙ্গ হোল সৈরিন্ধ্রী ছোট বৌ সরলতাকে বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়ে শোনাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। আদুরী বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ উত্থাপনেই, তাঁর বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ স্মরণে, তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।

৬) ৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কে গোপীনাথ দেওয়ান উড সাহেবের উদ্দেশ্যে বলেছে। সাহেবের উচ্ছিষ্টে তাদের জীবন যাপন। সাধারণ জমিদারের মত প্রজার কাছ থেকে প্রাপ্য খাজনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে, আমীন খালসার প্রয়োজন হোত না। নীলকুঠিরও দুর্নাম হোত না। তাদের নানারকম হেনস্তা হতে হোত না।

৭) ৩.৮ অংশের আলোচনা অনুসরণে উত্তর তৈরী করুন।

৮) ৩.১২ অংশের আলোচনা ভালো করে পড়ে উত্তর তৈরী করুন।

৯) ৩.১১ অংশের আলোচনা পড়ে উত্তর করুন।

১০) ৩.৯ অংশের সংলাপ আলোচনা ও বিশ্লেষণ অবলম্বনে উত্তর তৈরী করুন।

৮৩.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) ড. **আশুতোষ ভট্টাচার্য**—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস।

২) ড. **অজিত কুমার ঘোষ**—বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৩) ড. **সুশীল কুমার দে**— দীনবন্ধু মিত্র।

৪) ড. **মিহির কুমার দাস**—দীনবন্ধু ঃ কবি ও নাট্যকার।

ই. বি. জি — ৬
বাংলা বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
২৩ (ক) এবং ২৩ (খ)

একক ৮৪ ❐ নাটক ঃ রবীন্দ্রনাথ

গঠন

৮৪.১ উদ্দেশ্য

৮৪.২ প্রস্তাবনা

৮৪.৩ মূলপাঠ ১ ঃ রবীন্দ্রনাটকের সূচনা ঃ রুদ্রচণ্ড থেকে প্রায়শ্চিত্ত

৮৪.৪ সারাংশ

৮৪.৫ অনুশীলনী ১

৮৪.৬ মূলপাঠ ২ ঃ রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের বৈচিত্র্য ঃ নাট্যকাব্য কৌতুকনাট্য, রূপকনাট্য ও নৃত্যনাট্য

৮৪.৭ সারাংশ

৮৪.৮ অনুশীলনী ২

৮৪.৯ উত্তর-সংকেত

৮৪.১০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

৮৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে আপনি রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটকের পূর্বে রচিত নাটকসমূহের একটি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে জানবেন। সেইসঙ্গে জানতে পারবেন রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যায়ে যে রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি রচনা করেছেন, তার রূপগত ও স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য। এইসব জানার সূত্রে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, কোন্ কোন্ প্রেক্ষাপটে কি ধরনের উপস্থাপনা রীতি এবং কি উপাদানে রবীন্দ্রনাথ 'রথের রশি' ক্ষুদ্র নাটকটি রচনা করেছেন। এককটি পাঠের মূল লক্ষ্য হল—

- রথের রশি রচনার প্রেক্ষাপট জানা ;
- নাটকটির উপস্থাপনা রীতির অভিনবত্ব উপলব্ধি করা।
- এছাড়াও রূপক ও সাংকেতিক নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে ও বুঝতে পারবেন।

৮৪.২ প্রস্তাবনা

বাঙালির নিজস্ব লোকপ্রিয় অভিনয়-কলা যাত্রা ক্রমশ মঞ্চাভিনয়ের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় যাত্রার গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। আবার কোলকাতার নাগরিক জীবনে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে ইংরেজি নাটকের অভিনয় আধুনিক বাঙালিকে আকৃষ্ট করে। শহর কোলকাতায় মঞ্চাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ ভাবনা মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনকে প্রভাবিত করায় বাঙালি ক্রমশ ইংরেজি নাটক ও নাট্য সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এরই সূত্র ধরে পূর্ববর্তী পর্যায়ে 'নীলদর্পণ' নাটকটি রচিত হয়েছিল। সে সম্পর্কে আপনারা বিস্তৃতভাবে জেনেছেন।

বর্তমান এককে রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গে আলোচনায় দীনবন্ধু উত্তরকালে যে নাট্যকাররা বিচিত্র ধারায় তাঁদের নাট্য সাধনাকে বিস্তৃত করেছিলেন তার সাধারণ ধারণা নেওয়া একান্ত বাহুল্য হবেনা। ঈশ্বর গুপ্তের ভাবশিষ্য মনোমোহন বসু পুরনো যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে আধুনিক নাট্যরীতির মিশ্রণে গীতাভিনয় রচনা করেছিলেন। করুণরস, ভক্তিরস ও কিঞ্চিৎ হাস্যরস পরিবেশিত হওয়ায় তাঁর রচনা সাধারণ বাঙালির কাছে কিছুটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। অভিনেতা, অভিনয় শিক্ষা, নটগুরু, নাট্য পরিচালক ও স্থায়ী রঙ্গামঞ্চের পোকা। তিনি বাংলা রঙ্গামঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। আগমনী (১৮৭৭), অকালবোধন (১৮৭৭), প্রভৃতি গীতিনাট্য নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হন গিরিশচন্দ্র। ভাবালুতা, ভক্তিবাদ, কারুণ্য সঞ্চারের মাধ্যমে সাধারণ পাঠক দর্শকের দ্বারা অভিনন্দিত হলেও তাঁর নাটক উচ্চস্তরের নাট্য প্রতিভার পরিচায়ক ছিলনা। তবে তাঁর রচনার অকৃত্রিম সারল্য, চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপ রচনায় সহজ স্বাচ্ছন্দ্যতার পরিচয় আছে। তিনি কতকগুলি সামাজিক, পৌরাণিক ও ভক্তিরসাত্মক নাটকের পাশাপাশি দেশপ্রেমমূলক কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে যুগের দাবি মিটিয়েছিলেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল প্রফুল্ল, বলিদান, জনা, চৈতন্যলীলা, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম। দর্শকচিত্ত বিনোদনের জন্য তিনি রঙ্গাব্যঙ্গামূলক কতকগুলি নাটিকা রচনা করেছিলেন। তাঁর 'আবুহোসেন' গীতিনাট্যটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

নট, নাট্যকার, পরিচালক অমৃতলাল বসু উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের গোড়ায় সুদক্ষ অভিনেতা এবং সামাজিক নাটক ও রঙ্গানাট্য রচিয়তা হিসাবে সবিশেষ খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর বিবাহবিভ্রাট (১৮৮৫), খাসদখল (১৩১২), ব্যাপিকাবিদায়, তিলাঞ্জলি আজও জনপ্রিয়তা হারায়নি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, পূর্বসুরীদের মত ঐতিহাসিক পৌরাণিক নাটক ও গীতিনাট্য রচনা করে যেমন খ্যাত হয়েছেন, তেমনি পাশাপাশি নৃত্যগীত সমন্বিত, রোমান্টিক কল্পনামধুর নাটক রচনাতেও সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা (১৮৯৭) গান ও সংলাপের সুষ্ঠু মিশ্রণে একটি সফল গীতিনাট্যের মর্যাদা দাবি করতে পারে। 'কিন্নরী' নৃত্য ও নাট্যের সমন্বয়ে মঞ্চে অসামান্য চমক সৃষ্টি করেছিল।

বাংলা নাটক ও মঞ্চের এই প্রেক্ষিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ নাট্যাভিনয় ও নাট্য সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করেছিলেন।

৮৪.৩ মূলপাঠ ১ ঃ রবীন্দ্রনাটকের সূচনা ঃ রুদ্রচণ্ড থেকে প্রায়শ্চিত্ত

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর পারিবারিক নাট্যাভিনয়ের আবহাওয়ায় বড়ো হয়েছেন। এ বাড়িতে এক সময় গীতিপ্রধান যাত্রাভিনয় যেমন হয়েছে, পাশাপাশি বিদেশি রীতিতে একাধিক নাটকের অভিনয়ও হয়েছে। জোড়াসাঁকোর এই পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর বাল্যস্মৃতির বিষয় হলেও রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংস্কার গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক নাট্য প্রয়াসে কাব্যধর্ম-নাট্যধর্ম-গীতিধর্ম মিলে মিশে অনেকটা একাকার হয়ে গেছে। 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) তাঁর প্রথম রচিত গীতিনাট্য—প্রকৃতপক্ষে চৌদ্দটি দৃশ্যে বিভক্ত একটি ক্ষুদ্র কাব্য বিশেষ। নাটকটির বিশেষত্ব হল এর কথোপকথন আদ্যোপান্ত অমিত্র পয়ার

ছন্দে রচিত। এর বিষয় কাব্যের উপাদানে রচিত বাহ্যতঃ নাট্য লক্ষণাক্রান্ত। ইতোপূর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি আখ্যানমূলক গাথা রচনা করেছিলেন। 'রুদ্রচণ্ড' অপরিণত নাট্যিক গঠন কৌশল আশ্রিত অনেকটা আখ্যায়িকামূলক রচনা। নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও এটি রবীন্দ্রনাথের নাট্য আঙ্গিক আশ্রয়ী প্রথম রচনা। কাহিনীমূলক এই রচনা বর্ণনাপ্রধান, বিষয়বস্তু অতিনাট্যিক।

'রুদ্রচণ্ড' কাব্যনাট্য প্রকাশকালেই রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) গীতিনাট্যটি রচনা করেন। ঠাকুরবাড়িতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা' উপলক্ষ্যে বাল্মীকি প্রতিভা রচনার সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলেত প্রবাসে বিদেশি গানের সুরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দেশে ফিরে দেশীয় সুরচর্চার পাশাপাশি বিদেশি সুরের চর্চাও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে ; ইহা সুরের নাটিকা।' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮১। এই অভিনয় সেকালের বিদ্বজ্জন কর্তৃক ও পত্রপত্রিকায় অভিনন্দিত হয়েছিল। 'কালমৃগয়া' (১৮৮২) তাঁর দ্বিতীয় নাটক। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) নাটকের ঘটনা সংস্থান দুর্বল ও কিছুটা অসংলগ্ন। মায়ার বন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্ব মানবিক কিন্তু এর রূপায়ণ অনেকটা আখ্যানধর্মী হয়েছে। 'নলিনী' (১৮৮৪) দুর্বল চরনা। কবি কর্তৃক পরবর্তীকালে উপেক্ষিত। 'মায়ার খেলা'তে (১৮৮৮) 'নাট্য মুখ্য নহে, গীতিই মুখ্য'। সংগীতের উচ্ছ্বলিত আবেগ মনকে আবিষ্ট করায় ঘটনার গতির প্রতি কোন আকর্ষণ থাকেনি। নাটক শেষে সংগীতের সুর মনকে অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে। রবীন্দ্র গীতিনাট্যের মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় রচনা ও প্রয়োজনা। যদিও 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও মায়ার খেলা'র প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রথমটি গানের সূত্রে নাট্যের মালা, অপরটি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। এদের মঞ্চসাফল্য রবীন্দ্র নাট্যপ্রয়োজনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃত।

রবীন্দ্রনাটকে প্রথম পর্বের রচনা সঙ্গীত আশ্রয়ী। নাটকের ভাববস্তু, রসসম্পদের ওপর গানের প্রভাব প্রবল। পরবর্তী পর্যায়ে নাটকে প্রচলিত আঙ্গিক অনুসরণ করে সৃষ্ট চরিত্রগুলির মানস দ্বন্দ্বের রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রথাগত নাট্যরীতি অনুসরণে 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) প্রথম পূর্ণাবয়ব পঞ্চাঙ্ক নাটক। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সংকল্পে কঠোর দুটি নর ও নারীর প্রণয়ের অতৃপ্তি ও আদর্শের পার্থক্য নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টির কারণ হয়েছে। নায়ক বিক্রম প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। সুমিত্রার মৃত্যুতে প্রচণ্ড আসক্তির অবসানে বিক্রমের সত্য উপলব্ধি। 'রাজা ও রানী'তে কুমার ইলা-র সূত্র ধরে অনুপ্রবিষ্ট 'লিরিকের প্লাবন' থেকে মুক্তি পাওয়ার তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯-এ মহুয়া কাব্য পর্বে 'তপতী' নাটকটি রচনা করেন। তপতীর মূল উপাদান 'রাজা ও রানী'র কাহিনীর পরিবর্তিত রূপ হলেও এটিকে স্বতন্ত্র নাটক হিসেবে গণ্য করা উচিত। 'রাজা ও রাণী' নাটকে রাজা চরিত্রে দুর্বার অন্তঃপ্রকৃতির দুষ্প্রতিরোধ্য তাড়না তাঁর নিদারুণ ট্রাজিক পরিণতিকে নিয়ে এসেছে। ফলে তাঁর অন্তরে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, তা যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তিনিও তা থেকে মুক্তি পাননি। ইলার ত্যাগনিষ্ঠ পুণ্য জ্যোতিতে তিনি অবশেষে ক্ষমা ও করুণায় সিক্ত হয়েছেন। 'তপতী' নাটকে অতিরিক্ত ভাবাবেগকে সংযত এবং কুমার ইলা-র প্রসঙ্গ বর্জন করা হয়েছে। এ নাটকে রানী সুমিত্রার দিব্যরূপকে প্রাধান্য দেওয়ায় নাট্যরসের হানি ঘটেছে। 'রাজা ও রানী'র পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন' (১৮৮০)-এ নাটকীয় সংঘাত পৌর্বাপর্ব রক্ষা করে শেষ পরিণতিকে বাস্তবায়িত করেছে। রাজা এখানে ন্যায় ও আদর্শের প্রতীক। রাজপুরোহিত প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় বিরোধী—তাঁর অধিকারের ক্ষেত্র মন্দিরে। রাজাদেশ মানতে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি

শাস্ত্রাচার ও সংস্কারের মূর্তিমান প্রতীক। রাজ্যে রাজাদেশ প্রাধান্য পেলেও মন্দিরে পুরোহিতের মতই প্রধান বলে তিনি মনে করেন। ফলত দুই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরিণতিতে একটি নিরীহ প্রাণের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে নাটকের সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে।

ইউরোপীয় নাট্যাদর্শ অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ যে নাটকগুলি রচনা করেছেন 'মালিনী' (১৯৯৬) এই পর্বে তার শেষ নিদর্শন। কবি রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ধর্ম, কল্যাণধর্ম তথা মানবধর্মে বিশ্বাসী। তিনি কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তিলাভ করা যায়, বিশ্বাস করতেন না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে সর্বভূতে করুণা ও মৈত্রীর বিস্তার করে অন্তরের বাসনাকে ক্ষয় করতে পারলেই মুক্তি সম্ভব। সকল আনুষ্ঠানিক, সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতার সঙ্গো সত্য উপলব্ধিজাত মানবধর্মের সংঘাত 'মালিনী' নাটকের দ্বন্দ্বকেন্দ্রে অবস্থিত। 'মালিনী' নাটকে মালিনী প্রেমের অলৌকিক মহিমা অন্তরে অনুভব করে প্রিয়জনের চিত্তকেও প্রেমের স্বর্গীয় প্রভায় উদ্দীপিত করেছিলেন। একেই রবীন্দ্রনাথ উক্ত—নবধর্ম—শাশ্বত মানবধর্ম বলা যায়। মালিনী নাটকে এটি মূল প্রতিপাদ্য। নাট্যশিল্পের দিক থেকে মালিনীর নাটকীয় মুহূর্ত রচনা 'রাজা ও রানী' ও বিসর্জন' থেকে অনেকাংশে সংহত। 'মালিনী' বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত 'মহাবস্তু অবদান' গ্রন্থের 'মালিন্যাবস্তু' থেকে গৃহীত হলেও বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় 'বিসর্জন' নাটকের সঙ্গো অনেকটা সঙ্গাতিপূর্ণ। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ সম্বন্ধে অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রচলিত নাট্য গঠনরীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে শুধু চারটি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। পরবর্তী নাট্য রচনায় এর ব্যাপক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বক্তব্য ও উপস্থাপনায় কতকগুলি মৌলিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও 'মালিনী' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। 'মালিনী' নাটকটি খুব ভাল। এর চরিত্রগুলোর ডেভেলপমেন্ট বেশ ন্যাচারাল।'—এ রকমের প্রশস্তি জানিয়েও তিনি ‍ ার 'মালিনী' মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেননি। 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মুকুট' গল্পের নাট্যরূপ 'মুকুট' (১৯০৮) আর 'বৌঠাকুরানির হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আশ্রমিকদের অভিনয়ের জন্য রচিত হয়। প্রায়শ্চিত্তে ঘটনার বহির্বিপ্লব ও শক্তি সংঘাতের থেকে পারিবারিক অন্তর্বিপ্লব প্রাধান্য পেয়েছে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর মাধ্যমে গানে-কথায় অহিংস অসহযোগের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে নাটকে। এর পরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত প্রথা পরিহার করে তাঁর নাটকের গতিপথ পরিবর্তন করে নতুন নাট্যরীতি অবলম্বন করেছেন।

আলোচনার উপসংহারে লক্ষণীয় বিষয় হল রবীন্দ্র নাটকের সূচনা হয় গীতিপ্রবণতা দিয়ে। এবং তার পরে প্রচলিত ইউরোপীয় নাট্যাদর্শ অনুসরণে কাব্যনাট্য রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ সেখানেও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেননি। তাঁর নাট্য পরিক্রমা এক একটি পর্ব থেকে পর্বান্তরে অভিযান করেছে।

৮৪.৪ সারাংশ

উনিশ শতকের বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রচলিত ধারা থেকে রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্য অনেকটাই স্বতন্ত্র। বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ওপরে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবও কম। তিনি নাটককে জনমনোরঞ্জনের স্তর থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যস্তরে উন্নীত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের নাটক সুর-সংগীত নির্ভর গীতিনাট্য 'রুদ্রচণ্ড', 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রভৃতিতে তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব ছিলনা। পরবর্তী রচনা 'রাজা ও রানী', বিসর্জন', 'মালিনী' প্রভৃতি

অনেকাংশে নাট্যগুণে সমৃদ্ধ। এই শ্রেণির নাটকে কবিতার আবেগোচ্ছ্বাস এবং নাটকের দ্বন্দ্ব সমন্বিত হয়। কাব্য আঙ্গিকে দ্বন্দ্ব সমৃদ্ধ ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে নাট্যরস সঞ্চার এর অভীষ্ট। এই শ্রেণির নাটকের সংখ্যা খুবই সীমিত হলেও রবীন্দ্রনাথ নাট্য-কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে একটি বিশেষ জীবনাদর্শকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' তার উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি নাটকের প্রচলিত শিল্পরূপে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি বলেই এক রূপ থেকে অন্য রূপে, এক আঙ্গিক থেকে অন্যতর, ভিন্নতর আঙ্গিকে নাট্যরচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি 'গীতিনাট্য' দিয়ে শুরু করলেও অনতিবিলম্বে প্রচলিত ধারায় একাধিক 'কাব্যনাট্য' রচনা করেছেন।

৮৪.৫ অনুশীলনী ১

১। **সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ**

(ক) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের নাম —রুদ্রচণ্ড/অশ্রুমতী/সরোজিনী।

(খ) রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম নাটক—মায়ার খেলা/রুদ্রচণ্ড/প্রকৃতির প্রতিশোধ।

(গ) বাল্মীকি প্রতিভা—গীতিনাট্য/কাব্যনাট্য/নৃত্যনাট্য

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'র প্রকতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রথমটি —— সূত্রে —— মানা, অপরটি —— সূত্রে —— মানা।

(খ) রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনা —— আশ্রয়ী। নাটকের —— , —— ওপর —— প্রভাব প্রাচুর্য।

(গ) কবি রবীন্দ্রনাথ ——, —— তথা —— বিশ্বাসী।

৩। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। সংক্ষেপে আলোচনা করুন ঃ

(ক) বাল্মীকি প্রতিভা, মায়ার খেলা।

(খ) রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী দুটি গীতিনাট্যের পরিচয় দিন।

৫। বাংলা নাটকে অমৃতলাল বসুর অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬। রবীন্দ্রনাথের দুটি পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজিডি নাটকের পরিচয় দিন।

৮৪.৬ মূলপাঠ ২ ঃ রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের বৈচিত্র্য ঃ নাট্যকাব্য, কৌতুকনাট্য, রূপকনাট্য ও নৃত্যনাট্য

এ পর্বে রবীন্দ্র নাট্যধারায় অভাবনীয় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কবিতা তাঁর জীবনে, মননে, স্বপ্নে, কল্পনায়, ফলে, কাব্যেই তিনি স্বচ্ছন্দ। তাঁর নাট্যরচনাতেও তাই বার বার কাব্য উঁকি দিয়েছে। এবার দেখা গেল নাটকের আঙ্গিক অনুসরণে তিনি প্রাণধর্মে কিছু কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। নাট্যকাব্য

আপাতদৃষ্টে নাটক মনে হলেও বাস্তবে কাব্যগুণান্বিত। বিদায় অভিশাপ (১৮৯২) এবং কাহিনী (১৯০০) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত গান্ধারীর আবেদন (১৮৯৭), সতী (১৮৯৭), নরকবাস (১৮৯৭), লক্ষ্মীর পরীক্ষা (১৮৯৭), কর্ণ-কুন্তী সংবাদ (১৯০০) এই শ্রেণিভুক্ত। এগুলি প্রধানত মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও সৃষ্ট চরিত্রগুলি মনুষ্য মহিমার দিক থেকে অত্যুজ্জ্বল শুধু নয়, একটি বিশেষ ভাবাদর্শ তুলে ধরেছে। এর কোনো কোনো চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ নতুনতর ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন, ফলে কাব্যগুলি তার মৌল বৈশিষ্ট্য না হারিয়েও হয়ে উঠেছে অভিনব নির্মাণ। এখানে অন্তর্দ্বন্দ্বদীর্ণ ধৃতরাষ্ট্র সু-অঙ্কিত, আদর্শবাদী গান্ধারী দুঃখের আগুনে পুড়ে স্বর্ণাভ, নিয়তি লাঞ্ছিত কর্ণের জন্য হাহাকার বিশ্বকেও ছাড়িয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাটক আছে, যেগুলিকে প্রচলিত অর্থে প্রহসন বলা যায়না। এরা অনেকটা ভিন্ন স্বাদের রচনা, মানস প্রকৃতিতেও ভিন্নতর। ইতোপূর্বে বাংলায় কিছু রঙ্গ ব্যঙ্গামূলক রচনা লেখা ও অভিনীত হয়েছে, যার মধ্যে স্থূলতা লক্ষ্য করা গেছে। লঘু হাস্য পরিহাস, ভাঁড়ামি, কোনো ব্যক্তি চরিত্রকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অশালীন অমার্জিত সংলাপ পরিবেশিত হয়েছে। আর কিছু প্রহসন রচিত হয়েছে, যার আশ্রয় সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক কিছু প্রসঙ্গ স্থূল হাস্য ও ব্যঙ্গ যার অবলম্বন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাট্যগুলিতে স্থিত হাস্য, ব্যঙ্গের ঈষৎ পরিচয় থাকলেও এতে কোনো রকম তীব্র তীক্ষ্ণ আক্রমণ নেই। ব্যক্তি চরিত্রের কিছু দুর্বলতা বা আতিশয্য এই রচনাগুলিতে তুলে ধরা হলেও একটি ভদ্র, সুমার্জিত রুচি ও সৌজন্যের মাত্রা কোথাও অতিক্রম করেনি। এই শ্রেণির নাটকগুলিতে তিনি উইট নির্ভর কৌতুক রসাত্মক সংলাপ রচনা ও কৌতুকজনক পরিস্থিতির ওপর জোর দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল—গোড়ায় গলদ (১৮৯২) এবং এর পরিমার্জিত রূপ শেষ রক্ষা (১৮৯৮), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), রঙ্গাত্মক নাটিকার সংকলন হাস্য কৌতুক (১৯০৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭), চিরকুমার সভা (১৯২৬)।

নৃত্যনাট্য ঃ 'সুরে নাটিকা' নয়—সেখান থেকে দীর্ঘপথ পরিক্রমার শেষে গানের সুর ও নৃত্যের ভঙ্গির অন্যোন্যতায় সমগ্র নাটক বিধৃত হয়ে নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে প্রতিভাত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাট্য ও মঞ্চপ্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে কতিপয় নাট্যকাব্য ও গীতিনাট্যকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। নাটকগুলি যথাক্রমে নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গাদা (১৯২৬), নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গাদা (১৯০৬), গীতিনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৩), নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৮) এবং শ্যামা (১৯৩৯)। এ ক্ষেত্রে কবি সম্ভবত নৃত্যের মাধ্যমে নাটকের একটি দৃশ্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। নাটকের ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য ভারতীয় নৃত্যকলার সাহায্য নেওয়া ঘটনার দিক থেকে বিরল দৃষ্ট। এই নাটক উপস্থাপনায় যে বিশেষ দৃশ্যপট, আলো ও নৃত্যনৈপুণ্য প্রয়োজন, তারই ওপর নাটকীয় বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন ঘটে থাকে। তবে রবীন্দ্র প্রতিভার বহুমুখী প্রকাশের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে একে গ্রহণ করা যায়। নৃত্যনাট্য বাংলা নাটকের প্রচলিত ধারায়, এ ধরনের প্রয়োগ বৈচিত্র্য নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরজা খুলে দিয়েছে।

বিশ শতকের প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব নাট্যরীতির সূচনা করেন। রূপক সংকেত আশ্রয়ী এই নাটকগুলি তাঁর নাট্যপ্রতিভার খ্যাতি দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে রূপক নাটক

আছে। রূপকে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সাংকেতিক নাটকে অরূপ রহস্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। ইয়েটস্ অনুসরণে ডঃ অজিত ঘোষ সাংকেতিক ও রূপকের ব্যাখ্যা করেছেন—"অরূপকে রূপের মধ্যে ধরবার চেষ্টা সাঙ্কেতিক রচনায় কিন্তু রূপকে রূপান্তরে দেখাইবার ইচ্ছা রূপক রচনায়। .....সাঙ্কেতিক রীতিতে অপ্রকাশ্য শেষ পর্যন্ত অপ্রকাশ্যই থাকিয়া যায়, কিন্তু রূপক রীতিতে অপ্রকাশিত ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।" এই শ্রেণির প্রথম নাটক 'শারদোৎসব' (১৯০৮)। পরবর্তীকালে রচিত হয় রাজা (১৯১০) (পরিবর্তিত রূপ অরূপরতন, (১৯২০), অচলায়তন (১৯১২) (পরিবর্তিত সংস্করণ গুরু, ১৯১৮) রচনার পর তাঁর পরিণত সৃষ্টি ডাকঘর (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬), কালের যাত্রা (১৯৩২) (রথের রশি ও কবির দীক্ষা দুটি রচনা অন্তর্ভুক্ত)। রথের রশিতে শ্রমজীবী মানুষের জয়যাত্রাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকে নাট্যকার সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও গভীর উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন।

সব মানুষের সম্মিলিত শক্তি ও সাধনায় বিশ্বচক্রের আবর্তন ঘটে। সেখানে উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। মানুষে মানুষের এই আন্তর সম্পর্ক সূত্রটি হল বন্ধন রজ্জু। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ বর্ণভেদ একে শিথিল করছে। বন্ধন রজ্জু শিথিল হলে, মানুষের খণ্ডিত শক্তি কখনও বিশ্বচক্রে গতি সঞ্চার করতে পারবে না। 'রথের রশি' নাটক রচনার এ হল প্রেক্ষাপট। বস্তুত মুক্তধারা, রক্তকরবী এবং রথের রশির মূল ভরকেন্দ্রে আছে সভ্যতার সংকট। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় মানুষ ও যন্ত্রের সংঘাত মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি, রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির অন্যতম উপজীব্য। 'রথের রশি' পাঠ পরিক্রমায় এ বিষয়টি আরও বিশদভাবে জানা ও বোঝা যাবে।

রূপক, সাংকেতিক নাটক ও রথের রশি ঃ ইংরেজি Allegory ও Symbol দুটি শব্দ মূলত গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে। বাংলায় এর প্রতিশব্দ রূপক ও সংকেত। Allegory-র অর্থ হল একটি বিষয় বলতে গিয়ে অন্য একটি বিষয় বলা। রূপকে ভিতরে ও বাইরে দুটি কাহিনী থাকে। বাইরের কাহিনীটি প্রকৃত অভিপ্রেত নয়, এর ভিতরের কাহিনীকে বা তত্ত্বকে জানা, বোঝা মূল লক্ষ্য। এ জন্য পাঠক একটু চিন্তা বা বুদ্ধির প্রয়োগ করলেই বুঝতে পারেন। কিন্তু সংকেত বা প্রতীক ব্যঞ্জনা নির্ভর বাস্তব ব্যবহারিক অর্থের অতীত কোন কিছুর ইশারা করে—যা সব সময় স্পষ্ট নয়। অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত ইন্দ্রিয়াতীত কোনো 'সত্য'। এই সত্যকে বোঝাতে প্রতিদিনের পরিচিত ভাষায় কাজ হয়না। — প্রয়োজন হয় কোনো প্রতীক বা সংকেত-এর। সংকেত বা বস্তু বা ভাবকে আভাসিত করে, তার বাইরের বা ভিতরের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যোগ থাকে। তখন বাইরের প্রতীকের সাহায্যে ভিতরের অর্থের তাৎপর্য বোঝা যায়।

সংক্ষেপে রূপক হল রূপ থেকে রূপের সঞ্জাত। রূপকের একটি স্পষ্টার্থ আর একটি ব্যঙ্গার্থ থাকে।

সংকেত থেকে সাংকেতিক শব্দটি এসেছে। সংকেত বলতে ইঙ্গিত বা চিহ্নকে বোঝায়। অপরিজ্ঞাত, অনির্বচনীয়, ইন্দ্রিয়াতীত কোনো সত্যকে প্রকাশ করতে সংকেত বা প্রতীকের ব্যবহার করা হয়। ড সাধন ভট্টাচার্যের ভাষায়, "সঙ্কেত অরূপ সত্তার সম্ভাব্য রূপ—আধ্যাত্মিক রশ্মির চতুর্দিকে একটি স্বচ্ছ দীপাবরণ ; আর রূপক কোনো শরীরী পদার্থের অথবা পরিচিত তত্ত্বের একাধিক সম্ভাব্য রূপের একটি। ..... রূপক এক ধরনের রচনারীতি, সঙ্কেত বর্ণনা-কৌশল। সঙ্কেতের মাধ্যমে অল্প বর্ণনা করে অনেকটা বোঝানো

যায়।" সাংকেতিক হল অতীন্দ্রিয়, অপার্থিব ; এখানে রূপ বড় না হয়ে বিমূর্ত অনুভূতির প্রকাশই আসল হয়ে দাঁড়ায়। কোলরিজ রূপক ও সঙ্কেতের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন— "an allegory is but a translation on notions into a picture–language ..... a symbol is charactrised by transference of the special in the individual or a general in the special, or of universal in the general." প্রতীক সাংকেতিক নাটক আর প্রতীক নাটকের মধ্যে পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। অনেকে পার্থক্য স্বীকারও করেননা। Symbol-এর প্রতিশব্দ সংকেত ও প্রতীক সমার্থক মনে করেন। কিন্তু প্রতীক ও সংকেতের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম হলেও পার্থক্য আছে। প্রতীক হল চিহ্ন। "একএকটি ভাব যখন এক একটি চিহ্নের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই চিহ্নের নাম হয় প্রতীক, আর সংকেতে থাকে অনির্বচনীয়তা। প্রতীককে ব্যাখ্যা করা যায়, সাংকেতিকের কোনো ব্যাখ্যা দান সম্ভব নয়, ধরেও যেন তাকে সম্পূর্ণ ধরা যায়না—এমনই ভাব থাকে থাকে সংকেতে।" প্রতীক নাটকে নাট্যকার কোনো বক্তব্যকে চিহ্নের সাহায্যে ব্যঞ্জিত করেন। ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য যখন চিহ্নকে ভর করা হয়, তখনই তা প্রতীক ; আর যখন সেই চিহ্ন অনির্বচনীয়তার ইঙ্গিতবহ হয়, তখন তা হয়ে পড়ে সাংকেতিক। একই নাটকে এই দুই-এর ব্যবহার যুগ্মভাবেও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বর্তমান পর্যায়ে নাটকে সে পরিচয় আছে।

'রথের রশি' রূপক-সাংকেতিক নাটক। মহাকালের 'রথ' এবং রথের 'রশি' ; মূল বক্তব্য ব্যঙ্গ নির্ভর। এ নাটকের কুশীলবরা হলেন যন্ত্রী, সৈনিক, ধনপতি, পুরোহিত, সন্ন্যাসী এবং শূদ্র। রাজশক্তির ও বর্ণভেদবুদ্ধির চাপে মহাকালের রথ অচল হয়ে পড়েছে। কাল গতিশীল, তা যদি স্তব্দ হয়ে যায়, তাহলে ধ্বংস তো অনিবার্য। কালের যাত্রায় প্রাণ-প্রবাহের—উচ্চনীচ নির্বিশেষে আপামর জনগণের অবিচ্ছিন্ন প্রাণশক্তিতেই এতদিন মহাকালের রথ চলেছে। গোষ্ঠী স্বার্থ বুদ্ধি বাধা রচনা করেছে। এ সময় প্রয়োজন অবহেলিত জনগণের জাগরণ। এরাই হবেন বলরামের চেলা—হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে। হীনপতিত শূদ্রদের হস্তক্ষেপে সংসারটা পুনরায় গতি পাবে। কবিচিত্তে যে সাম্যবাদী মানসিকতা সক্রিয় ছিল, তার তত্ত্বরূপটি সংকেতের ব্যঞ্জনায় এখানে কবি প্রকাশ করেছেন।

৮৪.৭ সারাংশ

প্রথম পর্যায়ে গীতিনাট্য ও ইউরোপীয় ধারায় কয়েকটি নাটক রচনা ও অভিনয়ের পর রবীন্দ্রনাথের নাট্যশিল্প বহু বিচিত্র পথে অভিব্যক্তি পেতে থাকে। নাট্য আঙ্গিকে কাব্য ও গীতিপ্রধান রচনা উপহার দিয়েছেন। আবাব প্রচলিত প্রহসনের পথ পরিহার করে তিনি বেশ কয়েকটি অনাবিল হাস্যরস প্রধান কৌতুক নাটক এবং নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে যুগান্তকারী রূপক ও সাংকেতিক নাটক রচনায় তিনি একাধারে যেমন পথিকৃৎ অপর দিকে আজও অনন্য। ভারতীয় নৃত্যকলার অসামান্য দৃশ্যায়নের মধ্যে নাটকীয় ভাববস্তু পরিবেশন করেছেন তিনি। 'রথের রশি' রূপক সাংকেতিক ধারার অন্তর্ভুক্ত। এখানে তিনি দেখিয়েছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐকান্তিক মানবিক সম্পর্কই বিশ্বসংসারকে গতিশীল রাখতে সক্ষম। এই সম্পর্কের ব্যত্যয় ঘটলে মহাকালের রথের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে রূপক ও সাংকেতিক নাটকের প্রকৃতিলক্ষণ বিচার করা হয়েছে। রূপক তত্ত্বগর্ভ কোনো একটি ভাবাশ্রয়ী রচনা। এর ভিতরে ও বাইরে দুটি স্বতন্ত্র কাহিনী থাকে, কিন্তু বাহ্য কাহিনীর অন্তর্নিহিত অর্থই প্রধান। সংকেত অরূপ সত্তার সম্ভাব্য রূপ। মানুষের বিচিত্র ভাবরাশি যা বাক্যে বোঝান যায়না, অনির্বচনীয়, ইন্দ্রিয়াতীত সেই নাটকীয় ভাবসত্যকে কোনো বিশেষ সংকেতের সাহায্যে অনুভূতি জগতে সঞ্চারিত করা হয়, তাকে সাংকেতিক নাটক বলা হয়। কালের যাত্রা গ্রন্থের 'রথের রশি'তে কবি নাট্যকার মানুষের প্রতি মানুষের হৃদয়হীন জাতিবৈর, বৃহৎ মনুষ্য সমাজের অন্তর্গত শূদ্র বলে চিহ্নিত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি অবজ্ঞা, মানবতাবাদী কবিকে পীড়া দিয়েছিল বলেই সমকালীন সমাজ-রাজনৈতিক বাতাবরণে নাটকটি রচনা করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জনজাগরণ, সামাজিক অবিচারের একদিন অবসান ঘটবে। 'রথের রশি' সেই বার্তাই বহন করছে।

৮৪.৮ অনুশীলনী ২

১। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) গান্ধারীর আবেদন — কাব্যনাট্য/নাট্যকাব্য/গীতিনাট্য।

(খ) Symbolic শব্দটির উৎস — লাতিন/গ্রীক/ফরাসী।

(গ) 'রাজা' নাটকের পরিবর্তিত সংস্করণ — রক্তকরবী/গুরু/অরূপরতন।

২। কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

৩। রবীন্দ্রনাথ রচিত কৌতুকনাট্য ও প্রচলিত প্রহসনের মধ্যে পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। সংক্ষেপে আলোচনা করুন ঃ

নৃত্যনাট্য, রূপকনাট্য, সাংকেতিক নাটক।

৮৪.৯ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১ ঃ

১। (ক) অশ্রুমতী (খ) রুদ্রচণ্ড (গ) গীতিনাট্য।

২। (ক) গানের, নাট্যের, নাট্যের, গানের।

(খ) সংগীত, ভাববস্তু, রসসম্পদের, গানের।

(গ) হৃদয়ধর্মী, কল্যাণধর্ম, মানবধর্ম, আচার, অনুষ্ঠানগত, বুদ্ধদেব, বিদ্রোহ।

৩। ও ৪। 'রবীন্দ্রনাটকের সুচনা' অংশ অবলম্বনে প্রাসঙ্গিক উত্তর তৈরি করুন।

৫। 'প্রস্তাবনা' অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনুসরণে আপনার উত্তর লিখুন।

৬। 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' ও 'মালিনী' সম্পর্কে আলোচনা করুন।

অনুশীলনী ২ ঃ

১। (ক) নাট্যকাব্য (খ) গ্রীক (গ) অরূপরতন।

২। মূলপাঠ ২-এর প্রথম অংশ ভালো করে পড়ে উত্তর দিন।

৩। 'কৌতুক নাটক' প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনুসরণে উত্তর দিন।

৪। মূলপাঠ ২-এর দ্বিতীয় অংশ ভালো করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৮৪.১০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য — রবীন্দ্র নাট্যধারা।

২। পুলিন দাস — মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ।

৩। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

৪। ড. অজিতকুমার ঘোষ — বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৫। ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রনাট্য সমীক্ষা : রূপক সাংকেতিক।

৬। ড. দিলীপকুমার নন্দী ও ড. নবকুমার মণ্ডল — প্রসঙ্গ্য : কালের যাত্রা।

৭। অশোক সেন — রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা।

একক ৮৫ ❐ রূপক-সাংকেতিক নাটক ঃ রথের রশি

গঠন

৮৫.১ উদ্দেশ্য
৮৫.২ প্রস্তাবনা
৮৫.৩ মূলপাঠ ১ ঃ রথের রশি
৮৫.৪ সারাংশ
৮৫.৫ মূলপাঠ ২ ঃ রথের রশি
৮৫.৬ সারাংশ
৮৫.৭ অনুশীলনী ১
৮৫.৮ রথের রশি ঃ রচনা, দেশকাল, নামকরণ
৮৫.৯ সারাংশ
৮৫.১০ অনুশীলনী ২
৮৫.১১ রথের রশি নাটকের রচিত্র বিশ্লেষণ
৮৫.১২ সারাংশ
৮৫.১৩ রথের রশি নাটকের ভাষা
৮৫.১৪ নাটকের মঞ্চপরিকল্পনা
৮৫.১৫ সারাংশ
৮৫.১৬ অনুশীলনী ৩
৮৫.১৭ উত্তর-সংকেত
৮৫.১৮ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ
৮৫.১৯ অতিরিক্ত পাঠ

৮৫.১ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটিতে আপনি রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য রূপক-সাংকেতিক নাটক পড়বেন। পূর্ববর্তী এককে রবীন্দ্রনাট্যধারার সাধারণ পরিচয় লাভের পর রূপক-সাংকেতিক নাটক সম্পর্কে জেনেছেন। সেই সঙ্গে রূপক-সাংকেতিক নাটকের সংজ্ঞা ও পরিচয় সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। এবার মূলনাটক পড়ে

'আপনার রূপক-সাংকেতিক নাটক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আরও সম্পূর্ণ ও দৃঢ় হবে। 'রথের রশি' পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি—

- অপরাপর নাটকের পাশাপাশি রূপক ও সাংকেতিক নাটকের পার্থক্য বুঝতে পারবেন।
- রূপক-সাংকেতিক নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলা নাট্যধারায় রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক যে পথিকৃৎ এটা উপলব্ধি করবেন।
- এই শ্রেণির নাটক অন্যান্য নাটক থেকে বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা ও চরিত্রায়ণে স্বতন্ত্র বুঝতে পারবেন।
- এই শ্রেণির নাটকের সংলাপ অন্য নাটক থেকে ভিন্ন সেটি অনুধাবন করবেন।

৮৫.২ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্যে সাংকেতিক নাটক ছিলনা, পরেও আর কেউ লেখেননি। তাঁর এই শ্রেণির নাটকের ভাববস্তু, নাট্যদ্বন্দ্ব ও ভাষাশৈলী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনির্বচনীয়, ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সাধারণত সাংকেতিক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। বাহ্য প্রতীকের সাহায্যে অনির্দেশ্য অপরিচিত বস্তুকে আভাষিত করা হয়। 'রথের রশি'তে রথযাত্রার দিন পথচলতি নরনারী সকলেই দেখতে পেল মহাকালের রথ চলছে না। এই গতিহীনতা মানবসমাজের সবচেয়ে বড় দুর্গতি। এর হেতু সন্ধানে দেখা যাবে মানুষে মানুষে যে সম্পর্কের বন্ধন, তা যদি বাধা পায়, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, সভ্যতার রথচক্র তখনই স্তব্ধ হয়ে যায়। মনুষ্যত্বের অবমাননার অবসান ঘটবে, সম্বন্ধের অসাম্য দূর হলে, তবেই রথ চলবে। 'রথের রশি' নাটকে রথ, রশির রূপকে বিশ্বসংসার মানববন্ধন, মনুষত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার অর্থাৎ মনুষ্যত্বের মর্যাদার পুনরুদ্ধার ব্যঞ্জিত হয়েছে। এ নাটকে এভাবে একটি বিশেষ তত্ত্ব রূপকে ও সংকেতের ব্যঞ্জনায় নাটকীয় বিষয়বস্তুতে তুলে ধরেছে, দেখা যাবে।

৮৫.৩ মূলপাঠ ১ ঃ রথের রশি

রথের রশি

রথযাত্রার মেলায় মেয়েরা

প্রথমা

এবার কী হল, ভাই!
উঠেছি কোন্ ভোরে, তখন কাক ডাকে নি।
কঙ্কালিতলার দিঘিতে দুটো ডুব দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল ;
রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ।

দ্বিতীয়া

চারি দিকে সব যেন থম্‌থমে হয়ে আছে,
ছম্‌ছম্‌ করছে গা।

তৃতীয়া

দোকানি-পসারিরা চুপচাপ বসে,
কেনাবেচা বন্ধ। রাস্তার ধারে ধারে
লোক জটলা করে তাকিয়ে আছে
কখন আসবে রথ। যেন আশা ছেড়ে দিয়েছে।

প্রথমা

দেশের লোকের প্রথম যাত্রার দিন আজ ;
বেরবেন ব্রাহ্মণঠাকুর শিষ্য নিয়ে—
বেরবেন রাজা, পিছনে চলবে সৈন্যসামন্ত—
পণ্ডিতমশায় বেরবেন, ছাত্ররা চলবে পুঁথিপত্র হাতে।
কোলের ছেলে নিয়ে মেয়েরা বেরবে,
ছেলেদের হবে প্রথম শুভযাত্রা—
কিন্তু কেন সব গেল হঠাৎ থেমে!

দ্বিতীয়া

ঐ দেখ্‌ পুরুতঠাকুর বিড়্‌বিড় করছে ওখানে।
মহাকালের পাণ্ডা ব'সে মাথায় হাত দিয়ে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

সর্বনাশ এল।
বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

প্রথমা

এ কী অকল্যাণের কথা ঠাকুর !
উৎসবে এসেছি মহাকালের মন্দিরে—
আজ রথযাত্রার দিন।

সন্ন্যাসী

দেখতে পাচ্ছ না— আজ ধনীর আছে ধন,
তার মূল্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো।
ভরা ফসলের খেতে বাসা করেছে উপবাস।
যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে।
দেখতে পাচ্ছ না—লক্ষ্মীর ভাণ্ড আজ শতছিদ্র,
তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্ছে মরুভূমিতে—
ফলছে না কোনো ফল!

তৃতীয়া

হাঁ ঠাকুর, তাই তো দেখি।

সন্ন্যাসী

তোমরা কেবলই করেছ ঋণ,
কিছুই কর নি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত।
তাই নড়ে না আজ আর রথ—
ঐ-যে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।

প্রথমা

তাই তো, বাপ্ রে, গা শিউরে ওঠে—
এ-যে অজগর সাপ, খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে আর নড়ে না।

সন্ন্যাসী

ঐ তো রথের দড়ি, যত চলে না ততই জড়ায়।
যখন চলে, দেয় মুক্তি।

দ্বিতীয়া

বুঝেছি আমাদের পুজো নেবেন ব'লে
হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন দড়ি-দেবতা।
পুজো পেলেই হবেন তুষ্ট।
ও ভাই, পুজো তো আনি নি। ভুল হয়েছে।

তৃতীয়া

পুজোর কথা তো ছিল না—

ভেবেছিলেম রথের মেলায় কেবল বেচব কিনব,
বাজি দেখব জাদুকরের,
আর দেখব বাঁদর-নাচ।
চল-না শিগগির, এখনো সময় আছে,
আনিগে পুজো।

[সকলের প্রস্থান]

নাগরিকদের প্রবেশ

প্রথম নাগরিক

দেখ্ দেখ্ রে, রথের দড়িটা কেমন করে পড়ে আছে।
যুগযুগান্তরের দড়ি, দেশদেশান্তরের হাত পড়েছে ঐ দড়িতে,
আজ অনড় হয়ে মাটি কামড়ে আছে
সর্বাঙ্গ কালো করে।

দ্বিতীয় নাগরিক

ভয় লাগছে রে। সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া।
মনে হচ্ছে ওটা এখনই ধরবে ফণা, মারবে ছোবল।

তৃতীয় নাগরিক

একটু একটু নড়ছে যেন রে! আঁকুবাঁকু করছে বুঝি

প্রথম নাগরিক

বলিস্ নে অমন কথা। মুখে আনতে নেই।
ও যদি আপনি নড়ে তা হলে কি আর রক্ষে আছে।

তৃতীয় নাগরিক

তা হলে ওর নাড়া খেয়ে সংসারের সব জোড়গুলো
বিজোড় হয়ে পড়বে। আমরা যদি না চালাই—
ও যদি আপনি চলে, তা হলে পড়ব যে চাকার তলায়।

প্রথম নাগরিক

ঐ দেখ্ ভাই, পুরুতের গেছে মুখ শুকিয়ে,
কোণে বসে বসে পড়ছে মন্তর।

দ্বিতীয় নাগরিক

সেদিন নেই রে

যেদিন পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ।
ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।

তৃতীয় নাগরিক

তবু আজ ভোরবেলা দেখি ঠাকুর লেগেছেন টান দিতে—
কিন্তু একেবারেই উল্টো দিকে, পিছনের পথে।

প্রথম নাগরিক

সেটাই তো ঠিক পথ, পবিত্র পথ, আদি পথ।
সেই পথ থেকে দূরে এসেই তো কালের মাথার ঠিক থাকছে না।

দ্বিতীয় নাগরিক

মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠলি দেখি! এত কথা শিখলি কোথা।

প্রথম নাগরিক

ঐ পণ্ডিতেরই কাছে। তাঁরা বলেন—
মহাকালের নিজের নাড়ীর টান পিছনের দিকে,
পাঁচজনের দড়ির টানে অগত্যা চলেন সামনে।
নইলে তিনি পিছু হটতে হটতে একেবারে পৌঁছতেন
অনাদি কালের অতল গহ্বরে।

তৃতীয় নাগরিক

ঐ বশিটার দিকে চাইতে ভয় করে।
ওটা যেন যুগান্তের নাড়ী—
সান্নিপাতিক জ্বরে আজ দব্‌দব্‌ করছে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

সর্বনাশ এল।
গুরুগুরু শব্দ মাটির নীচে।
ভূমিকম্পের জন্ম হচ্ছে।
গুহার মধ্য থেকে আগুন লক্‌লক্‌ মেলছে রসনা।
পূর্বে পশ্চিমে আকাশ হয়েছে রক্তবর্ণ।
প্রলয়দীপ্তির আংটি পরেছে দিকচক্রবাল।

[প্রস্থান]

প্রথম নাগরিক

দেশে পুণ্যাত্মা কেউ নেই কি আজ।
ধরুক-না এসে দড়িটা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এক-একটি পুণ্যাত্মাকে খুঁজে বের করতেই
এক-এক যুগ যায় বয়ে—
ততক্ষণ পাপাত্মাদের হবে কী দশা।

তৃতীয় নাগরিক

পাপাত্মাদের কী হবে তা নিয়ে ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

দ্বিতীয় নাগরিক

সে কী কথা। সংসার তো পাপাত্মাদের নিয়েই।
তারা না থাকলে তো লোকনাথের রাজত্ব উজাড়।
পুণ্যাত্মা কালেভদ্রে দৈবাৎ আসে,
আমাদের ঠেলায় দৌড় মারে বনে জঙ্গলে গুহায়।

প্রথম নাগরিক

দড়িটার রঙ যেন এল নীল হয়ে।
সামলে কথা কোস।

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

বাজা ভাই, শাঁখ বাজা—
রথ না চললে কিছুই চলবে না।
চড়বে না হাঁড়ি, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান।
এরই মধ্যে আমার মেজো ছেলের গেছে চাকরি,
তার বউটা শুষছে জ্বরে। কপালে কী আছে জানি নে।

প্রথম নাগরিক

মেয়েমানুষ, তোমরা এখানে কী করতে।
কালের রথযাত্রায় কোনো হাত নেই তোমাদের।
কুটনো কোটোগে ঘরে।

দ্বিতীয়া

কেন, পুজো দিতে তো পারি।
আমরা না থাকলে পুরুতের পেট হত না এত মোটা।
গড় করি তোমায়, দড়ি-নারায়ণ! প্রসন্ন হও।
এনেছি তোমার ভোগ। ওলো, ঢাল্ ঢাল্ ঘি,
ঢাল্ দুধ, গঙ্গাজলের ঘটি কোথায়,
ঢেলে দে না জল। পঞ্চগব্য রাখ্ ঐখানে,
জ্বালা পঞ্চপ্রদীপ। বাবা দড়ি-নারায়ণ,
এই আমার মানত রইল, তুমি যখন নড়বে
মাথা মুড়িয়ে চুল দেব ফেলে।

তৃতীয়া

এক মাস ছেড়ে দেব ভাত, খাব শুধু রুটি।
বলো-না ভাই, সবাই মিলে—জয় দড়ি-নারায়ণের জয়।

প্রথম নাগরিক

কোথাকার মূর্খ তোরা—
দে মহাকালনাথের জয়ধ্বনি।

প্রথমা

কোথায় তোমাদের মহাকালনাথ। দেখি নে তো চক্ষে।
দড়ি-প্রভুকে দেখছি প্রত্যক্ষ—
হনুমান-প্রভুর লঙ্কা-পোড়ানো লেজখানার মতো—
কী মোটা, কী কালো, আহা দেখে চক্ষু সার্থক হল।
মরণকালে ঐ দড়ি-ধোওয়া জল ছিটিয়ে দিয়ো আমার মাথায়।

দ্বিতীয়া

গালিয়ে নেব আমার হার, আমার বাজুবন্দ।
দড়ির ডগা দেব সোনা-বাঁধিয়ে।

তৃতীয়া

আহা, কী সুন্দর রূপ গো !

প্রথমা

যেন যমুনা নদীর ধারা!

দ্বিতীয়া

যেন নাগকন্যার বেণী।

তৃতীয়া

যেন গণেশঠাকুরের শুঁড় চলেছে লম্বা হয়ে,
দেখে জল আসে চোখে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

প্রথমা

দড়ি-ঠাকুরের পুজো এনেছি, ঠাকুর।
কিন্তু পুরুত যে নড়েন না, মন্তর পড়বে কে।

সন্ন্যাসী

কি হবে মন্তরে।
কালের পথ হয়েছে দুর্গম।
কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।

তৃতীয়া

বাবা, সাতজন্মে শুনি নি এমন কথা।
চিরদিনই তো উঁচুর মান রেখেছে নিচু মাথা হেঁট করে।
উঁচু-নিচুর সাঁকোর উপর দিয়েই তো রথ চলে।

সন্ন্যাসী

দিনে দিনে গর্তগুলোর হাঁ উঠছে বেড়ে।
হয়েছে বাড়াবাড়ি, সাঁকো আর টিকছে না।
ভেঙে পড়ল ব'লে।

[প্রস্থান]

প্রথমা

চল্ ভাই, তবে পুজো দিইগে রাস্তা-ঠাকুরকে।
আর গর্ত-প্রভুকেও তো সিন্নি দিয়ে করতে হবে খুশি,
কী জানি ওঁরা শাপ দেন যদি। একটি-আধটি তো নন,
আছেন দু-হাত পাঁচ-হাত অন্তর।

নমো নমো দড়ি-ভগবান, রাগ কোরো না ঠাকুর,
ঘরে আছে ছেলেপুলে।

[মেয়েদের প্রস্থান]

সৈন্যদলের প্রবেশ

প্রথম সৈনিক

ওরে বাস্ রে! দড়িটা যেন পড়ে আছে পথের মাঝখানে—
যেন একজটা ডাকিনীর জটা।

দ্বিতীয় সৈনিক

মাথা দিল হেঁট করে।
স্বয়ং রাজা লাগালেন হাত, আমরাও ছিলুম পিছনে।
একটু ক্যাঁচকোঁচও করলে না চাকাটা!

তৃতীয় সৈনিক

ও যে আমাদের কাজ নয়, তাই।
ক্ষত্রিয় আমরা, শূদ্র নই, নই গোরু।
চিরদিন আমরা চড়েই এসেছি রথে।
চিরদিন রথ টানে ঐ ওরা—যাদের নাম করতে নেই।

প্রথম নাগরিক

শোনো ভাই, আমার কথা।
কালের অপমান করেছি আমরা, তাই ঘটেছে এ-সব অনাসৃষ্টি।

তৃতীয় সৈনিক

এ মানুষটা আবার বলে কী।

প্রথম নাগরিক

ত্রেতাযুগে শূদ্র নিতে গেল ব্রাহ্মণের মান—
চাইলে তপস্যা করতে, এত বড়ো আস্পর্ধা—
সেদিনও অকাল লাগল দেশে, অচল হল রথ।
দয়াময় রামচন্দ্রের হাতে কাটা গেল তার মাথা,
তবে তো হল আপদ শান্তি।

দ্বিতীয় নাগরিক

সেই শূদ্ররা শাস্ত্র পড়ছেন আজকাল,
হাত থেকে কাড়তে গেলে বলেন, আমরা কি মানুষ নই।

তৃতীয় নাগরিক

মানুষ নই! বটে! কতই শুনব কালে কালে।
কোন্‌দিন বলবে, ঢুকব দেবালয়ে।
বলবে, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের সঙ্গে নাইব এক ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

এর পরেও রথ যে চলছে না, সে আমাদের প্রতি দয়া করে।
চললে চাকার তলায় গুঁড়িয়ে যেত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

প্রথম সৈনিক

আজ শূদ্র পড়ে শাস্ত্র,
কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ। সর্বনাশ !

দ্বিতীয় সৈনিক

চল্‌-না ওদের পাড়ায় গিয়ে প্রমাণ করে আসি—
ওরাই মানুষ না আমরা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এ দিকে আবার কোন বুদ্ধিমান বলেছে রাজাকে—
কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র,
চলে কেবল স্বর্ণচক্র। তিনি ডাক দিয়েছেন শেঠজিকে।

প্রথম সৈনিক

রথ যদি চলে বেনের টানে
তবে গলায় অস্ত্র বেঁধে জলে দেব ডুব।

দ্বিতীয় সৈনিক

দাদা, রাগ কর মিছে, সময় হয়েছে বাঁকা।
এ যুগে পুষ্পধনুর ছিলেটাও
বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টংকার।

তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে
ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে।

তৃতীয় সৈনিক

তা সত্যি। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে,
পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

প্রথম সৈনিক

এই-যে সন্ন্যাসী, রথ চলে না কেন আমাদের হাতে।

সন্ন্যাসী

তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর।
যেখানে যত তীর ছুঁড়েছ, বিঁধেছে ওর গায়ে।
ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর।
তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,
বলের মাতলামিতে দুর্বল করবে কালকে।
সরে যাও, সরে যাও ওর পথ থেকে।

[প্রস্থান]

ধনপতির অনুচরবর্গের প্রবেশ

প্রথম ধনিক

এটা-কী গো, এখনি হুঁচট খেয়ে পড়েছিলুম।

দ্বিতীয় ধনিক

ওটাই তো রথের দড়ি।

চতুর্থ ধনিক

বীভৎস হয়ে উঠেছে, যেন বাসুকি মরে উঠল ফুলে।

প্রথম সৈনিক

কে এরা সব।

দ্বিতীয় সৈনিক

আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো
লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে চোখে।

প্রথম নাগরিক

ধনপতি শেঠির দল এরা।

প্রথম ধনিক

আমাদের শেঠজিকে ডেকেছেন রাজা।
সবাই আশা করছে, তাঁর হাতেই চলবে রথ।

দ্বিতীয় সৈনিক

সবাই বলতে বোঝায় কাকে বাপু?
আর তারা আশাই বা করে কিসের।

দ্বিতীয় ধনিক

তারা জানে, আজকাল চলছে যা-কিছু
সব ধনপতির হাতেই চলছে।

প্রথম সৈনিক

সত্যি নাকি! এখনই দেখিয়ে দিতে পারি,
তলোয়ার চলে আমাদেরই হাতে।

তৃতীয় ধনিক

তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে।

প্রথম সৈনিক

চুপ, দুর্বিনীত!

দ্বিতীয় ধনিক

চুপ করব আমরা বটে!
আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে
জলে স্থলে আকাশে।

প্রথম সৈনিক

মনে ভাবছ, আমাদের শতঘ্নী ভুলেছে তার বজ্রনাদ!

দ্বিতীয় ধনিক

ভুললে চলবে কেন। তাকে যে আমাদেরই হুকুম

ঘোষণা করতে হয় এক হাট থেকে আরেক হাটে
সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

ওদের সঙ্গে পারবে না তর্কে।

প্রথম সৈনিক

কী বল, বারব না !
সব চেয়ে বড়ো তর্কটা ঝন্‌ঝন্‌ করছে খাপের মধ্যে।

প্রথম নাগরিক

তোমাদের তলোয়ারগুলোর কোনোটা খায় ওদের নিমক,
কোনোটা খেয়ে বসেছে ওদের ঘুষ।

প্রথম ধনিক

শুনলেম, নর্মদাতীরের বাবাজিকে আনা হয়েছিল
দড়িতে হাত লাগাবার জন্য। জান খবর?

দ্বিতীয় ধনিক

জানি বৈকি।
রাজার চর পৌঁছল গুহায়,
তখন প্রভু আছেন চিৎ হয়ে বুকে দুই পা আটকে।
তূরী ভেরী দামামা জগঝম্পের চোটে ধ্যান যদিবা ভাঙল,
পা-দুখানা তখন আড়ষ্ট কাঠ!

নাগরিক

শ্রীচরণের দোষ কী, দাদা!
পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে একবারও নাম করে নি চলাফেরার।
বাবাজি বললেন কী।

দ্বিতীয় ধনিক

কথা কওয়ার বালাই নেই।
জিবটার চাঞ্চল্যে রাগ ক'রে গোড়াতেই ফেলেছেন কেটে।

ধনিক

তার পরে?

দ্বিতীয় ধনিক

তার পরে দশ জোয়ানে মিলে আনলে তাঁকে রথতলায়।
দড়িতে যেমনি তাঁর হাত পড়া,
রথের চাকা বসে যেতে লাগল মাটির নীচে।

ধনিক

নিজের মনটা যেমন ডুবিয়েছেন
রথটাকেও তেমনি তলিয়ে দেবার চেষ্টা।

দ্বিতীয় ধনিক

একদিন উপবাসেই মানুষের পা চায় না চলতে—
পঁয়ষট্টি বছরের উপবাসের ভার পড়ল চাকার 'পরে।

মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি

ডাক পড়ল কেন, মন্ত্রীমশায়?

মন্ত্রী

অনর্থপাত হলেই সর্বাগ্রে তোমাকে স্মরণ করি।

ধনপতি

অর্থপাতে যার প্রতিকার, আমার দ্বারা তাই সম্ভব।

মন্ত্রী

মহাকালের রথ চলছে না।

ধনপতি

এ পর্যন্ত আমরা কেবল চাকায় তেল দিয়েছি,
রশিতে টান দিই নি।

মন্ত্রী

অন্য সব শক্তি আজ অর্থহীন,
তোমাদের অর্থবান হাতের পরীক্ষা হোক।

ধনপতি

চেষ্টা করা যাক।
দৈবক্রমে চেষ্টা যদি সফল হয়, অপরাধ নিয়ো না তবে

দলের লোকের প্রতি

বলো সিদ্ধিরস্তু!

সকলে

সিদ্ধিরস্তু!

ধনপতি

লাগো তবে ভাগ্যবানেরা। টান দেও।

ধনিক

রশি তুলতেই পারি নে। বিষম ভারি !

ধনপতি

এসো কোষাধ্যক্ষ, ধরো তুমি কষে।
বলো সিদ্ধিরস্তু! টানো, সিদ্ধিরস্তু!
টানো, সিদ্ধিরস্তু!

দ্বিতীয় ধনিক

মন্ত্রীমশায়, রশিটা যেন আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠল,
আর আমাদের হাতে হল যেন পক্ষাঘাত!

সকলে

দুয়ো দুয়ো!

সৈনিক

যাক, আমাদের মানরক্ষা হল।

পুরোহিত

আমাদের ধর্মরক্ষা হল।

সৈনিক

যদি থাকত সেকাল, আজ তোমার মাথা যেত কাটা।

ধনপতি

ঐ সোজা কাজটাই জান তোমরা।
মাথা খাটাতে পার না, কাটতেই পার মাথা।
মন্ত্রীমশায়, ভাবছ কী।

মন্ত্রী

ভাবছি, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল—
এখন উপায় কী।

ধনপতি

এবার উপায় বের করবেন স্বয়ং মহাকাল।
তাঁর নিজের ডাক যেখানে পৌঁছবে
সেখান থেকে বাহন আসবে ছুটে।
আজ যারা চোখে পড়ে না
কাল তারা দেখা দেবে সব চেয়ে বেশি।
ওহে খাতাঞ্চি, এইবেলা সামলাওগে খাতাপত্র—
কোষাধ্যক্ষ, সিন্ধুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।

[ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান]

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

হাঁ গা, রথ চলল না এখনো, দেশসুদ্ধ রইল উপোস করে।
কলিকালে ভক্তি নেই যে।

মন্ত্রী

তোমাদের ভক্তির অভাব কী বাছা,
দেখি-না তার জোর কত।

প্রথমা

নমো নমো,
নমো নমো বাবা দড়ি-ঠাকুর, অন্ত পাই নে তোমার দয়ার।
নমো নমো।

দ্বিতীয়া

তিনকড়ির মা বললে, সতেরো বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ে—
ঠিকদুক্ষুর বেলা, বোম ভোলানাথ ব'লে
তালপুকুরে—ঘাটের থেকে তিন হাতের মধ্যে—
একডুবে তিন গোছা পাট-শিয়ালা তুলে
ভিজে চুল দিয়ে বেঁধে দড়ি-প্রভুর কাছে পোড়ালে
প্রভুর টনক নড়বে! জোগাড় করেছি অনেক যত্নে,
সময়ও হয়েছে পোড়াবার।
আগে দড়ি-বাবার গায়ে সিঁদুর চন্দন লাগা।
ভয় কিসের, ভক্তবৎসল তিনি—

মনে মনে শ্রীগুরুর নাম করে গায়ে হাত ঠেকালে
অপরাধ নেবেন না তিনি।

প্রথমা

তুই দে-না ভাই চন্দন লাগিয়ে, আমাকে বলিস কেন।
আমার দেওরপো পেটরোগা,
কী জানি কিসের থেকে কী হয়।

তৃতীয়া

ঐ তো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।
কিন্তু জাগলেন না তো!
দয়াময়!
জয় প্রভু, জয় দড়ি-দয়াল প্রভু, মুখ তুলে চাও।
তোমাকে দেব পরিয়ে পঁয়তাল্লিশ ভরির সোনার আংটি—
গড়াতে দিয়েছি বেণী স্যাকরার কাছে।

দ্বিতীয়া

তিন বছর থাকব দাসী হয়ে, ভোগ দেব তিন বেলা।
ওলো বিনি, পাখাটা এনেছিস তো বাতাস কর্-না—
দেখছিস্ নে রোদ্দুরে তেতে উঠেছে ওঁর মেঘবরন গা !
ঘটি করে গঙ্গাজলটা ঢেলে দে।
ঐখানকার কাদাটা দে তো ভাই আমার কপালে মাখিয়ে।
এই তো আমাদের খেঁদি এনেছে খিচুড়ি-ভোগ।
বেলা হয়ে গেল, আহা কত কষ্ট পেলেন প্রভু।
জয় দড়ীশ্বর, জয় মহাদড়ীশ্বর, জয় দেবদেবদড়ীশ্বর,
গড় করি তোমায়, টলুক তোমার মন।
মাথা কুটছি তোমার পায়ে, টলুক তোমার মন।
পাখা কর্ লো ; পাখা কর্, জোরে জোরে।

প্রথমা

কী হবে গো, কী হবে আমাদের—
দয়া হল না যে! আমার তিন ছেলে বিদেশে,
তারা ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়।

চরের প্রবেশ

মন্ত্রী

বাছারা, এখানে তোমাদের কাজ হল—
এখন ঘরে গিয়ে জপতপ ব্রতনিয়ম করোগে।
আমাদের কাজ আমরা করি।

প্রথমা

যাচ্ছি, কিন্তু দেখো মন্ত্রীবাবা,
ঐ ধোঁয়াটা যেন শেষ পর্যন্ত থাকে—
আর ঐ বিল্বিপত্রটা যেন পড়ে না যায়।

[মেয়েদের প্রস্থান]

৮৫.৪ সারাংশ

নাটকের প্রথমেই দেখা যাচ্ছে অসংখ্য নরনারী মেলায় এসেছে রথযাত্রা দেখতে। কিন্তু রথ চলছে না, 'চারিদিকে সব যেন থম্‌থমে হয়ে আছে'। পথের পাশে রথের মেলা বসেছে। কিন্তু 'দোকানি-পসারিরা চুপচাপ বসে, কেনা-বেচা বন্ধ। সকলে বিহ্বল, বিচলিত। সন্ন্যাসী তাদের ভয়কে আরো বাড়িয়ে তোলে, রথ চলছে না মানে মহাধ্বংস নেমে আসবে। 'পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে অসাড় দড়িটা'। মেয়েরা ভয় পেয়ে দড়ি দেবতার পূজোর আয়োজন করে। নাগরিকবৃন্দ ঘটনাস্থলে এসে দড়ি সম্পর্কে নানা কল্পনা করতে থাকে, ভয়ও পায়। তারা অজ্ঞানতাবশে ভাবল মহাকালের নাড়ীর টান বোধ করি পিছনের দিকে। তারা সিদ্ধান্তে এলো রথের চাকায় গতি সঞ্চার করতে পারেন একমাত্র কোনো পুণ্যাত্মা ব্যক্তি। এমন সময় সন্ন্যাসী জানিয়ে দিলেন 'কালের গতিকে পথ হয়েছে দুর্গম, উঁচু-নিচু, গভীর গর্ত, তাকে করতে হবে সমান, তবে ঘুচবে বিপদ'। সন্ন্যাসীর এ তত্ত্বকথা সাধারণে বুঝল না, তারা মনে করল মানবসমাজে হয়েছে মহাসংকট। এরপর একে একে এলো সৈনিকবৃন্দ—রাজশক্তি রক্ষক, ক্ষত্রিয় শক্তির প্রতীক। শক্তির দম্ভে তারা উদ্ধত। ধনিকেরা ভাবল বিত্ত বৈভবে তারা সবার সেরা। তারা অর্থশক্তিতে রথকে সচল করবে। তাদের হাতের স্পর্শে রথতো চললই না বরং অনড় হয়ে গেল। পরিশেষে তারা বুঝতে পেরেছিল, পুরোহিত তন্ত্র নয়, ক্ষত্রিয় বা রাজতন্ত্র নয়, এমনকি ধনতন্ত্রও নয়, মহাকালই তার রথচক্রে গতি সঞ্চার করবেন তাদের দিয়ে যারা এতদিন ধরে পড়ে আছে নিচে—নিষ্পেষিত শূদ্রশক্তি। তাদের জাগতে আর দেরী নেই। ধনিকেরা তাই আপন ঘর সামলাবার হুঁশিয়ারী দেয়—

ওহে খাতাঞ্চি, এইবেলা সামলাওগে খাতাপত্র—
কোষাধ্যক্ষ, সিন্দুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।

এদিকে অনভিজ্ঞ মেয়েরা সকলে মিলে পুজোর আয়োজন করে। এমনি সময় চর এলো বার্তা নিয়ে।

চর

মন্ত্রীমশায়, গোল বেধেছে শূদ্রপাড়ায়।

মন্ত্রী

কী হল!

চর

দলে দলে ওরা আসছে ছুটে, বলছে, রথা চালাব আমরা।

সকলে

বলে কী! রশি ছুঁতেই পাবে না।

চর

ঠেকাবে কে তাদের, মারতে মারতে তলোয়ার যাবে ক্ষয়ে।
মন্ত্রীমশায়, বসে পড়লে যে!

মন্ত্রী

দল বেঁধে আসছে বলে ভয় করি নে—
ভয় হচ্ছে পারবে ওরা।

সৈনিক

বল কী মন্ত্রীমহারাজ, শিলা জলে ভাসবে?

মন্ত্রী

নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়,
বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।

সৈনিক

আদেশ করুন কী করতে হবে, ভয় করি নে আমরা।

মন্ত্রী

ভয় করতেই হবে, তলোয়ারের বেড়া তুলে বন্যা
ঠেকানো যায় না।

চর

এখন কী আদেশ বলুন।

মন্ত্রী

বাধা দিয়ো না ওদের।
বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।

চর

ঐ-যে এসে পড়েছে ওরা।

মন্ত্রী

কিছু কোরো না তোমরা, থাকো স্থির হয়ে।

শূদ্রদলের প্রবেশ

দলপতি

আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে।

মন্ত্রী

তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে আসছ চিরদিন।

দলপতি

এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়,
দ'লে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপটা হয়ে।
এবার সেই বলি তো নিল না বাবা!

মন্ত্রী

তাই তো দেখলেম।
সকাল থেকে চাকার সামনে ধুলোয় করলে লুটোপুটি—
ভয়ে উপরে তাকালে না, পাছে ঠাকুরের দিকে চোখ পড়ে—
তবু তো চাকার মধ্যে একটুও দেখা গেল না ক্ষুধার লক্ষণ!

পুরোহিত

একেই বলে অগ্নিমান্দ্য,
তেজ ক্ষয় হলেই ঘটে এই দশা।

দলপতি

এবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর রশি ধরতে।

পুরোহিত

রশি ধরতে! ভারি বুদ্ধি তোমাদের! জানলে কী করে।

দলপতি

কেমন করে জানা গেল সে তো কেউ জানে না।
ভোরবেলা উঠেই সবাই বললে সবাইকে,
ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,
পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী,
পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর—
ডাক দিয়েছেন বাবা।

সৈনিক

রক্ত দেবার জন্যে।

দলপতি

না, টান দেবার জন্যে।

পুরোহিত

বরাবর সংসার যারা চালায়, রথের রশি তাদেরই হাতে।

দলপতি

সংসার কি তোমরাই চালাও ঠাকুর!

পুরোহিত

স্পর্ধা দেখো একবার! কথার জবাব দিতে শিখেছে—
লাগল ব'লে ব্রহ্মশাপ।

দলপতি

মন্ত্রীমশায়, তোমরাই কি চালাও সংসার।

মন্ত্রী

সে কী কথা। সংসার বলতে তো তোমরাই।
নিজগুণেই চল, তাই রক্ষে।
চালাক লোকে বলে আমরাই চালাচ্ছি।
আমরা মান রাখি লোক ভুলিয়ে।

দলপতি

আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ ;
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।

সৈনিক

সর্বনাশ! এতদিন মাথা হেঁট করে বলে এসেছে ওরা—
তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক।
আজ ধরেছে উল্টো বুলি, এ তো সহ্য হয় না।

মন্ত্রী

সৈনিকের প্রতি

চুপ করো!
সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই,
তোমরা নারায়ণের গরুড়।
এখন তোমাদের কাজ সাধন করে যাও তোমরা।
তার পরে আসবে আমাদের কাজের পালা।

দলপতি

আয় রে ভাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচি।

মন্ত্রী

কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো।
বরাবর যে-রাস্তায় রথ চলেছে, যেয়ো সেই রাস্তা ধরে।
পোড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।

দলপতি

কখনো বড়ো রাস্তায় চলতে পাই নি, তাই রাস্তা চিনি নে।
রথে আছেন যিনি তিনিই সামলাবেন।
আয় ভাই, দেখছিস রথচূড়ায় কেতনটা উঠছে দুলে।
বাবার ইশারা। ভয় নেই আর, ভয় নেই।
ঐ চেয়ে দেখ্ রে ভাই,
মরা নদীতে যেমন বান আসে
দড়ির মধ্যে তেমনি প্রাণ এসে পৌঁচেছে।

পুরোহিত

ছুঁলো, ছুঁলো দেখছি ছুঁলো শেষে, রশি ছুঁলো পাষণ্ডেরা!

মেয়েদের ছুটিয়া প্রবেশ

সকলে

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, দোহাই বাবা—
ও গদাধর, ও বনমালী, এমন মহাপাপ কোরো না।
পৃথিবী যাবে যে রসাতলে!
আমাদের স্বামী ভাই বোন ছেলে
কাউকে পারব না বাঁচাতে.
চল রে চল, দেখলেও পাপ আছে।

[প্রস্থান]

পুরোহিত

চোখ বোজো, চোখ বোজো তোমরা।
ভস্ম হয়ে যাবে ক্রুদ্ধ মহাকালের মূর্তি দেখলে।

সৈনিক

একি, একি, চাকার শব্দ নাকি—
না আকাশটা উঠল আর্তনাদ করে?

পুরোহিত

হতেই পারে না—কিছুতেই হতে পারে না—
কোনো শাস্ত্রেই লেখে না।

নাগরিক

নড়েছে রে, নড়েছে, ঐ তো চলেছে!

সৈনিক

কী ধুলোই উড়ল—পৃথিবী নিশ্বাস ছাড়ছে.
অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ শেষে চলল যে—
পাপ, মহাপাপ,

শূদ্রদল

জয় জয়, মহাকালনাথের জয়!

পুরোহিত

তাই তো, এও দেখতে হল চোখে!

সৈনিক

ঠাকুর, তুমিই হুকুম করো, ঠেকাব রথ-চলা।
বৃদ্ধ হয়েছেন মহাকাল, তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হল—
দেখলেম সেটা স্বচক্ষে!

পুরোহিত

সাহস হয় না হুকুম করতে।
অবশেষে জাত খোয়াতেই বাবার যদি খেয়াল গেল
এবারকার মতো চুপ করে থাকো, রঞ্জুলাল।
আসছে বারে ওঁকে হবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে।
হবেই, হবেই, হবেই।
ওঁর দেহ শোধন করতে গঙ্গা যাবে শুকিয়ে।

সৈনিক

গঙ্গার দরকার হবে না.
ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে,
ঢালব ওদের রক্ত।

নাগরিক

মন্ত্রীমশায়, যাও কোথায়।

মন্ত্রী

যাব ওদের সঙ্গে রশি ধরতে।

সৈনিক

ছি ছি, ওদের হাতে হাত মেলাবে তুমি!

মন্ত্রী

ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।
স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন।
এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদেরই সঙ্গে সমান হয়ে।

সৈনিক

তাই বলে ওদেরই একসারে রশি ধরা !
ঠেকাবই আমরা, রথ চলুক আর নাই চলুক।

মন্ত্রী

এবার দেখছি চাকার তলায় পড়বার পালা তোমাদেরই

সৈনিক

সেও ভালো। অনেককাল চন্ডালের রক্ত শুষে
চাকা আছে অশুচি,
এবার পাবে শুদ্ধ রক্ত। স্বাদ বদল করুক।

পুরোহিত

কী হল মন্ত্রী, এ কোন্ শনিগ্রহের ভেলকি?
রথটা যে এরই মধ্যে নেমে পড়েছে রাজপথে।
পৃথিবী তবু তো নেমে গেল না রসাতলে!
মাতাল রথ কোথায় পড়ে কোন্ পল্লীর ঘাড়ে, কে জানে।

সৈনিক

ঐ দেখো, ধনপতির দল আর্তনাদ করে ডাকছে আমাদের।
রথটা একেবারে সোজা চলেছে ওদেরই ভান্ডারের মুখে।
যাই ওদের রক্ষা করতে।

মন্ত্রী

নিজেদের রক্ষার কথা ভাবো।
দেখছ না, ঝুঁকেছে তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে

সৈনিক

উপায়?

মন্ত্রী

ওদের সঙ্গে মিলে ধরো-সে রশি।

বাঁচবার দিকে ফিরিয়ে আনো রথটাকে—
দো-মনা করবার সময় নেই।

[প্রস্থান]

সৈনিক

কী করবে ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরোহিত

বীরগণ, তোমরা কী করবে বলো আগে।

সৈনিক

কী করতে হবে বলো-না ভাইসকল!
সবাই যে একেবারে চুপ করে গেছ!
রশি ধরব, না লড়াই করব?
ঠাকুর, তুমি কী করবে বলোই-না।

পুরোহিত

কী জানি, রশি ধরব, না শাস্ত্র আওড়াব?

সৈনিক

গেল, গেল সব। রথের এমন হাঁক শুনি নি কোনো পুরুষে।

দ্বিতীয় সৈনিক

চেয়ে দেখ্-না, ওরাই কি টানছে রথ
না রথটা আপনিই চলেছে ওদের ঠেলে নিয়ে!

তৃতীয় সৈনিক

এতকাল রথটা চলত যেন স্বপ্নে—
আমরা দিতেম টান আর ও পিছে পিছে আসত
দড়িবাঁধা গোরুর মতো।
আজ চলেছে জেগে উঠে। বাপ্ রে, কী তেজ।
মানছে না আমাদের বাপদাদার পথ—
একটা কাঁচা পথে ছুটেছে বুনো মহিষের মতো।
পিঠের উপরে চড়ে বসেছে যম।

দ্বিতীয় সৈনিক

ঐ-যে আসছে কবি, ওকে জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কী।

পুরোহিত

পাগলের মতো কথা বলছ তোমরা।
আমরাই বুঝলেম না মানে, বুঝবে কবি?
ওরা তো বানিয়ে বানিয়ে বলে কথা— শাস্ত্র জানে কী।

কবির প্রবেশ

দ্বিতীয় সৈনিক

এ কী উল্টো-পাল্টা ব্যাপার কবি!
পুরুতের হাতে চলল না রথ, রাজার হাতে না—
মানে বুঝলে কিছু?

কবি

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু,
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
নীচের দিকে নামল না চোখ,
রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে-বাঁধন তাকে ওরা মানে নি।
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে লেজ আছড়াচ্ছে—
দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

পুরোহিত

তোমরা শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি

পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

পুরোহিত

তখন যদি রথ আর—একবার অচল হয়
বোধ করি তোমার মতো কবিরই ডাক পড়বে—
তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা!

কবি

নিতান্ত ঠাট্টা নয়, পুরুতঠাকুর!
রথযাত্রার কবির ডাক পড়েছে বারে বারে।
কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারে নি সে পৌঁছতে।

পুরোহিত

রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।

কবি

গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।
আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চাল-চলন যার একপাশে বাঁকা ;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিত,
যার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মান কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তালমানের উপর নয়।

সৈনিক

তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চললে,
ও দিকে যে লাগল আগুন।

কবি

যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।

সৈনিক

তুমি কি করবে, কবি!

কবি

আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।
কী হবে তার ফল।

সৈনিক

কবি

যারা টানছে রথ তারা পা ফেলবে তালে তালে।
পা যখন হয় বেতালা
তখন খুদে খুদে খালখন্দগুলো মারমূর্তি ধরে।
মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

— হল কী ঠাকুর!
তোমরা এতদিন আমাদের কী শিখিয়েছিলে।
দেবতা মানলে না পুজো, ভক্তি হল মিছে।
মানলে কিনা শুদ্দুরের টান, মেলেচ্ছের ছোঁওয়া!
ছি ছি, কী ঘেন্না।

কবি

পূজো তোমরা দিলে কোথায়।

দ্বিতীয়া

এই তো এইখানেই।
'ঘি ঢেলেছি, দুধ ঢেলেছি ঢেলেছি গঙ্গাজল—
রাস্তা এখানো কাদা হয়ে আছে।
পাতায় ফুলে ওখানটা গেছে পিছল হয়ে।

কবি

পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছ মাটি!
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা ; দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।

তৃতীয়া

আর ওরা— যাদের নাম করতে নেই?

কবি

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,

সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা

প্রথমা

তার পরে হবে কী।

কবি

তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।
এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না ;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

জয়, মহাকালনাথের জয়!

৮৫.৬ সারাংশ

ধনিকদের আশঙ্কা অনতিবিলম্বে বাস্তবায়িত হয়। 'চর' এসে জানায় 'গোল বেধেছে শূদ্রপাড়ায়'—অর্থাৎ ওরা জেগেছে। শাস্ত্রবিশ্বাসীরা এ জাগরণকে বিশ্বাস করতে পারেনা। কিন্তু মন্ত্রীমশায় এ উত্থান অবধারিত মেনে একে 'প্রলয়' এবং 'যুগান্তর' আখ্যায়িত করে বলেন—"নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়। বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।" অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত শক্তির একাধিপত্য ধ্বংস করে নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই হল প্রলয় বা বিপ্লব। পুরোহিত (ব্রাহ্মণতন্ত্র), ক্ষত্রিয় (রাজতন্ত্র) ও বণিক (ধনতন্ত্র)-এর শাসন অবসানের জন্যই শূদ্র (শ্রমজীবী)-দের জাগরণ। এটাই বিপ্লব, এটাই যুগান্তর।

পুরোহিত-সৈনিকরা মানতে চাইলনা। তাদের সমস্ত বাধা অস্বীকার করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে শূদ্রেরা মহাকালনাথের জয়ধ্বনি দিয়ে রশি ধরে টান দেওয়া মাত্র রথ চলতে থাকে তার প্রচলিত পথ ধরে নয়। রাজপথ ছেড়ে এবার জনপদের দিকে এগিয়ে চলে—অসমতলকে সমতল করে দেবার লক্ষ্যে।

শঙ্কিত, বিপর্যস্ত পুরোহিত, ক্ষত্রিয় ও ধনিকের দল নিজ নিজ শক্তির আধার মন্দির, অস্ত্রাগার ও ধনভাণ্ডার রক্ষার জন্য রথের গতিরোধ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে।

এমনি সময় কবি উপস্থিত হলেন। সত্যদ্রষ্টা কবির কাছে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার মূল কারণ জানবার জন্য সকলে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। কবি যা বললেন তা হল—এতদিন সমাজ যারা চালাতেন তাঁরা অভিজাত শ্রেণির, তাঁরা রথের চূড়োর দিকটাই দেখতেন। নিচের দিকে তাকিয়ে দড়ি অর্থাৎ মানুষে মানুষে সে সম্পর্ক বন্ধন সেটি দেখতেন না। ফলে দড়ির বাঁধন হয়েছে আল্‌গা, টানে জোর আসেনি, রথও চলেনি। আজ শূদ্রের মিলিত শক্তি মহাকালের রথ চলাকে বাস্তবায়িত করেছে।

কবির কথা শুনে পুরোহিত সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন ওরা তো এতদিন ছিল অপাংক্তেয়, ওরা দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে কী? কবি জানান ওঁরা আত্মশক্তির প্রকাশের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে, তবে যতদিন ওদের শক্তির প্রকাশে সংযম ও সুষমা থাকবে ততদিন গতি হবে স্বচ্ছন্দ। ব্যতিক্রম ঘটলে আসবে উল্টোরথের পালা। তখন আবার 'নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া'।

৮৫.৭ অনুশীলনী ১

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) "ভরা ফসলের খেতে বাসা বেধেছে উপবাস."
বলেছেন— প্রথম নাগরিক/সন্ন্যাসী/মন্ত্রী।

(খ) "মহাকালের পাণ্ডা ব'সে মাথায় হাত দিয়ে।"
বক্তা—দ্বিতীয়/প্রথম সৈনিক/দ্বিতীয় নাগরিক।

(গ) "চিরদিন রথ টানে ঐ ওরা—যাদের নাম করতে নেই।"
বক্তা—সন্ন্যাসী/পুরোহিত/তৃতীয় সৈনিক।

(ঘ) "কখনো বড়ো রাস্তায় চলতে পাই নি, তাই রাস্তা চিনি নে।"
বলেছেন—সৈনিক/দলপতি /নাগরিক।

(ঙ) "আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মান কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।"
বক্তা—কবি/সৈনিক/পুরোহিত।

২। "যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে।"—'যক্ষরাজ'-এর পরিচয় দিন। 'প্রায়োপবেশন' কথার অর্থ লিখুন।

৩। "তোমরা কেবলই করেছ ঋণ,
কিছুই কর নি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত। —বক্তা কে? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৪। "নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।" —বক্তা কে? 'প্রলয়' ও 'যুগান্তর'-এর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৮৫.৮ রথের রাশি ঃ রচনা, দেশকাল, নামকরণ

রচনা ও দেশকাল ঃ

'কালের যাত্রা' গ্রন্থে 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' দুটি রচনা সংকলিত। 'কবির দীক্ষা', 'শিবের ভিক্ষা' রচনার রূপান্তরিত রূপ। শেষোক্ত রচনার বক্তব্য শিবের ভিক্ষার মধ্য দিয়েই এসেছে "নব নব সম্পদ" শূন্যতার মধ্যেই আছে প্রাচুর্য। 'রথের রশি'তে এর আভাস আছে—সামান্যের মধ্যেই আছে অসামান্য।

'রথের রশি' সাংকেতিক নাটক। 'রথ' হল কালপ্রবাহ মহাকাল, 'রশি' মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বন্ধন। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের ঐকান্তিক সম্বন্ধ বন্ধনেই মহাকালের রথ চলে। এর ব্যত্যয়ে মহাকালের রথচক্র অচল। তাই সমাজে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের বাদ দিয়ে তথাকথিত উচ্চবর্ণের শক্তি আজ অসহায় ও পঙ্গু। এই পরিস্থিতিতে কেউ বলছে মন্ত্র পড়ো, কেউ বলছে জোর করো, কেউবা বলছে ধনিকদের ডাকো, টাকায় সব হবে। এলো পুরোহিত— মন্ত্র পড়লেন, সৈনিক চোখ রাঙালো, বণিকের স্বর্ণচক্র এলো। কিন্তু কিছু হল না। সবাই উদ্বিগ্ন। অবশেষে সমাজের যত অচ্ছুৎ শূদ্রের দল এলো, তাদের হাতের ছোঁয়ায় রথের দড়ি নড়ে উঠল। রথ চলল গড়গড়িয়ে, বাধা পথ ছাড়িয়ে নতুন পথে। নাটকে এইভাবে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির আনুকূল্যে রথের গতিলাভের ঘটনা, সমকালীন রাজনৈতিক বাতাবরণটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'কালের যাত্রা'র প্রকাশ ৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯, শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মদিনে। কবি তাঁকেই নাটকটি উৎসর্গ করেছেন। পুস্তিকার প্রথম রচনা 'রথের রশি'র পূর্বসূরী আছে—নাম 'রথযাত্রা' প্রকাশ প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সাল। সুতরাং রথযাত্রা ও রথের রশির সময়ের ব্যবধান ১৩৩০-১৩৩৯, ইং ১৯২৩—১৯৩২—৯ বৎসর। এই সময় ভারতবর্ষের রাজনীতি অসহযোগ আন্দোলনে উত্তাল। দেশের আপামর জনসাধারণকে নিয়ে সার্বিক আন্দোলনের যুগ। এসময় দেশে অর্থনৈতিক অসাম্য, শিক্ষা বিস্তারের অভাবে মধ্যযুগীয় জাতপাতের ধারণা শাসকশক্তির প্রবর্তনায় প্রবল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩১) ভাবী শাসননীতি ও সংবিধান নিয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় ইংরেজ সরকার বর্ণ ও ধর্ম ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক ভেদমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা সুপারিশ করে। এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal award) বিরুদ্ধে সমস্ত দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। গান্ধীজি আমরণ অনশনের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথ এইসব ঘটনা পরম্পরায় বিচলিত বোধ করেছেন। তিনি বলেন, "যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি, তারাই আমাদের সম্মুখপথে পদক্ষেপের বাধা।—ভারতবর্ষে মানুষোচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা পঞ্চিত করেছি, তাঁদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েছি।" রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ কিংবা অস্পৃশ্যতা-প্রথা সমাজে বিচ্ছেদকে বাড়িয়ে তুলছে। 'ব্রত উদ্‌যাপন' প্রবন্ধে বলেছেন, "মুক্তি সাধনার সত্যপথ, মানুষের ঐক্য সাধনায়।

রাষ্ট্রিক পরাধীনতা আমাদের সামাজিক সহস্র ভেদ বিচ্ছেদকে অবলম্বন করে পুষ্ট। জড়প্রথার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে উদার ঐক্যের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে, সেদিন আজ সমাগত।" দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও শেষ পর্যন্ত এটি উপলব্ধি করেছিলেন বলে সর্বসম্মত মীমাংসায় উপনীত হন (Puna Pact)।

এই পটভূমিকায় 'রথের রশি' প্রকাশ। নাটকটিতে স্বভাবতই দেশকালের ছায়াপাত ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ তথাকথিত অনুন্নতদের পক্ষে সে কথা দ্বিধাহীনভাবে এখানে ব্যক্ত করেছেন। ইতিহাসের মর্মসত্যটি বুঝেছেন, ব্রাহ্মণ্য শক্তি, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য রাজতন্ত্রের পর দেশ সমাজ নতুন যুগে শ্রমজীবী শূদ্রের দ্বারা শাসিত হবে। শূদ্র রাজতন্ত্র অনিবর্য। আজকের মতো বলো সবাই মিলে — যারা এতদিন ঘরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে। যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক এবার মাথা তুলে।"

সোভিয়েত বিপ্লব (১৯১৭) সম্পন্ন হবার পর, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণ (১৯৩০) করে এসেছেন। সেখানে দেখেছেন শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। ধনী, দরিদ্র সমমর্যাদায় সম-অধিকারে সেখানে প্রতিষ্ঠিত। কালের যাত্রায় এর প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।

কালের যাত্রার এই সত্যটি বিবেকানন্দের ভারত চেতনাতেও স্পষ্ট। 'বর্তমান ভারত'-এ তিনি দেশের দরিদ্র, পতিত ও নিরক্ষরের মধ্যে নূতন ভারতের সম্ভাবনা দেখেছেন। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বেরিয়ে আসুক চাষার পর্ণকুটীর, জেলে, মালা, মেথরের ঝুপরি, ভুনাওয়ালার উনুন, কারখানা, হাট, বাজার, ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজের শক্তির আধার-প্রজাপুঞ্জ। যেদিন সমাজের নেতৃবৃন্দ প্রজা সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। সেদিন তার পরাভব অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছেন, "ইহার পরে আর একটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে, মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তাহার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।"

এ থেকে বোঝা যায় 'রথের রশি' রচনায় সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রভাব সুস্পষ্ট। এদিক থেকে রচনাটিকে 'রবীন্দ্রনাথের— পুরাপুরি পোলিটিক্যাল নাট্যরচনা' বলা যায়। এ নাটকে বর্তমান যুগের সামাজিক সাম্যের কথাটি ব্যক্ত হয়েছে।

নামকরণ ঃ

যেকোনো শিল্প সৃষ্টিই সাধারণত বিশেষ নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এর গৌণ উদ্দেশ্য শিল্পকর্মটিকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা ; কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য নিগূঢ় ও অর্থবাহী। নাটকের নামকরণে প্রচলিত ত্রিবিধ রীতির যেকোনো একটিকে প্রায়শ প্রয়োগ করতে দেখা যায়। রীতিত্রয়— বিষয়বস্তু, চরিত্র ও ভাববস্তুর ওপর নির্ভরশীল। আর নাটক যেহেতু বস্তুনিষ্ঠ শিল্পকর্ম তাই নাটকের নামকরণে প্রত্যক্ষতা, সংক্ষিপ্ততা ও স্পষ্টতা থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্তমান নাটকের ভাববস্তুটি মুখ্য প্রতিপাদ্য এবং তা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হওয়ায় এর নামকরণটিও ব্যঞ্জনাধর্মী।

নাট্য পুস্তিকাটির নাম 'কালের যাত্রা' হলেও, এ নামে কোনো নাটক নেই। গ্রন্থভুক্ত দুটি রচনা স্বতন্ত্র

নামাঙ্কিত— 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা'। নামকরণ বিচারকালে, তাই আমাদের সমগ্র বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

বিপুলা এই পৃথিবী এবং কালও নিরবধি। মহাকালের রথচক্র নিয়ত বহমান। পৃথিবীর যা কিছু দ্যোতমান বা প্রকাশমান তার সমস্তই কালের সঙ্গে একটি নিত্য সম্পর্কে আবদ্ধ। কোনো খণ্ড দৃষ্টি দিয়ে দৃশ্যমান জগতের কোনো কিছুকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করলে মহাকাল তাকে গ্রহণ করে না। কালের রথচক্র স্তব্ধ হয়ে যায়। 'কালের যাত্রা'র দুটি রচনায় রথচক্রের চলার মর্ম সত্যটি উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে— সমাজের গরিষ্ঠ জনদের উপেক্ষা করলে সংসারের রথ চলে না, তাঁদের শুভ সম্মেলনে 'কালের যাত্রা' পথ সচল হয়। এই বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা প্রবন্ধে, গল্পে, নাটকে ইতোপূর্বে উপস্থিত করেছেন, এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করতে পারি। 'কালর যাত্রা' বস্তুত নবযুগের বার্তাবহ—'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' তারই ভাষ্যকার।

'রথের রশি'র একটি পূর্বসূরী আছে, নাম 'রথযাত্রা'। শেষোক্ত রচনাটি সাধারণ গদ্যে লেখা। দুটি রচনার বিষয়বস্তু এক হলেও পরিবর্তনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যঞ্জনার পার্থক্য আছে। 'রথযাত্রা'য় রথের গুরুত্ব ছিল বেশি, আর 'রথের রশি'তে 'রশি' কথাটির ব্যঞ্জনাই মুখ্য। রবীন্দ্রনাথ নিজে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—"রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেল মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষ ভাবে পীড়িত করেছে, অপমানিত করেছে ; মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে। তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।" অর্থাৎ মহাকালের রথ চলবার পূর্বশর্ত মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বন্ধনের প্রসার। এ মানুষ ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ—এখানে, এতদিন যারা অপমানিত অবহেলিত শূদ্রজন বলে উপেক্ষিত হয়ে আসছিল, তাঁদেরও সবার নিমন্ত্রণ। মহাকালনাথের আনুকূল্য ওই গরিষ্ঠজনদের প্রতি। 'কালের যাত্রা'য় ব্যঞ্জিত এই বার্তাটি 'রথের রশি'তে মূর্ত ; সেদিক থেকে এ নামকরণটি সঙ্গতিপূর্ণ।

'কবির দীক্ষা' 'শিবের ভিক্ষা' নামে পূর্বে প্রকাশিত। রচনাটি নাট্য রসসিক্ত কাব্য হলেও উপস্থাপিত বক্তব্য ব্যঞ্জনায় 'কালের যাত্রা'র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'শিব' কল্যাণের মঙ্গালের দেবতা ; শিবের ভিক্ষায় মঙ্গালের সত্যাদর্শটি উপস্থাপিত করতে চাওয়া হয়েছিল। 'কবির দীক্ষা'র কবি সেই শৈব মন্ত্রে বিশ্বাসী— 'কালিদাস ছিলেন শৈব। সেই পথের পথিক কবিরা।' এ কবি ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দেন, যার আদর্শ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী শিব—যিনি মহত্ত্ব দিলেন, জগতের দরিদ্রকে—'দারিদ্র্য তারই মহত্ত্ব মহৎ যিনি ঐশ্বর্য্যে।' কবির দীক্ষায় এই ভাবে ত্যাগ ভোগ ঐশ্বর্য মহত্ত্ব মৃত্যু ও প্রাণের বার্তা সমগ্রের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এদিক থেকে রচনাটি 'কালের যাত্রা'র মন্ত্রধ্বনির সগোত্র। কেন না বক্তব্য তো সর্বত্রই এক—জনশক্তি ও আত্মশক্তির উদ্বোধনেই 'কালের যাত্রা' সম্ভব ও সার্থক। 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা'র ব্রাত্যজনের

প্রতিভূ কবি এই বার্তা সকলকে পৌঁছে দিয়েছেন। বক্তব্য সাম্যে চরণাদ্বয় 'কালের যাত্রা'য় অন্তর্ভুক্তি সঙ্গত ও মূল পুস্তিকাটির নামকরণ সার্থকতর করে তোলবার পক্ষে সহায়ক।

৮৫.৯ সারাংশ

১৩৩০-এ শরৎকালে 'রথযাত্রা' রচনা প্রকাশ প্রবাসী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ইংরাজি ১৯৩০-এ প্রকাশিত। 'রথযাত্রা'র পরিবর্তিত রূপ 'রথের রশি' ১৩৩৯ সালে 'কালের যাত্রা' গ্রন্থে 'কবির দীক্ষা সহ সংকলিত। ১৩৩০-এর প্রবাসীতে 'রথযাত্রা' প্রকাশের সমকালে 'সমস্যা' এবং 'সমাধান' নামে দুটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন। সেখানে তিনি সামাজিক ভেদবুদ্ধি সামাজিক মঙ্গলের প্রধান বাধা মনে করেছেন। 'রথের রশি' নাটকটিতে কবির সমাজ-মানসের উপরোক্ত ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন সমাজ যখন ব্রাহ্মণ পুরোহিত, ক্ষত্রিয় ও ধনিক শ্রেণি শাসন করছে তখন তারা নিজের ক্ষমতার আধার রূপ মন্দির অস্ত্রাগার ও ধনভাণ্ডার রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্যই ব্যস্ত থেকেছে। প্রজা সাধারণ যাঁরা সম্পদ সৃষ্টি করে, যাঁদের সংখ্যাধিক্য, যাঁরা সমাজ-সংসার যাত্রাকে নির্বিঘ্ন করে, তাঁদের দিকে তাকিয়েও দেখে না। এই যে হৃদয় সম্পর্কের শৈথিল্য, এটিই কালক্রমে সমাজের চলার পথকে করে দুর্গম ও দুর্বহ। মহাকালের রথচক্র অচল হয়ে পড়ে। 'রথের রশি'কে এদিক থেকে মানবসমাজ প্রবাহের অগ্রগতির কাহিনী বলা যেতে পারে।

'রথের রশি' রচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া দর্শনের (১৯৩০) অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমকালীন জীবন, সমাজ ও সময়-চেতনাও সক্রিয় ছিল মনে হয়। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সে সময় হিন্দু মুসলমান ভেদ ছাড়াও বর্ণহিন্দু, অনুন্নত সম্প্রদায় ভেদব্যবস্থা তীব্র দ্বন্দ্ব চলছে। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে দেশময় প্রতিবাদের ঝড় বইছে। এসময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত যে কবিতায়, প্রবন্ধে ও নাটকে প্রকাশ করেছেন 'রথের রশি' তার মধ্যে অন্যতম। 'রথের রশি' নামকরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—মানবসমাজের সবচেয়ে বড় দুর্গতি কালের গতিহীনতা। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বন্ধন রূপ রশিতে ভর করে কালের রথ চলে। সেই বন্ধনে গ্রন্থি পড়ায় মানব সম্বন্ধ দুর্বল হওয়ায় রথ চলছেনা। আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন, যাঁরা এতদিন মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেছে। তাদের অসম্মান ঘুচলে, সমাজের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে। মানব সমন্বয়ের এই রূপটি 'রথের রশি' নামকরণের সাহায্যে নাট্যকার বোঝাতে চেয়েছেন।

৮৫.১০ অনুশীলনী ২

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) 'কালের যাত্রা' গ্রন্থে —— ও —— দুটি রচনা।

(খ) 'রথের রশি'র পূর্বসূরী আছে —— নাম ——, প্রকাশ —— সাল।

(গ) তিনি বুঝেছেন ব্রাহ্মণ্য শক্তি, —— ও বৈশ্য রাজতন্ত্রের পর দেশ —— নতুন যুগে শ্রমজীবী —— দ্বারা শাসিত হবে।

(ঘ) "যারা যুগে যুগে ছিল —— হয়ে, তারা —— একবার —— তুলে।"

২। 'রথের রশি' রচনার রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। 'রথের রশি' নামকরণের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৮৫.১১ 'রথের রশি' নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে যেমন দুটো ভাগে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ আছে তেমন তাঁর নাটকের চরিত্রগুলোকে দুভাগে সাজানো যেতে পারে। তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে যে সমস্ত চরিত্র, তারা প্রত্যেকে বিশেষ ব্যক্তি, সেই হিসেবে বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বিশেষ বিশেষ নামে তারা চিহ্নিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক নাটকগুলির মধ্যে তত্ত্বমূলক (রূপক ও সাংকেতিক) নাটকগুলোতে এমন এক শ্রেণির চরিত্র আছে যারা নির্বিশেষ ; বিশেষ ব্যক্তি নয়, তাই নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের হদিস পাওয়াও যেমন যায়না, তেমনি নির্দিষ্ট নামের নামাবলী তাদের গায়ে চাপানো থাকেনা। আবার এই ধরনের চরিত্রেরা রবীন্দ্র নাটকে বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত নয়। তাঁর রূপক সাংকেতিক নাটকগুলি যেমন একটা তত্ত্বকে ব্যক্ত করে, বিশ্লেষণ করে, এবং রূপায়িত করে—অর্থাৎ যে আইডিয়া বা ভাব অধরা, অ-রূপ বিশিষ্ট, তাকে রূপ দেওয়ার ঐকান্তিক অভিপ্রায়টা প্রাধান্য পায়—সেটা যেমন একাধিক নাটকে এসে পড়ে, পরিবর্তিত আঙ্গিকে ঠিক তেমনই চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ঘটে যায়। তাই অনিবার্য ভাবে চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে এসে পড়ে পৌনঃপুনিকতা। তবে তার অর্থ এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল প্রতিভার সীমাবদ্ধতা এ হেতু। আসলে এটা একটা অতৃপ্তিজনিত সৃষ্টিশীল চেষ্টার অবিরত প্রক্রিয়া, একটি ভাবের শিল্পসম্মত প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে যে চরিত্রটিকে তিনি সৃষ্টি করলেন, অপর একটি ভাববিশিষ্ট নাটকে হয়ত তিনি দেখতে পেলেন, পূর্ব নাটকের চরিত্রটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, তাই সেই চরিত্রটি নাম বদলিয়ে বা একই নামে এসে গেল পরিপূর্ণ হয়ে ওঠবার জন্য। কিংবা তিনি যখন বুঝলেন, পূর্বের কোনো নাটকে চরিত্রটিকে যে ভাবে দেখান হয়েছে, তাতে চরিত্রের প্রতি একপেশে মনোভাবের আরোপ হয়েছে, তাই, পরবর্তী কোন নাটকে সেই চরিত্রটিকে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো প্রসঙ্গে স্থান দিয়ে পূর্বের ফাঁকটুকু পূরণ করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। এই কাজ বিশিষ্ট চিন্তাশীল এবং অবিরত সৃষ্টিশীল শিল্পী সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে একই চরিত্রের হদিস পাওয়া যায়। কিন্তু একথা ঘুণাক্ষরে মনে স্থান দেওয়ার অবকাশ নেই যে একই ব্যক্ত, একই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে একই বক্তব্যকে ব্যক্ত করবার জন্য বিভিন্ন নাটকে বার বার এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের আর একটা জিনিস বুঝবার আছে ; এক শ্রেণীর নাটক, যাকে আমরা আইডিয়া অর্থাৎ ভাবপ্রধান বা তত্ত্বপ্রধান নাটক বলছি, তাতে যেমন ভাবের বিমূর্ত প্রকাশ ঘটেছে বিচিত্র রকম সংলাপের অবয়বে, তেমনই সেই ধরনের নাটকের চরিত্রেরাও হয়ে গেছে বিচিত্র রকম। এরা কোনো ব্যক্তি নয়,

এক একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণীর প্রতিনিধি। নামের মধ্যে ব্যক্তির পরিচয়। কিন্তু নামহীন চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তি নয় গোষ্ঠীর পরিচয়, গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব প্রকাশিত হয়। আমরা আমাদের আলোচ্য নাটক 'রথের রশি'তে এ ধরনের চরিত্রের দেখা পাই। প্রথাভিত্তিক বা গতানুগতিক নাট্যকর্মে এধরনের চরিত্র দেখা যায়না। দুটি বা একটি 'রিপ্রেজেন্টেটিভ' চরিত্র হয়তো কোনো কোনো নাটকে থেকে থাকে, তবে গোটা একটা নাটক এই রকম চরিত্র দিয়ে রচনা করা সহজ ব্যাপার নয়। যেটা সহজ, সে পথে সকলের আনাগোনা, রবীন্দ্রপ্রতিভা সেই বহু পদক্ষেপ চিহ্নিত পথ চিরকাল পরিহার করে চলেন। নিত্যনৈমিত্তিকতার বিবর্ণ চিন্তা ভাবনার দ্বারা কখনো তিনি প্রভাবিত হননি। সহজ, অথচ বহুজনের দৃষ্টিবহির্ভূত বিষয়কে শিল্পসম্মত করে তোলবার জন্যই রবীন্দ্রপ্রতিভার নিরলস প্রয়াস। কি কাব্যে, কি গল্প উপন্যাসে, কি নাট্যসাহিত্যে সেই প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। 'রথের রশি' নাটকের চরিত্র পরিকল্পনা আমাদের এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে রায় দেবে। নাট্যসাহিত্যে এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি নিঃসন্দেহে অভিনব।

'রথের রশি' নাটকে এগারটি প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র আছে। এরা হল মেয়ের দল, সন্ন্যাসী, নাগরিকবৃন্দ, সৈনিকবৃন্দ, ধনপতি ও তার অনুচরবর্গ, মন্ত্রী, চর, শূদ্রদল, পুরোহিত ও কবি। চরিত্রগুলির নামকরণ থেকে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে এরা কোনো নামাঙ্কিত চরিত্র নয়, নির্বিশেষ এবং শ্রেণী চরিত্রের প্রতীক। মেয়েরা সরল, স্বল্প বুদ্ধির অধিকারিণী, সংস্কারাচ্ছন্ন, প্রথাভিত্তিক পথে চলতে তারা অভ্যস্ত। মহাকালের রথচক্র গতি হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাতে তারা ভয়ার্ত। রথ টানে যে রশি, তাতে তারা ভক্তি উজাড় করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। 'দ্বিতীয়া— বুঝেছি আমাদের পূজো নেবেন ব'লে হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন দড়ি-দেবতা/পুজো পেলেই হবেন তুষ্ট।' তাই দড়ি-দেবতার উদ্দেশ্যে নানারকম ভক্তিগদগদ সংলাপ উচ্চারণ করে যায় তারা। বিচিত্র রকম মানত করে দড়ি-দেবতাকে তুষ্ট করতে চায়। দড়ি-দেবতাকে প্রসন্ন করে তুলবার জন্য দ্বিতীয়া পুনরায় বলে, 'লো, ঢাল্ ঢাল্ ঘি, ঢাল্ দুধ, গঙ্গাজলের ঘটি কোথায়, ঢেলে দে-না জল / পঞ্চগব্য রাখ্ ঐখানে, জ্বালা পঞ্চপ্রদীপ।' কিন্তু তাদের এই ভক্তি রথের চাকায় গতি সঞ্চার করতে পারেনা। তারপর তারা সন্ন্যাসীর কথায় প্রভাবিত হয়ে দড়ি ছেড়ে, রাস্তা ঠাকুরের পুজো দিতে প্রস্তুত হয়, 'চল্ ভাই, তবে পুজো দিইগে রাস্তা-ঠাকুরকে।' এই ভক্তি তাদের একান্ত সংস্কারাচ্ছন্ন মনের অভিব্যক্তি। প্রাণহীন শব্দভাণ্ডার মাত্র। দড়ির মাহাত্ম্য বুঝতে তারা অক্ষম। প্রাণের সঙ্গে বন্ধন ঘটায় যে প্রীতি রজ্জু, তার পরিচয় থেকে তারা বঞ্চিত। সমাজে একদল অচ্ছুৎ থাকে, দেবতার দরজার দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করবে এই প্রথা বা সংস্কারকে মেনে নিয়ে শুধুমাত্র কতগুলো পুজোপকরণ নিক্ষেপ করে জগতের গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখবার পক্ষপাতী তারা। আবার এই সংস্কারের ব্যতিক্রম ঘটবার সময়ে তারা আহত হয়। প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। 'এ হল কী' ঠাকুর/তোমরা এতদিন আমাদের কী শিখিয়েছিলে। দেবতা মানলে না পুজো, ভক্তি হল মিছে। মানলে কি না শুদ্দুরের টান, মেলেচ্ছের ছোঁওয়া! ছি ছি, কী ঘেন্না।'

এই হল 'রথের রশি' নাটকে অঙ্কিত মহিলা চরিত্র। আমরা বলেছি এরা প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। এরা প্রতিনিধিত্ব করেছে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত, সংস্কারাচ্ছন্ন, প্রাণহীন ভক্তি সর্বস্ব গ্রাম্য

নারীসমাজের। রবীন্দ্র সাহিত্যে অঙ্কিত সমস্ত নারীর মূল্যায়ন এই নিরিখে করা যাবেনা একথা বলা বাহুল্য।

সন্ন্যাসী চরিত্রটি এই নাটকে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের বোধের বন্ধ দরজায় আঘাত করে জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছে মনুষ্যত্বকে। যে মনুষ্যত্ব অন্ধসংস্কার, শক্তি দম্ভ, অর্থের ঔদ্ধত্যের তলায় চাপা পড়ে আছে, তাকে জাগিয়ে দেওয়ার ভূমিকা পালন করেছে। মানুষ যে উপরোক্ত অমনুষ্যোচিত বৃত্তির প্রবল প্রভাবে বিচ্ছিন্ন—সংস্কার, ঔদ্ধত্য, দম্ভ, আর রীতিসর্বস্বতা যে মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করতে পারেনি, তাইতো আজ মহাকাল ক্রুদ্ধ হয়ে গেছেন এই ইঙ্গিতটুকু তিনি পরিবেশন করে গেছেন। চরিত্রটি প্রথাভিত্তিক ; নিয়তি বা বিবেকের পথ ধরে 'রথের রশি' নাটকে সন্ন্যাসী রূপ নিয়েছে।

বস্তুত সন্ন্যাসী বা তজ্জাতীয় চরিত্র রবীন্দ্র নাটকের অন্যতম বিশেষত্ব। অনুরূপ চরিত্রের আভাস 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার কালেই পরিস্ফুট। এ শ্রেণীর চরিত্র বিষয়নিস্পৃহ সত্যদর্শী বাউলের সমগোত্রীয়। রবীন্দ্র নাটকে এরা কখনও দ্বিধাবিভক্ত কখনও বা অখণ্ড রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। রথের রশিতে 'কবি' সন্ন্যাসীর পরিপূরক।

নাগরিকবৃন্দ কর্মীর দল। নগরবাসী সাধারণ মানুষ। নারী-পুরুষের ভেদাভেদ বজায় রেখে চলবার মানসিকতা পোষণ করে। সেই সঙ্গে সমাজে বর্ণবৈষম্য মেনে চলবার পক্ষপাতী। তাই তারা শূদ্র জাগরণকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। সমাজে যারা অচ্ছুৎ অপাঙ্‌ক্তেয় বর্ণের বিচারে নিম্ন জাতীয় তারা অন্যান্য উচ্চবর্ণের ক্রিয়াকর্ম করবে এটা মেনে নিতে এতাবৎ কালের সযত্নলালিত সংস্কারে ধাক্কা লাগে। তাই তারা বলে, 'সেই শূদ্ররা শাস্ত্র পড়ছেন আজকাল, হাত থেকে কাড়তে গেলে বলেন, আমরা কি মানুষ নই।' তারা মনে করে শূদ্রের দেবালয়ে ঢোকবার সঙ্কল্প, এক ঘাটে নাইবার বাসনা প্রভৃতি অনাসৃষ্টির কারণ। নাগরিকদের বিশ্বাস, এই সব কারণে পথ চলছে না। 'এর পরেও রথ যে চলছে না, সে আমাদের প্রতি দয়া করে। চললে চাকার তলায় গুঁড়িয়ে যেত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।' এই শূদ্র জাগরণকে তারা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেনা, 'আজ শূদ্র পড়ে শাস্ত্র, কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ। সর্বনাশ!' তবে বিভিন্ন লোকপরম্পরায় তারা যুগের প্রবণতাকে ধরতে পারে। বুঝতে পারে এই কলিযুগে শাস্ত্র এবং শস্ত্র দুটোই অকেজো, 'চলে কেবল স্বর্ণচক্র'। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলে। রবীন্দ্রনাট্যে এই নাগরিকবৃন্দ এক বিশেষ সৃষ্টি। এরা কোনো কোনো নাটকে জনতা হিসেবে এসে পড়ে। অদ্ভুত এই চরিত্র সৃষ্টি। বুদ্ধি বিবেচনাহীন এই নাগরিকবৃন্দ অর্থাৎ জনগণ—রবীন্দ্রনাথ যাদের জনগণ বলেছেন ; বিশাল দেহ, মনুষ্যোচিত সব উপকরণের অধিকারী, কিন্তু মস্তকটি মস্তিষ্কহীন ক্ষুদ্র—তাই অন্যান্য শক্তিমান, বুদ্ধিমানদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে জীবন-পথ পরিক্রমণ করে চলে।

'রথের রশি' নাটকে সৈনিকবৃন্দ ক্ষত্রশক্তির লালন-পালনকারী হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে। এরাও শূদ্র জাগরণের বিরুদ্ধে। তাই শূদ্ররাও মানুষ এই কথা শুনবার পর তাদের ক্ষত্রবীর্যে আঘাত লাগে। আস্ফালনে ফেটে পড়ে তারা, 'চল্-না ওদের পাড়ায় গিয়ে [illegible] করে আসি— ওরাই মানুষ না আমরা।' তবে

ক্ষত্রসূর্য যে অস্তাচলে চলে গেছে সেটা তারা বোঝে, তার পরিবর্তে বণিক তন্ত্র মাথা তুলেছে, এবং এদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে না চললে টিকে থাকা যাবেনা, সে বোধ তাদের আছে। কিন্তু তাই বলে শুদ্র আধিপত্য মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী তারা নয়। বরং এই জাগরণের বিরুধ্বে দাঁড়াতে তারা তৎপর। তার জন্য শূদ্রদের সঙ্গে যে কোনো রকম সংঘর্ষে যেতে তারা দ্বিধা করেনা। শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের কৌলিন্য বজায় রেখে চলতে চেয়েছে।

ধনপতির দল বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। এরা বুঝতে পারে একটা যুগান্তর আসন্ন। যেমন ভাবে পুরোহিত তন্ত্র তার রীতি সর্বস্বতার জন্য ধ্বংস-হয়ে গেছে, যেমন ভাবে ক্ষত্রিয়রা কালের ভ্রুকুটিতে নিষ্ক্রিয় পদার্থে পরিণত হয়েছে, তেমন ভাবে তারাও কেবল চাকায় তেল দিয়েছি, রশিতে টান দিই নি।'— কিন্তু তাদের টানেও রথ চললনা। অহংবোধে ঘা লাগল। বললে 'এবার উপায় বের করবেন স্বয়ং মহাকাল।' এই মহাকালের পথ ধরেই নিম্নবৃত্তিতে নিযুক্ত শুদ্র সম্প্রদায় মাথা তুলে দাঁড়াল। বণিক সম্প্রদায় তখন বুঝতে পেরেছে, 'আজ যারা চোখে পড়ে না কাল তারা দেখা দেবে সব চেয়ে বেশি।' তাই তারা নিজেদের ঘর সামলাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে, 'ওহে খাতাঞ্চি, এইবেলা সামলাওগে খাতাপত্র—কোষাধ্যক্ষ, সিন্ধুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।'

মন্ত্রী এই নাটকে রাজার প্রতিনিধি। রথ চলছে না, তাই তিনি চিন্তিত। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-ক্ষত্রিয়-সৈনিকেরা রথ চালাতে পারলনা, মেয়েদের ভক্তি ও পূজা-অর্চনা রথের চাকায় গতি সঞ্চার করতে পারলনা। সর্বশেষ ডাক পড়ল ধনিক-বণিকদের। শেঠজিকে ডেকেছেন রাজা। সবাই আশা করছে, তাঁর টানেই রথ চলবে। তাঁরা রথ চালাবার চেষ্টা করলেন। মন্ত্রীর কথায়, 'অন্য সব শক্তি আজ অর্থহীন, / তোমাদের অর্থবান হাতের পরীক্ষা হোক।' কিন্তু সে চেষ্টাও কার্যকরী হল না। মহাকালের রথচক্র একটুও নড়ল না। মন্ত্রীর কাছে ইত্যবসরে খবর এলো শূদ্রের দল আসছে রথ চালাতে। তখন তিনি বুঝতে পারলেন একটা প্রলয় অনিবার্য। যে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে একটা যুগান্তর ঘটে যাবে। 'নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, / বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।' তিনি স্বাগত জানালেন শূদ্রদের, 'সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই, / তোমরা নারায়ণের গরুড়। / এখন তোমাদের কাজ সাধন করে যাও তোমরা।' তবে তিনি এই অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানালেও, একথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না, যে এই অভ্যুত্থান যেন ধ্বংসাত্মক না হয়, 'কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো। ... পোড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।' শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীও ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রথের রশি টানবার জন্য প্রস্তুত হন, 'যাব ওদের সঙ্গে রশি ধরতে।' সৈনিকবৃন্দ ছি-ছি করে উঠল, মন্ত্রীমশায় সত্যকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, 'ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ। স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন। এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদেরই সঙ্গে সমান হয়ে। সত্যদ্রষ্টা মন্ত্রীমশাই-এর যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মধ্যে মহামিলনের বার্তাটি সুস্পষ্ট। সমস্ত রকমের অভিমান বিসর্জন দিয়ে সর্বহারা মানুষদের সঙ্গে মিলে এক হয়ে চলাটাই যুগধর্ম। এই যুগধর্মকে মেনে নেওয়ার মধ্যেই মন্ত্রীমশাই-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে।

সবশেষে এই নাটকের বিশিষ্ট চরিত্র কবি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। কবি প্রজ্ঞাবান, সত্যদ্রষ্টা।

এই জগৎ সংসার একটা ছন্দে লয়ে, তালে আবর্তিত হয়ে চলেছে। এই ছন্দের পতন ঘটলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রলয় ঘটে যাবে। বিশ্বজনের সমবেত চেষ্টায়, সকলের সম্মিলিত ঐক্যবোধে এই জগৎ সংসারের তাল ও ছন্দ রক্ষিত হয়। কাউকে ছোট করে নয়, কাউকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দূরে সরিয়ে রেখে জগতের গতিছন্দকে বজায় রাখা যাবেনা। সত্যদ্রষ্টা প্রজ্ঞাবান কবি সেটা জানেন। তিনি বুঝতে পারেন রথ চলছে না। এই জন্যে যে, ওরা 'রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ। মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে-বাঁধন তাকে ওরা মানেনি।' তাই 'রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে লেজ আছড়াচ্ছে—দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।' কবি বুঝতে পেরেছেন আগামী দিনে নিম্নবৃত্তিতে নিযুক্ত চাষী, তাঁতি ইত্যাদি শ্রমজীবী মানুষের জয় হবে, 'জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের। তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।'

কবি সুন্দরের পূজারী। তাই অন্তরের তালমানের ওপর বিশ্বাসী। জগতের ছন্দ ও তাল রক্ষা করার ওপর তাঁর ভরসা। তাঁর মতে যা ভয়ঙ্কর, যা দৈহিক শক্তিজাত তা অসুন্দর এবং কুৎসিত। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বব্যাপারে শক্তি নেহাতই গৌণ, মুখ্য বিষয় হল প্রেম প্রীতি। অস্ত্রের কঠোরতা, শাস্ত্রের কঠোরতা প্রীতি আনেনা, আনে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা। তখনই জগৎটা হয়ে পড়ে তাল ছন্দহীন অসুন্দর। তখনই এসে পড়ে এক চরম সংকট। সেই সংকটের মুহূর্তে, 'যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।' এই যুগ-সংকটের মুখে কবি নিজের ভূমিকা নিজেই ব্যক্ত করে, 'আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।... যারা টানছে রথ তারা পা ফেলবে তালে তালে।' জগৎ সংসার চলবে নিয়মিত এক সুন্দর গতিছন্দে বিভোর হয়ে। তিনি মেয়েদের বুঝিয়ে দেন তাদের ভক্তিও ভক্তি নয়, নইলে পূজা অর্চনা রথচক্রে গতি সঞ্চার করতে পারল না কেন? কবি তাদের অভিযোগের উত্তর দিলেন স্পষ্ট ভাষায়, 'পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছ মাটি! রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে। সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা; দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে। সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।' তাই সত্যদ্রষ্টা প্রজ্ঞাবান কবি ঘোষণা করেন, 'এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন... রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না; রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে। আজকের মতো বলো সবাই মিলে... যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে, যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।'

কবি চরিত্র এই নাটকে কোনো ব্যক্তি নয়, একটি তত্ত্ব। একটি প্রতীক। সম্মিলনের তত্ত্ব, মিলনের প্রতীক। যে আদর্শের মাধ্যমে জগৎ-সংসারে সমন্বয় সাধিত হবে তারই প্রতীক। এই সূত্রে আমরা বলতে পারি কবি একটি আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে এমনই একটি আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করে চলছিলেন; রথের রশি নাটকে তারই নাট্যরূপ লাভ ঘটেছে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ বিরল দৃষ্টান্ত। সে কথা আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকেও সে কথা প্রণিধানযোগ্য। চরিত্র সৃষ্টির এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং একান্ত রাবিন্দ্রিক। 'রথের রশি' নাটিকায় নারী চরিত্রগুলি অত্যন্ত বাস্তব। তাদের হাবভাব চলন বলন তাদের রীতিনিষ্ঠতা এবং সংস্কারপ্রিয়তা সবটাই বাস্তবানুগ। একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে তিনি গ্রাম্য পরিবেষ্টনী থেকে এই সকল চরিত্রগুলোকে নাটকে তুলে এনেছেন। একই ভাবে

নাগরিকদের সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথের একটা নিজস্ব সৃষ্টিশৈলী আছে। যাকে রাবিন্দ্রিক ধাঁচ বলা যেতে পারে। সেই ধাঁচে পড়ে চরিত্রগুলো বাস্তবের হয়েও একটা ভাব পরিমণ্ডলের আচ্ছাদনের অন্তরালবর্তী। সৈনিকবৃন্দ সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। শূদ্র সম্প্রদায়ের দলপতিও উপরোক্ত বিচার বিশ্লেষণ থেকে বাদ যায়না।

৮৫.১২ সারাংশ

'রথের রশি' রূপক সাংকেতিক নাটক। এই শ্রেণীর নাটকের চরিত্রগুলিও রূপক / সংকেত আশ্রয়ী। 'রথের রশি'র চরিত্রগুলির একটি করে প্রতীকী রূপ আছে। এ নাটকের মন্ত্রী, ধনপতি, পুরোহিত এবং সৈনিক যথাক্রমে রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র এবং ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই উপস্থাপনার সাহায্যে নাট্যকার দেখিয়েছেন বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত অভিজাত গোষ্ঠী কিভাবে তাদের বুদ্ধি, অর্থ, শস্ত্র ও শাস্ত্রবলে রাষ্ট্রশাসন করতে গিয়ে সংকট তৈরি করেন। আর এই সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল জনগণের সম্মিলিত শক্তির সাহায্য। তত্ত্বপ্রধান নাটক 'রথের রশি'তে এই চরিত্রগুলি ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হয়নি। এরা এক একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণীর প্রতীক। মেয়ের দল, সন্ন্যাসী, নাগরিক, ধনপতি, মন্ত্রী, পুরোহিত, কবি প্রভৃতি পরিচয় থেকে চরিত্রগুলি নির্বিশেষ শ্রেণী চরিত্রের প্রতীক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই গোষ্ঠী চরিত্রগুলির প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত নয়। গোষ্ঠী থেকে কোনো চরিত্রই ব্যক্তিতে মুক্তি পায়নি— এটা লক্ষণীয়।

৮৫.১৩ 'রথের রশি' নাটকের ভাষা

নাটক প্রত্যক্ষ ও দর্শনযোগ্য শিল্প। বর্ণনা বা বিশ্লেষণের জায়গা এই শিল্পকর্মে নেই। পাত্র-পাত্রীর মুখের কথায় টানাপোড়েনে বক্তব্য বিষয় চলে এগিয়ে। পাত্র-পাত্রীর মুখের কথাকেই বলা হয় সংলাপ। সুতরাং নাটক সংলাপ নির্ভর। সংলাপ বিভিন্ন রকম হয়। সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের সংলাপের ভিন্নতা অনস্বীকার্য। বস্তুত বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যই এদের সংলাপের ভিন্নতার জন্য দায়ী। উপরোক্ত যে তিন রকম নাটকের কথা বলা হল, তার সংলাপ থেকে আবার তত্ত্বনাটক অর্থাৎ রূপক, সাংকেতিক বা প্রতীক নাটকের সংলাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে রূপক-সাংকেতিক নাটকের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। এই শ্রেণীর নাটকের সংলাপ রচনায় তাঁর মৌলিকতাও অবশ্যস্বীকার্য। প্রতীকধর্মী সংলাপ আগে এমনভাবে দেখা যায়নি। এই ধরনের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রাজাধিরাজ। কঠিনতম অন্তর অভিব্যক্তি, সংকটময় দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি অদ্ভুত সংলাপের সমবায়ে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলতে রবীন্দ্রনাথের কলম সিদ্ধহস্ত। সংলাপটি যখন নিক্ষিপ্ত হবে তখনই হয়তো তার তাৎপর্যটা ধরা পড়বে না, কিন্তু যে মুহূর্তে দর্শক বা পাঠক ভাবতে শুরু করবে তখনই

বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারবে না। এই মন্তব্যের স্বপক্ষে 'রথের রশি' থেকে কয়েকটা সংলাপ উদ্ধৃত করা হল,—

সৈনিক

গঙ্গার দরকার হবে না!
ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে,
ঢালব ওদের রক্ত।

... ...

সৈনিক

সেও ভালো। অনেককাল চণ্ডালের রক্ত শুষে চাকা আছে অশুচি,
এবার পাবে শুদ্ধ রক্ত। স্বাদ বদল করুক।

... ...

সৈনিক

ঐ দেখো, ধনপতির দল আর্তনাদ করে ডাকছে আমাদের।
রথটা একেবারে সোজা চলেছে ওদেরই ভাণ্ডারের মুখে।
যাই ওদের রক্ষা করতে।

... ...

তৃতীয় সৈনিক

এতকাল রথটা চলত যেন স্বপ্নে—
আমরা দিতেম টান আর ও পিছে পিছে আসত
দড়িবাঁধা গোরুর মতো।
আজ চলেছে জেগে উঠে। বাপ্ রে, কী তেজ।
মানছে না আমাদের বাপদাদার পথ—
একটা কাঁচা পথে ছুটেছে বুনো মহিষের মতো।
পিঠের উপরে চড়ে বসেছে যম।

সংলাপগুলো আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সংঘাতবিহীন, গতির তীব্রতা নেই যেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে মুমূর্ষু ক্ষত্রিয়তন্ত্রের নিরুপায় আস্ফালন ও অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা ধরা না পড়ে যাবে না। চরিত্রগুলো যেমন প্রতীক, প্রতীকধর্মী সংলাপের সুন্দর প্রয়োগে তারা জীবন্ত হয়ে উঠেছে আরো অনেক বেশি।

রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটক সাধারণ নাট্যমঞ্চে অভিনয়যোগ্য নয়, এই ধারণা পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই ধারণাকে ভুল বলে প্রতিপন্ন করেছে বহুরূপী নাট্য সম্প্রদায়। বস্তুতপক্ষে বহুরূপী রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনা করে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতীকধর্মী নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গ আলোচনায় বহুরূপীর প্রযোজক

পরিচালক নট ও নাট্যকার শম্ভু মিত্রের কিছু কথা এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। 'রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে আমাদের অনেকের অনেক রকম ধারণা আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে, তার নাটক নাটক নয়. কাব্য। এতে নাটকীয়তা নেই। বর্তমান লেখকের এক সময়ে ধারণা ছিল যে, নাটকীয়তা থাকতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংলাপ এতো আড়ষ্ট, এতো অস্বাভআবিক, যে যদু মধু হরি শ্যামের মন এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশও পায়না এবং রসও গ্রহণ করেনা। পরে কিন্তু বার বার পড়তে পড়তে একটা নতুন বোধ আস্তে আস্তে উদ্ভব হল।'

... ...

'আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের নাটক কী পরিমাণ অনুপ্রাণিত করে আমাদের, কী ভীষণ ভালো নাটক বলে মনে হয় সেগুলোকে। —তাই তো অনেক সময় আমার মনে হয় যে আমাদের সংস্কৃতির যে গভীর রূপটি আছে— সেটি যেমন সরল তেমনি Sophisticated– রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমীর মতো— সেটা সাহেবদের পক্ষে সহজ নয়। সাহেবদের শিষ্যদের পক্ষেও।'

'কালের যাত্রা' গ্রন্থের 'রথের রশি' নাটকে বাস্তবানুসৃত যে চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতি তা অবলম্বন করা হয়নি, অথচ নাটকটি অভিনয় করলে বুঝতে পাবা যায় যে চরিত্রগুলো খুব বাস্তব। চরিত্রাভিনয় ও সংলাপ উচ্চারণ সম্পর্কে শম্ভু মিত্র বলেছেন— 'একটা কৌশল হল ভাষা। এ ভাষাটা বাজারচলতি ভাষা নয়। এই ভাষা বলে অভিনয় করতে আমাদের বহু অভিনেতারই বিশেষ অসুবিধা হয়। মনে হয়, এটা অনুভব হয় তো 'কিশোর ' করতে পারে, কিন্তু সে কথাটা এমন করে বলতে পারে কি কেউ' অর্থাৎ অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ হিসেবে এটা ঠিক, কিন্তু উচ্চারিত সংলাপ হিসেবে ঠিক নয়। এভাবে কথা বলতে গেলে যেন ন্যাকা ন্যাকা শোনায়।— এই চিন্তা মনের মধ্যে থাকে বলেই রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা বলতে আমাদের কষ্ট হয়।'

রবীন্দ্রনাথের প্রতীকধর্মী নাটকগুলোর সংলাপ অভিনয়যোগ্য নয় বলে অনেকে মনে করে থাকেন এবং এ অভিমতও অনেক সময় তারা ব্যক্ত করে থাকেন যে এই সব নাটকের সংলাপ ন্যাকা ন্যাকা। একথা ঠিক এই সমস্ত নাটকে যে সব সংলাপ আছে তা আমরা দৈনন্দিন জীবনে বলিনা। মহাকালের রথ স্তব্ধ হয়ে যাওয়াতে দেশে আকাল নেমে এসেছে সেটা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ যে সংলাপ ব্যবহার করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করলে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। 'দেখতে পাচ্ছ না— আজ ধনীর আছে ধন, তার মূল্য গেছে পাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো। ভরা ফসলের খেতে বাসা করেছে উপবাস। যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে। দেখতে পাচ্ছ না— লক্ষ্মীর ভাণ্ড আজ শতছিদ্র, তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্ছে মরুভূমিতে— ফলছে না কোনো ফল!' এ ভাষা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ ভাষা নয়। ক্ষণজন্মা বিরলদৃষ্ট পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের সম্পর্কে দ্বিতীয় নাগরিকের সংলাপ, 'সে কী কথা। সংসার তো পাপাত্মাদের নিয়েই। তারা না থাকলে তো লোকনাথের রাজত্ব উজাড়। পুণ্যাত্মা কালেভদ্রে দৈবাৎ আসে, আমাদের ঠেলায় দৌড় মারে বনে জঙ্গালে গুহায়।' গ্রাম্য সংস্কারাচ্ছন্ন স্ত্রালোকেরা যে পথ দিয়ে রথ চলবে সে পথের দুরবস্থা দূর করতে চায় 'রাস্তা ঠাকুর'কে পূজো দিয়ে,

যাতে রাস্তার উঁচু নিচু আর গর্ত সংকুলতা রথের গতি রুদ্ধ করতে না পারে। এই মর্মে প্রথমা রমণী যে সংলাপ উচ্চারণ করেছে তা এখানে উদ্ধৃত করা গেল, 'চল্ ভাই, তবে পূজো দিইগে রাস্তা-ঠাকুরকে। আর গর্ত-প্রভুকেও তো সিন্নি দিয়ে করতে হবে খুশি, কী জানি ওঁরা শাপ দেন যদি। একটি-আধটি তো নন, আছেন দু-হাত পাঁচ-হাত অন্তর। নমো নমো দড়ি-ভগবান, রাগ কোরো না ঠাকুর, ঘরে আছে ছেলেপুলে।' এই যে সংলাপ এখানে উদ্ধৃত করা হল, এ সংলাপ যথার্থ বাজার চলতি সংলাপ নয়। এ সংলাপে আমাদের ঘরের মেয়ে পুরুষেরা কথা বলেনা। এই সংলাপের বুননটাই স্বতন্ত্র। এর স্বাদটাও আলাদা। এই সংলাপের শব্দগুলো কিন্তু আটপৌরে ঘর গৃহস্থালীর আবরণ ঝেড়ে ফেলে চাঁচাছোলা হতে পারেনি, লৌকিক জীবনের প্রত্যয়ঘন উপলব্ধি স্পষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নয়। 'তিন বছর থাকব দাসী হয়ে, ভোগ দেব তিন বেলা। ওলো বিনি, পাখাটা এনেছিস তো বাতাস কর-না—দেখছিস্ নে রোদ্দুরে তেতে উঠেছে ওঁর মেঘবরন গা! ঘটি করে গঙ্গাজলটা ঢেলে দে। ঐখানকার কাদাটা দে তো ভাই আমার কপালে মাখিয়ে। ওই তো আমাদের খেঁদি এনেছে খিচুড়ি-ভোগ। বেলা হয়ে গেল, আহা কত কষ্ট পেলেন প্রভু। ... মাথা কুটছি তোমার পায়ে, টলুক তোমার মন। পাখা কর্ লো; পাখা কর্, জোরে জোরে' উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে উদ্ধৃত সংলাপের শব্দ সমষ্টির মধ্যে।

এই নাটকে সৈনিকবৃন্দের ভাষা লক্ষ্য করবার বিষয়। সাধারণত, আমরা ধরে নেই, সৈনিকের ভাষা হবে পৌরুষদৃপ্ত, তেজোময়, জোরালো। সৈনিকরা ক্ষত্রিয় বা রাজশক্তির প্রতিনিধি। সুতরাং শৌর্যবীর্যময় মনোভাবনার জারকরসে জারিত হয়ে উঠবে তাদের মুখ নিঃসৃত সংলাপগুলি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাদের সংলাপগুলো সব অন্য রকম। সংলাপগুলোকে কাঁটাছেঁড়া করলে দেখা যাবে অর্থটা কিন্তু মোটেই ক্ষত্রিতেজবিহীন নয়। কিন্তু সংলাপটির গঠন পদ্ধতিটা তেজটাকে পেলব করে তোলে। যেমন, 'চল্-না ওদের পাড়ায় গিয়ে প্রমাণ করে আসি— ওরাই মানুষ না আমরা।' কিংবা 'গঙ্গার দরকার হবে না। ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে, ঢালব ওদের রক্ত।' তেজ ও শৌর্য বীর্যের আস্ফালন সবটাই আছে, অথচ শব্দ চয়ন ও গঠনগুণে কাব্যরসে জারিত হয়ে কি এক অদ্ভুত লাবণ্যে মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

এই নাটকে ধনিক সম্প্রদায়ের সংলাপটাও লক্ষ্য করবার মতো। অর্থের দম্ভ প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে শব্দ সমন্বয়ে গঠিত সংলাপ ব্যবহার করেন, অন্য কোনো নাট্যকারের হাতে পড়লে তা আরো উৎকট আরো ঝাঁঝাল হয়ে উঠতো। 'তারা জানে, আজকাল চলছে যা-কিছু সব ধনপতির হাতেই চলছে।' প্রথম সৈনিক তার প্রতিবাদ করে, 'সত্যি নাকি! এখনি দেখিয়ে দিতে পারি, তলোয়ার চলে আমাদেরই হাতে। তার উত্তরে তৃতীয় ধনিক বলে, 'তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে।' —প্রথম সৈনিক : 'চুপ, দুর্বিনীত! ' দ্বিতীয় ধনিক : 'চুপ করব আমরা বটে! আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে জলে স্থলে আকাশে।' অদ্ভুত, অভাবনীয় বুদ্ধিদৃপ্ত সংলাপ। স্পষ্ট হয়েও স্পষ্ট নয়। অথচ ধনতন্ত্রের দাম্ভিক রূপটা আচ্ছাদিত থাকেনি।

আলোচ্য নাটকে মন্ত্রীর সংলাপগুলো বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত। অনেক সময় হেঁয়ালী বলে ভুল

হতে পারে। কিন্তু তা যে কত বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত তা একটু বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে। উদাহরণ হিসেবে একটি সংলাপ এখানে উদ্ধৃত করা গেল, 'নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।' সংলাপটি শুধু তাৎপর্যমণ্ডিত নয়, গভীর ইঙ্গিতবহ। সাধারণভাবে সংলাপটির অর্থ সাজালে দাঁড়ায় নিচের তলার মানুষরা ওপরে উঠতে গেলে দরকার বিপ্লবের। আর এই বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই ঘটে যায় যুগান্তর। 'রথের রশি' নাটকে মূল বক্তব্যের ইঙ্গিত নিহিত আছে সংলাপটির প্রচ্ছদে। কত সহজ করে সমাজবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বটি ব্যক্ত করলেন রবীন্দ্রনাথ। কত কম শব্দ খরচ করে বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের সুনিপুণ ব্যাখ্যা দিলেন তিনি। এ সংলাপ সৃষ্টি কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব। স্বল্প শব্দ সমন্বয়ে বাক্যের মাণিক্য রচনার যাদুকর রবীন্দ্রনাথ। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রতীকধর্মী সংলাপ রচনায় তিনি ছিলেন রাজাধিরাজ, সে কথার সমর্থন মিলবে উপরোক্ত সংলাপে। শুধু তাই নয়, এই নাটকে কবির সংলাপ উদ্ধৃত করলে রবীন্দ্রনাথের সংলাপ রচনা নৈপুণ্য প্রাঞ্জলভাবে ধরা পড়বে। আটপৌরে শব্দে সংলাপ রচনা করে অনেক নাট্যকার যশস্বী হয়েছেন। আবার কাব্যরসাক্রান্ত সংলাপে ওজস্বিতা আনয়ন করে কতিপয় নাট্যকার নাট্যসাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন সংরক্ষিত করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ। তিনি বিরল দৃষ্ট শিল্পী। তাই সম্ভবত শ্রীশম্ভু মিত্র মন্তব্য করেছেন, 'এইটাই রবীন্দ্রনাথের একটা শিল্প কৌশল যে জীবন প্রতীক বলে চিনতে পারার মতো সমস্ত বিশিষ্টতা আরোপ করেও সাধারণ প্রতীকী চেহারাটা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন।' আর প্রতীক নাটকগুলো সংলাপ প্রধান, তবে সংলাপ হয়ে উঠেছে চরিত্রের দর্পণ।

তবে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটকের সংলাপ সম্পর্কে যে এত কথা তার একটাই কারণ, অভিনেতার অভিনয়ে প্রায়শ অক্ষমতা। বস্তুত সংলাপে কোনো ত্রুটি নেই। অভিনয়টা এমন হওয়া দরকার যাতে অন্তরের আবেগের কাব্য-অবলীলায় প্রকাশ পায়। আর সেটা বাস্তবভঙ্গিতে চেষ্টা করলে চলবেনা। 'এই বোধ নিয়ে যদি আমরা রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের চেষ্টা করি তাহলে দেখবো যে আধা-বিয়ালিস্টিক ছাঁচে লেখা নাটকগুলো আমরা যেভাবে অভিনয় করি সেভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায়না। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটকের সংলাপ উচ্চারণে, একটা মুন্সীয়ানা থাকা চাই, যা না হলে সংলাপ তথা নাট্যরসই ব্যাহত হবে। কাব্যের মর্মার্থ প্রকাশ করতে গেলে ঝঙ্কার থাকা চাই কণ্ঠে। কবিতায় যেমন প্রত্যেকটি কথা কী একটা রসে টস টস করে, যাতে সে নিজেকে ছাড়িয়ে আরো অনেক কিছু যেন প্রকাশ করে, এ কণ্ঠও সেই' রকম রসাভিষিক্ত হওয়া চাই, তা না হলে নাটকের অভিব্যঞ্জনাটি থেকে যাবে অনায়ত্ত।

শম্ভু মিত্রের সঙ্গে একমত হয়ে পুনরায় বলব রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ অসাধারণ, ব্যঞ্জনাময়, গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত ইঙ্গিতবহ। 'রথের রশি' নাটকের সংলাপও তাই।

'রথের রশি' নাটকের সংলাপ গদ্যছন্দে রচিত সংলাপ। তবে এ গদ্য নেহাৎ আটপৌরে গদ্য নয়। কবির কলমে লেখা গদ্য। লাইনগুলোকে ভেঙে ভেঙে চরণবন্ধ করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে নয়। শব্দগুলোকে সাজাবার রীতিও অলঙ্কার সমৃদ্ধ এবং ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলবার মধ্যে নিহিত রয়েছে এর কাব্যত্ব। অতএব আমরা বলব 'রথের রশি'র ভাষা গদ্য নয়। গদ্যকবিতা। সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ

যে গদ্য কবিতা রচনার প্রবর্তন করেছিলেন, 'রথের রশি' সেই ভাষাতেই রচিত। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।—

কবি

তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।
এইবেলা থেকে বাঁধনাটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

সংলাপটির পরতে পরতে ঝংকৃত হয়েছে ছন্দ, নিঃসৃত হয়েছে অপূর্ব কাব্যরস। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় 'রথের রশি' নাটকে ভাষার বাগ্‌বৈদগ্ধ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। সংলাপের ভাষা ক্ষুরধার, বুদ্ধিদীপ্ত। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশে সংলাপের কাব্যধর্মিতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।

৮৫.১৪ নাটকের মঞ্চপরিকল্পনা

জোড়াসাঁকো ও পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ি বাংলাদেশে নাট্যাভিনয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রথম রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে (১৮৩১) নাটক অভিনয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মহর্ষির মধ্যমভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুই পুত্র বলেন্দ্র ও গুণেন্দ্রনাথ নাটক সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। জ্যোতি ঠাকুর এবং পাঁচজনের কমিটি উদ্যোগে জোড়াসাঁকো বাড়ির দোতলার হলঘরে স্টেজ বেঁধে নাটক অভিনয়ে. ব্যবস্থা হয় (১৮৬৩)। মঞ্চ ও দৃশ্য পরিকল্পনায় অভিনবত্বের সমারোহ ছিল। সে যুগের শ্রেষ্ঠ পটুয়া ডেকে দৃশ্য আঁকা, স্টেজ সুদৃশ্য ও সুন্দর করে সাজান এবং বনদৃশ্য বাস্তবায়িত করবার জন্য জীবন্ত জোনাকীপোকা এঁটে দিয়ে সুন্দর সুশোভন বনের রূপ দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, বাল্মীকি প্রতিভা, শারদোৎসব অভিনয়কালে মঞ্চ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। পাশ্চাত্য নাট্যাভিনয়ে মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় সমান গুরুত্ব পেত। কিন্তু বাংলার লোকায়ত নাট্যশিল্পে মঞ্চের কোনো বিশেষ ভূমিকা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের নাট্যভাবনায় পাশ্চাত্য ভাবধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ ভাবনাতেও আমূল পরিবর্তন সংগঠিত হয়। তখন দেখা গেল তাঁর নাটকে মঞ্চ পরিকল্পনার কোনো নির্দেশ দেওয়া হচ্ছেনা। এ ক্ষেত্রে তিনি মঞ্চ নয়, অভিনয় কলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ

শেষদিকে তাঁর মঞ্চ পরিকল্পনায় লোকযাত্রা. গাজন, চড়ক, গোষ্ঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কুশীলবরা যেমন লোকের বাড়ির দোরগোড়ায় পথের ওপর নানা গান ও অভিনয় প্রদর্শন করতো, সেই অভিনয় রীতিকে নাট্যকলায় ব্যবহার করেছেন। তাই দেখা যায় তাঁর অনেক নাটকের অভিনয় মঞ্চোপকরণ ছাড়াই পথের ওপরই ঘটছে। একটা পথ, পথের ওপর অভিনেতারা আসছেন, সংলাপের মাধ্যমে নাটকের বক্তব্য বা তত্ত্বকে তুলে ধরে অতি সাধারণভাবেই সরে দাঁড়াচ্ছেন। রক্তকরবী, মুক্তধারা ও রথের রশির ঘটনা সংগঠনস্থল পথ। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকে তাঁর মঞ্চ সম্পর্কে এই ধ্যানধারণার ব্যবহারিক প্রয়োগ করে যে আদর্শ সৃষ্টি করেছেন, আধুনিক নাট্য প্রযোজনায় এর বহুল প্রয়োগ ঘটছে।

'রথের রশি' নাটকে দৃশ্যবিভাগ নেই। যাত্রার আসরের মত মঞ্চে কুশীলবেরা যাওয়া আসা করেছে। বস্তুত এই নাটকের ঘটনা সংঘটনস্থল হল পথ। মঞ্চের পিছনের দিকে একটা রথের চিত্র। সামনের দিকে পড়ে আছে সেই রথের দড়ি। এই দড়িকে কেন্দ্র করে সব ঘটনা ঘটছে, সব চরিত্রেরা প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দড়িটা যে পথের ওপর সে সম্পর্কে কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকেনা, কারণ রথ পথের ওপর দিয়েই চলে। তাছাড়া ঘটনা যে ঘটছে পথের ওপর সে সম্পর্কে তিনটি সংলাপ আমরা এখানে তুলে দিচ্ছি। প্রথম সংলাপ নাটকের প্রথমাংশে তৃতীয়া রমণীর, 'রাস্তার ধারে ধারে / লোক জটলা করে তাকিয়ে আছে / কখন আসবে রথ।' দ্বিতীয়টা সন্ন্যাসীর 'ঐ-যে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।' তৃতীয়টা প্রথমা রমণীর, 'চল্ ভাই, তবে পূজো দিইগে রাস্তা-ঠাকুরকে।' এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি অবান্তর বিদায় বিরত থাকা গেল।

পথ, নাট্যঘটনা বা নাট্যক্রিয়া সংঘটনস্থল হল কেবলমাত্র এই নাটকে তা নয়। রূপক-সাংকেতিক বা প্রতীক নাটক— এক কথায় তত্ত্বনাটকের প্রথম যুগেই দেখা গেছে এই পথের ভূমিকা। 'ডাকঘর'-এ অমলের ঘরের জানালার সামনে যে পথ তার ওপর ঘটনাগুলো ঘটে গেছে। 'মুক্তধারা' নাটকেও প্রায় সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পথের ওপর। 'ডাকঘর' নাটকে পথের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনন্ত জীবন ধারায় সংকেত প্রকাশ করেছেন। গীতাঞ্জলির একটি কবিতা এখানে তুলে দিয়ে পথ সম্পর্কে রবীন্দ্রমানসিকতার কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করবার প্রয়াস পাওয়া গেল—

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্রছায়া বর্ষা আনে বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে, আসে যায় খবর নিয়ে,
খুশিরই আপন মনে, বাতাস বহে সুগন্ধ।।
সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা।
শুভক্ষণ হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা।।

মানুষ অনন্ত জীবনপথযাত্রী, জীবনপথের শেষ নেই। অমল রুদ্ধ গৃহের জানালা খুলে পথের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে। এই পথ দিয়ে জীবনের মিছিল চলেছে ছন্দোবদ্ধ ভাবে। অমল তার মধ্যে জীবনের স্পর্শ পেয়েছে। 'মুক্তধারা' নাটকেও আত্মার অসীম সৌন্দর্যলোকে চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। এই যে যাত্রা, সীমা থেকে অসীমের পথে জীবনের যাত্রা, পথের ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্য তো

সেখানেই। সুতরাং পথ যে রবীন্দ্র মানসিকতায় একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রকাশ ঘটেছে এবম্বিধ প্রকারে। তবে পথতত্ত্ব 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা' নাটকে যে ভাবনাব্যঞ্জিত করে 'রথের রশি' নাটকে তা করেনা। 'রথের রশি' নাটকে পথের ব্যাখ্যাটা হবে অন্য রকম। রথের রশি নাটকে কালের গতিকে মুখ্যবস্তু হিসেবে দেখান হয়েছে। কালের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার ইঙ্গিত হিসেবে দেখান হয়েছে মহাকালের রথ স্তব্ধ, চলছে না। তার দড়ি অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে। দড়ি বন্ধনের প্রতীক। মানুষে মানুষে বন্ধন, প্রাণে প্রাণে বন্ধন, আত্মার সঙ্গে আত্মার বন্ধন। এই বন্ধন আলগা হয়েছে। কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মূলে যে মনুষ্যত্ববোধ তা হারিয়ে গেছে। এই নাটকে দেখান হয়েছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ক্ষত্রিয়তন্ত্র, বণিকতন্ত্র— একে একে এসেছে। তেজ বিকীর্ণ করে চলে গেছে বিস্মৃতির গর্ভে। সময়ের পথ ধরে চলে গেছে তারা সকলে। এই পথে এবার আসবার পালা নিম্নবৃত্তিতে নিযুক্ত শুদ্রদলের। যারা যুগ যুগ ধরে উচ্চবর্ণের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। অবহেলিত হয়েছে, হয়েছে অত্যাচারিত। সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ, চাষী, তাঁতী তাঁরা আজ জগতের স্তব্ধ রথচক্রে গতি আনয়নের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে চাইছে। তারপর তাদের আচরণে যখন মহাকাল ক্ষুব্ধ হবে তখন তারাও পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই একই পথ ধরে চলে যাবে বিস্মৃতির অতলান্ত তিমিরে।

'তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।'

সময়ের পথ ধরে এই সব ঘটনা সংঘটিত হয় বলে পথ এই নাটকে দৃশ্যপট। এই পথের ওপর দিয়ে জীবনের প্রবাহ চলে, মেয়ের দল আসে, লোকজন আসে, নানা কথাবার্তা আচার-আচরণ—নানা অভিব্যক্তি ঘটিয়ে চলমান জীবনের কথা বলতে বলতে চলে যায়। এই পথ ধরেই মানুষ চলে সেই পথে যেখানে সর্ব বর্ণ সমন্বয়টা বড় কথা।

সুতরাং শুধুমাত্র নাট্যক্রিয়া পথের ওপর সংঘটিত হয়েছে বলে পথ 'রথের রশি'র নাট্য দৃশ্যপট হয়ে উঠেছে একথা বলা যাবেনা। কিংবা রথ পথের ওপর দিয়ে চলে বলেই এই নাটকের মঞ্চপরিকল্পনায় পথের এতখানি গুরুত্ব একথা ভাবাটা আংশিক, সার্বিক নয়।

'রথের রশি' নাটকে কোনো দৃশ্য বা অঙ্ক বিভাগ নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রত্যেকটা প্রতীক নাটকে থাকেও না তা। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ নাট্যক্রিয়াকে অখণ্ড রেখে সমাপ্তি বিন্দুতে পৌঁছুতে চান। দৃশ্য বা অঙ্ক, ভাবের প্রবাহে আনে ব্যাঘাত, রসের আস্বাদনে ঘটায় বিঘ্ন। ভাব একটা প্রবহমান বস্তু। তার আস্বাদ্যমানতায় বিঘ্ন উপস্থিত হোক রবীন্দ্রনাথের সেটি কাম্য নয়। দর্শক বা পাঠককে তিনি সরলরৈখিক পথে একটানা নিয়ে যেতে চান। দৃশ্য বা অঙ্কের প্রয়োজন তখনই যখন নাট্যকার দর্শক বা পাঠককে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যেতে চান। রবীন্দ্রনাথ সে রকম মনে করেননি, তিনি তার এক একটি তত্ত্বনাটকে এক একটি তত্ত্বের নাট্যরূপ দিয়েছেন। তাই দৃশ্য বা অঙ্ক বিভাগের কোনো প্রয়োজনবোধ করেন নি। 'রথের রশি' নাটকের বক্তব্য একটাই শুদ্রশক্তির জাগরণ ঘটিয়ে তার সম্মানজনক সংস্থাপনা— এই

বক্তব্যকে অঙ্কের বা দৃশ্য বিভাগের দ্বারা খণ্ডিত করলে নাটকের রসপরিবেশ বিনষ্ট হবে। তাই তিনি পথের ওপর সমস্ত ঘটনাবলী একটানা ঘটিয়ে গেছেন।

৮৫.১৫ সারাংশ

'রথের রশি' নাটকের সংলাপ রবীন্দ্রনাথ কৃত রূপপ-সাংকেতিক নাটকের সংলাপ রীতি অনুসৃত। এ সংলাপের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। অন্তরের গভীরতম ভাববস্তুকে ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষায় উপস্থাপন করা রবীন্দ্রনাথের অনন্য কৃতি। আপাতদৃষ্টিতে সংঘাত লেশহীন মনে হলেও সামান্য ভেবে দেখলেই শ্রেণীচরিত্রগুলির অনিবার্য পরিণতির আশঙ্কায় বিচলিত বোধ ও পরিণামী অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ ধরা পড়ে।

একসময় অভিযোগ করা হত, রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়যোগ্য নয়। 'বহুরূপী' গোষ্ঠী সে ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন। বহুরূপীর নট, নাট্যপরিচালক শম্ভু মিত্রের মতে— রবীন্দ্রনাথের নাটকে "সংস্কৃতির যে গভীর রূপটি আছে, সেটি যেমন সরল তেমনি Sophisticated"। —সেটা সকলের পক্ষে বোঝা সহজ নয়। নাটকটির চরিত্রাঙ্কন প্রচলিত বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে না রচিত হলেও, চরিত্রগুলি খুবই বাস্তব বলে বোধ হয়। এদের মুখের ভাষা বাহ্যত বাজার চলতি ভাষা না হলেও, আন্তর অনুভূতিতে বাস্তব বলে মনে হবে। গ্রাম্য সংস্কারাচ্ছন্ন স্ত্রীচরিত্রগুলি যেভাবে কথা বলেছে—'রাস্তা ঠাকুরকে পূজো দেওয়া', 'দড়ি ভগবান'কে নমস্কার জানানো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আতিশয্য দুষ্ট মনে হলেও, আন্তরধর্মে বাস্তব। এভাবে দেখা যায় নাটকের অন্যান্য চরিত্রের সংলাপও অনুরূপে বাস্তব ধারণার পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

'রথের রশি'র মঞ্চ পরিকল্পনায় বাংলা লোকায়ত যাত্রার সহজ সরল মুক্ত মঞ্চের ইঙ্গিত আছে। যাত্রার আসরের মত কুশীলবরা আসা-যাওয়া করেছে। এদেশে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র একে একে এসেছে। তাদের শক্তির আড়ম্বর দেখিয়ে চলে গেছে— এই সাধারণ সত্যটি তুলে ধরতে রবীন্দ্রনাথ পথকেই নাটকের দৃশ্যপট করেছেন। অধিকন্তু এই পথে জীবনের প্রবাহ চলে বলেই জীবনের কথা বলতে মানুষের সর্ববর্ণ সমন্বয়ের কথা বলতে তিনি পথকে নাটকের অন্যতম উপজীব্য করেছেন। পথই তো সব কিছু মেলায়। তাই এ নাটকে পথের এত গুরুত্ব। 'রথের রশি' নাটকে শূদ্রশক্তির জাগরণ ঘটিয়ে সমাজ-সভ্যতার মূলধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। অঙ্ক, দৃশ্য বিভাগে একে খণ্ডিত করলে নাটকের রস পরিবেশন বাধা পেত। তাই নাটকীয় ঘটনা একটানা পথেই নাট্যকার ঘটিয়েছেন।

৮৫.১৬ অনুশীলনী ৩

১। 'রথের রশি' নাটকের চরিত্রগুলি নামহীন কতকগুলি বর্গচরিত্র। —যৌক্তিকতা বিচার করুন।

২। 'রথের রশি' যেন চরিত্র চিত্রশালা। নাটকে উল্লিখিত প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রগুলির পরিচয় দিন।

৩। 'রথের রশি' নাটকের নারী চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। 'গড় করি তোমায়, দড়ি-নারায়ণ। প্রসন্ন হও।' —বক্তা কে? এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে বক্তার যে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার বর্ণনা করুন।

৫। বাধা পেলে শক্তি নিজেকে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায়না।— বক্তা কে? মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৬। 'রথের রশি' নাটকের 'কবি' চরিত্রটি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮৫.১৭ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী—১ :

১। (ক) সন্ন্যাসী (খ) দ্বিতীয় (গ) তৃতীয় সৈনিক (ঘ) দলপতি (ঙ) কবি

২। শব্দার্থের সাহায্য নিন।

৩। প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনুসরণে উত্তর তৈরি করুন।

৪। প্রাসঙ্গিক আলোচনা পড়ে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী ২ :

১। (ক) রথের রশি, কবির দীক্ষা, সংকলিত

(খ) রথযাত্রা, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

(গ) ক্ষত্রিয়, সমাজ, শূদ্রের

(ঘ) খাটো, দাঁড়াক, মাথা

২। 'দেশকাল' পর্যায়ের আলোচনার সাহায্যে উত্তর করুন।

৩। 'নামকরণ' অংশটি অবলম্বনে আপনার উত্তর তৈরি করুন।

৩ :

১। 'চরিত্র বিশ্লেষণ' আলোচনার প্রথমাংশে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

২। এগারটি প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রের কথা আলোচনা করা হয়েছে, দেখুন।

৩/৪। নারী চরিত্র সম্পর্কিত আলোচনার সাহায্যে উত্তর করুন।

৫। বক্তা মন্ত্রী। মন্ত্রীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য বুঝে মন্তব্যটি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। 'চরিত্র বিশ্লেষণ' পর্যায়ের শেষাংশে এ সম্পর্কে আলোচনার সাহায্যে উত্তর করুন।

৮৫.১৮ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। ড. অজিতকুমার ঘোষ — বাংলা নাটকের ইতিহাস।

২। ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রনাট্য সমীক্ষা : রূপক-সাংকেতিক।

৩। ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী — রবীন্দ্রনাথের রূপকৃ-সাংকেতিক নাটক।

৪। ড. দিলীপকুমার নন্দী ও ড. নবকুমার মণ্ডল — প্রসঙ্গ : কালের যাত্রা।

৫। ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু — বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ।

৮৫.১৯ অতিরিক্ত পাঠ

কালের যাত্রা
১৩৩৯ : ১৯৩২

রথের রশি এবং কবির দীক্ষা এই দুটি নাটিকার সংকলন গ্রন্থের নাম কালের যাত্রা। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করেন (৩১শে ভাদ্র, ১৩৩১)।

রবীন্দ্রনাথ গতি ও ছন্দের উপাসক। তিনি একথা জানেন ও মানেন যে, কালের গতিছন্দে যে সুষমা অভিব্যক্ত, এই সুষমা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ করে এবং অতিক্রম করে। সুতরাং বিশ্বপ্রকৃতিতে যেমন, মানবসমাজের ইতিহাসেও তেমনি একটা বোঝাপড়ার প্রয়াস চিরদিনই চলবে এবং এর মাধ্যমেই কালের যাত্রা ক্রমাগতই সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির লক্ষ্যে চলতে থাকবে।

রথের রশি ও কবির দীক্ষা একত্রে সন্নিবিষ্ট করে এবং সমগ্র গ্রন্থটিকে কালের যাত্রা নামে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথ পরস্পর সংশ্লিষ্ট দুটি ভাবসত্যের প্রতিই নাট্যরসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। রথের রশি নাটকটির তাৎপর্য এবার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

১৩৩০ সালের শারদীয়া ছুটিতে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ রথযাত্রা নামে একটি নাট্যদৃশ্য রচনা করেন; ঐ সালেরই অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় উক্ত নাট্যদৃশ্যটি প্রকাশিত হয়।[১] ১৩৩৯ সালে এটি নূতন আঙ্গিকে এবং নূতন নামে ('রথের রশি') কালের যাত্রা পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়।

রথের রশির সংক্ষিপ্ত কথাবস্তু নিম্নরূপ : রাজার রাজ্যে রথযাত্রার মেলা বসেছে। ভক্তদের ধারণা, এ-দিনটি শুভ সূচনার দিন। পূণ্যার্থীরা পথের দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে রথ দেখবার আশায়। বেলা বাড়ছে, রথের দেখা নেই। রথ পড়ে আছে অচল হয়ে। যারা বরাবর রথ টানে, তাদের হাতে রথ চলল না, পুরুতের শাস্ত্রবল, ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রবল এবং ধনিকের ধনবল ব্যর্থ হল। ভক্তিমতী মেয়েদের পূজার্চনা নিষ্ফল হল। এমন সময় সমাজে অপাংক্তেয় বলে চিহ্নিত শূদ্রেরা এল রথ টানতে। পুরুত, ক্ষত্রিয় ও শেঠের দল তাদের স্পর্ধা দেখে ক্ষেপে উঠল। কিন্তু বুদ্ধিমন্ত মন্ত্রী অচল রথকে সচল করবার শেষ চেষ্টার উপায়স্বরূপ যারা রথের রশি ধরবার সামাজিক সমর্থন এতদিন পায়নি তাদেরই রথ টানবার অনুমতি দিলেন। ফল ফলল, রথ চলল। মন্ত্রীও এসে তাদের সাথে হাত মেলালেন। রথ চলল বটে,

তবে চিরাচরিত পথ ধরে নয় রাজপথ ছেড়ে রথ এবার জনপদের দিকে এগিয়ে চলল— অসমতলকে সমতল করে দেবার লক্ষ্যে। শঙ্কিত বিপর্যস্ত পুরুত ক্ষত্রিয় এবং ধনিকশ্রেণী নিজেদের শিবির অর্থাৎ নিজ নিজ ক্ষমতার আধাররূপ মন্দির, অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। রথের গতি প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত হতে লাগল।

এমন সময় উপস্থিত হলেন কবি। কবি যেহেতু সত্যদ্রষ্টা, সেহেতু তাঁর কাছ থেকে এমন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের[২] অন্তর্নিহিত কারণটি জানবার জন্যে সকলেই উৎসুক হল। কবি এ-বিষয়ে যে-ব্যাখ্যা দিলেন, তার মর্মার্থ হচ্ছে— এতদিন সমাজের তথাকথিত অভিজাতশ্রেণীর মাথা ছিল উঁচু। রথের চূড়ার দিকেই নিবন্ধ ছিল তাদের দৃষ্টি। রথ চলে যার টানে, চোখ নামিয়ে তারা সেই দড়ির দিকে একবার চেয়েও দেখেনি, অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টির যে বাঁধন, তাকেই ওরা মানেনি। এজন্যে ঘটেছে এমন একটা অভিনব ব্যাপার। কবির কথা শুনে পুরুত সন্দেহ প্রকাশ করে বলে যে, শূদ্রেরা এতকাল ছিল অপাংক্তেয়, ওরা আজ দড়ির নিয়ম মেনে চলবার মতো যোগ্যতা লাভ করল কিসের জোরে? কবি বলেন যে, তারা আত্মশক্তির সার্থক প্রকাশের মাধ্যমেই সে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। তবে, একথাও ঠিক, শক্তির প্রকাশে সংযম ও সুষমা যতদিন থাকবে, ততদিনই রথের চলা থাকবে স্বচ্ছন্দ। ব্যতিক্রম ঘটলেই আবার আসবে উল্টো রথের পালা। বোঝাপড়ার মাধ্যমে আবার হবে নতুন যুগের সূচনা।

রবীন্দ্রনাথের মতে রথযাত্রার বিশেষ দিনটি সমাজ-মানসের দর্পণবিশেষ। কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলার দরুনই সমাজপ্রবাহ অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়েছে। যারা এতকাল সমাজচক্র চালিয়েছে, তারা বিকৃতভাবে কালের ব্যবহার করেছে। পরিবেশ-পরিস্থিতিজনিত কালপ্রেক্ষিতে, কালের অনুশাসন মানেনি। কালের প্রবাহে তাই ঘটেছে ছন্দপতন। মানবসমাজ প্রবাহের অগ্রগতির সাংকেতিক কাহিনীই রথের রশি। ভবিষ্যৎ সমাজের নাট্যিক রূপরেখায় কবি নতুন জীবনের নতুন প্রশ্ন সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন। পথ এখানে নাটকের পটভূমি, কাল এর অধিনায়ক, চিরঅবহেলিত গণমানব নাটকের মুখ্য পাত্র।

রথের রশি নাট্যালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এ-নাট্যের মূল নাটিকা রথযাত্রা ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, একই সংখ্যায় কবির সমস্যা[২] এবং সমাধান[৩] নামে দুটি প্রবন্ধও বের হয়। রথের রশি নাট্যদৃশ্যের মূল বক্তব্য উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের বক্তব্যের সঙ্গে একান্ত-সম্পৃক্ত। এ-প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত নাট্যদৃশ্য এবং দুটি প্রবন্ধ রক্তকরবী নাট্যরচনার সমকালে লিখিত, কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'রক্তকরবী'তে কবির কালিক উপলব্ধির অভিব্যক্তি পরোক্ষ, কিন্তু রথের রশিতে তা প্রত্যক্ষ।

॥ ২ ॥

কালান্তরের সূচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-বীক্ষা যে কতো তীক্ষ্ণ ও গভীর ছিল তার পরিচয় মেলে নৈবেদ্য কাব্যে "একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।" গীতাঞ্জলিতেও কবি অধ্যাত্ম ভাবনার মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, অহঙ্কারই হচ্ছে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিলনের বাধা। এই বিশ্বলীলার গতিচ্ছন্দ ও একটা সামঞ্জস্য আছে, যার প্রভাবে

সমস্ত বিচ্ছিন্নতা ক্ষুদ্রতা অপূর্ণতা পুণ্যের স্পর্শে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। কবি ভগবানের ন্যায়বিচারের দোহাই দিয়ে তথাকথিত অভিজাত গোষ্ঠীদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করছেন—

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে ধুলায় সে যায় বয়ে—
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।

—'অপমানিত' (গীতাঞ্জলি)

সুতরাং রথের রশির মূল বক্তব্য নতুন কিছু নয়। নতুন যা, তা হচ্ছে গীতাঞ্জলিতে কবি পতিতপাবনকে বিচারকরূপে সামনে রেখে সমাজের উচ্চশ্রেণীকে তাদের শাস্তির প্রতিফলস্বরূপ অপমানিত হবার ভয় দেখিয়ে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে একই সমতলে এসে দাঁড়াবার কথা বলেছেন। আর, রথের রশিতে তিনি গণমানবের জাগরণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বলাকার যুগে সবুজপত্রে প্রকাশিত বিবিধ রচনায় কবি একথা স্পষ্ট বলেছেন যে, যার জোর আছে সে রূপ হাঁকিয়ে যাবে, আর যার জোর নেই সে পথ করে দেবে —এ ব্যবস্থা চিরদিন চলতে পারেনা। প্রভুত্ব জিনিসটাই একটা ভার, মানুষের সহজ চলাচলের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বাধা। মানুষের সমাজকে এই প্রভুত্বের বোঝা নিয়ে বারবার কাঁধ বদল করতে হয়, বাইরের চাপেই এমন পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে (তুলনীয় : লড়াইয়ের মূল : কালান্তর)। 'রথের রশি'তে কবি রাজমন্ত্রী, ধনপতি, পুরোহিত এবং সৈনিক অর্থাৎ রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র এবং ক্ষাত্রশক্তির সঙ্কট ও সমস্যা রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করে এ-সত্যই সমাজমানসে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রচালনার যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিপর্যস্ত ও বিকল অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো পথই নেই, যদি না গণমানুষের মিলিত শক্তির সাথে তারা হাত মেলায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বুর্জোয়াগোষ্ঠী তাদের স্বার্থসংরক্ষণের প্রয়োজনে মেহনতি মানুষদের নানাবিধ সঙ্গত দাবী কিছু কিছু মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং এই মেনে নেবার ফলে তথাকথিত বুর্জোয়াগোষ্ঠী সমাজে তাদের আত্মরক্ষা করলেও পরোক্ষে গড়ে তুলছে এক বিপুলবিস্তৃত বিপ্লবীগোষ্ঠী। তাছাড়া, ধনিকদের ধনলিপ্সা যতোই বেড়ে চলে ততোই তাদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি হয়ে ওঠে বেপরোয়া এবং এজন্যেই যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতিও তারা সম্প্রসারিত করে চলে, যার ফলে শ্রমিক গোষ্ঠীও বেড়ে ওঠে। আর শ্রমিকদের মধ্যেও গড়ে ওঠে বিপ্লবী ঐক্য এবং বুর্জোয়াদের তখন আপোষমূলক পন্থা গ্রহণ করতেই হয়।

রথযাত্রা নাট্যদৃশ্যকে রথের রশি নাটিকায় রূপান্তরিত করবার প্রেরণার মূলে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া দর্শনের (১৯৩০ সন) প্রভাব সক্রিয় ছিল, এ ধারণা অমূলক নয়। রাশিয়ায় সমাজ দর্শনের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপলব্ধি। জীবনকে গোড়া ঘেঁসে বদল করবার দিন যে আসন্ন এবং পরিবর্তনকে যে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ

করতেই হবে এমন একটা মানসিক প্রস্তুতিও তিনি নিয়েছিলেন।[৪] এতদসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নিজে জীবনের চিন্তায় ও দর্শনে রাশিয়ার রাষ্ট্রতত্ত্বকে মেনে নিতে পারেননি। রাশিয়ার চিঠিতে তিনি নিজেই বলেছেন : "সোভিয়েট রাশিয়ার মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ। সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই অপবাদটাই আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি।"

"রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো ; পুরাতন বিধি বিশ্বাসের শিকড়গুলোকে তার সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা। এরকম ভাঙ্গানের উৎসাহে যে আবর্ত সৃষ্টি করে তার মাঝখানে পড়লে মানুষ তার মাতুনির আর অন্ত পায় না—স্পর্ধা বেড়ে ওঠে; মানবপ্রকৃতিকে সাধনা করে বশ করবার অপেক্ষা আছে একথা ভুলে যায় ; মনে করে, তাকে তার আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা সীতাহরণ ব্যাপার করে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তারপরে লঙ্কায় আগুন লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার ভর হয় না যাদের, তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে, অবশেষে রাতারাতি যা গড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলেনা, তার দীর্ঘকালের ভর সয় না (রাশিয়ার চিঠি)।

রবীন্দ্রনাথ তাই একই গ্রন্থে বলেন, "যেখানে মানুষ তৈরি নেই, মত তৈরি হয়েছে সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করি না।" রথের রশি নাট্যে একই কথার প্রতিধ্বনি :

"দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।"

এবং কবির মতে, ঐ মাতুনির দিনেই আসবে উল্টো রথের পালা। তখন নতুন যুগ সৃষ্টি হবে উঁচুতে নীচুতে বোঝাপড়ার মাধ্যমে। কবিচিত্তে সাম্যবাদী নীতির যে ছবিটি চিত্রিত ছিল তা ঔপনিষদিক প্রত্যয় সূত্রে গ্রথিত তথা ভারতীয় সমাজ-জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত (তুঃ হল সমস্যা, কালান্তর)। এই নাট্যের প্রতিবেদনের মূলেও আছে জীবন, সমাজ ও সময়-সচেতনতা। লোকই শিক্ষার বাহন এ-নাট্যে কবি স্বয়ং বিবেকী আত্মার ভূমিকা নিয়েই উপস্থিত হয়েছেন এবং জনজীবনের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংকট ও সমস্যাকে আপোষমূলক সমাধানের মাধ্যমে কার্যকর করে সমস্বার্থভিত্তিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের প্রতিই স্বার্থসর্বস্ব বুর্জোয়াগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন : "রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে, সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা।"

॥ ৩ ॥

রথের রশি নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যেতে পারে।

রথের রশি নাট্যেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে গণমানুষের জয়ের কথা ঘোষণা করেছেন।

আবার এ-নাটকে কবির দার্শনিক প্রত্যয়ও অনুপস্থিত নয় ; ভগবান বা জগন্নাথ (যিনি কালের

রথের সর্বাধিনায়ক বা মহাপরিচালক) কোথায় প্রতিষ্ঠিত এ প্রশ্নের উত্তরে কেনোপনিষদ বলেছেন, সে মহিম্নি অর্থাৎ আপন মহিমায়। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের এ বাণীর প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর বহু রচনায়। "মানুষের ধর্ম" প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষেরও সত্য প্রতিষ্ঠা তার আপন মহিমায় অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অব্যাহত প্রকাশে।[৪] 'রথের রশি' নাট্যেও কবি এ সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ও প্রকাশ পুর্ণতা পায় গণমানুষের সামগ্রিক উজ্জীবনে এবং মানব এক্যের অভ্যুদয়ের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকার গণতন্ত্র।

মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সূত্রের প্রতি ইঙ্গিত দান 'রথের রশি'র উপজীব্যে উপস্থাপিত। কবি রূপকের রূপরেখায় একথাই বলেছেন যে, স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশবাসীর যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তার প্রধান কারণ এ নয় যে দেশের লোক বিদেশীর শাসনাধীনে। আসলে দেশের মানুষ নানা কালে নানারূপে বিবিধ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর কব্জাভুক্ত অথবা শাসন-শোষণ-সংস্কার নিয়মের নিগড়ে বন্দী। দেশবাসী স্বদেশকে তাদের যৌথসেবা, ত্যাগ-মমতা ও যত্নের দ্বারা, জানা ও বোঝার দ্বারা আত্মীয়সূত্রে বাঁধতে পারেনি, দেশের হৃদয়কে অধিকার করতে পারেনি। আজকের দিনে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন হচ্ছে—মানুষে মানুষে সামাজিক সন্ধি স্থাপন এবং সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে অধিকাংশ লোকের অধিকাংশ শক্তির সুষ্ঠু বিনিয়োগ, যাতে দেশের মানবিক শক্তি তথা প্রাযুক্তিক শক্তির সমন্বয়ী-সংহতি তাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। রাষ্ট্র বা সমাজনীতিতে ভারসাম্যরক্ষণই যে উত্তম পন্থা এবং এ পন্থা যে সভ্যতার যা কিছু বাহন—সমস্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সম্পৃক্ত, এ-বাস্তব সত্য সমাজের স্বার্থান্বেষীদেরও আত্মকল্যাণেই উপলব্ধি করতে হবে, কেননা, গণমানুষের সমর্থন নিয়েই সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—'রথের রশি' নাট্যে কবি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই তাই মন্ত্রী (রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনার বুদ্ধির প্রতিভূ) বাচনিক বলেছেন, "স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন। এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান" হয়ে।

'অচলায়তন' নাটকে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ গুরুর আবির্ভাবের মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার আভাস দিয়েছেন, 'মুক্তধারা'য় ক্ষাত্রশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন, 'রক্তকরবী'তে ধনিক ও শ্রমিক সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উক্ত তিনটি নাটকেই কালান্তরের আভাস স্পষ্ট কিন্তু 'রথের রশি'তে গণবিপ্লবের মাধ্যমে গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সার্থকসূচনা হয়েছে।[৫] নাটকীয় আবেগের চেয়ে কৃষক-শ্রমিক অস্পৃশ্য-অবহেলিতদের ব্রাত্যজীবনকে উজ্জ্বল মহিমায় সমাজমানসে তুলে ধরাই রথের রশির প্রধান বৈশিষ্ট্য (তুলনীয় 'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতা)। এদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলার নাট্যধারাকে নতুন পথে চালনার ইঙ্গিত দিয়েছিল 'রথের রশি' এবং এ কারণেই রথের রশি সত্যিকারের প্রগতিবাদী নাটক। মানুষের প্রাণের জগৎবিচ্ছিন্ন মূল্য নিরূপণে রথের রশি রূপকনাট্য এক বাস্তব পদক্ষেপ। একান্ত রূপকধর্মী হওয়ার জন্যেই এ-নাটক তৎকালীন শাসক বা বুর্জোয়া-সমাজের শ্যেণদৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়। তা না হলে এ-নাটিকায় গণবিপ্লবমুখী কার্য-সমর্থনের যে ইঙ্গিত বর্তমান, তা তদানীন্তন সরকারের চাঞ্চল্যের কারণ হতে পারত।[৬]

১। 'রথযাত্রা' নাট্যদৃশ্যটির রচনা সম্বন্ধে কবির মন্তব্য : "আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর কোনো রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে হইয়াছিল।" ('রথযাত্রা', প্রবাসী, ১৩৩০ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২১৬-২৬)। 'বিশ্বভারতী সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রী প্রমথনাথ বিশী 'রথযাত্রা' নামে তাঁর স্বরচিত একটি নাটক পাঠ করেছিলেন। ('শান্তিনিকেতন', ১৩৩০ ভাদ্র, পৃঃ ১৩৮)।

২। সমকালীন রচনা সমস্যায় কবি বলেছেন যে, দেশের সামাজিক ভেদবুদ্ধিই সামাজিক স্বাধীনতার পথে প্রধান সমস্যা. তাঁর নিজের কথায়' একঃ অবর্ণঃ যিনি এক এবং সকল বর্ণ-ভেদের অতীত, 'স ন বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত' তিনিই আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন।' সমস্যা (প্রবাসী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ)। বলা বাহুল্য, এই এক এবং অবর্ণই জগন্নাথ বা কালের রথের সর্বাধিনায়ক, এবং রথের দেবতা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই দেবতা। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরদ্বার সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত, কেননা মন্দিরের দেবতা যে জগতেরই নাথ, জগন্নাথ।

৩। 'সমাধান' প্রবন্ধেও কবির বক্তব্য এই যে, সামাজিক ভেদবুদ্ধি মানুষের অবুদ্ধির নামান্তর। অবুদ্ধির প্রভাবে দেশের মানুষ বিচ্ছিন্ন এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধ। সুতরাং যেখানে সমাজের অধিকাংশ লোক মূঢ়তায় আচ্ছন্ন এবং অন্ধ সংস্কারের বশে সন্ত্রস্ত হয়ে গুরু পুরুত গণৎকারের দরজায় ছুটাছুটি করে মরছে, সেখানে এমন কোনো সর্বজনীন স্বাধীনতামূলক রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ব্যবসাতন্ত্র ঘটতেই পারে না, যার সাহায্যে অধিকাংশ লোক তাদের অধিকাংশ ন্যায্য প্রাপ্য পেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতেই সেই রাষ্ট্রনীতিই উত্তম, যার মাধ্যমে সর্বজনের স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার পথে পেতে পারে। 'সমাধান', 'কালান্তর' (বি. ভা. কলি, ১৩০১), পৃঃ ২১২।

৪। রাশিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সনের ৩১শে অক্টোবর তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, "যে রকম দিন আসছে, তাতে জমিদারির উপর কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি, এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরতলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।" —গ্রন্থ পরিচয়, "রাশিয়ার চিঠি', র.র ২০, (বি.ভা. কলি, ১৩৬১), পৃঃ ৪৫৩। এ-প্রসঙ্গে কবির স্ববিরোধী মনোভাবও উল্লেখ্য : 'অমিয় চক্রবর্তী যখন তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) কাছে নিবেদন করেন যে যাবার আগে তিনি যেন জমিদারি নেশনকে দান করে দিয়ে যান তখন তিনি নারাজ হন।' —অন্নদাশংকর রায়, 'তাঁর পরেই প্লাবন', রবীন্দ্রনাথ, (কলি, ১৯৬২), পৃঃ ১১।

৫। উল্লেখ্য, চিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই গণান্দোলনের পুরোপুরি সমর্থক ছিলেন না। (তুলনীয়, প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য, প্র. না. বি রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ, কলি, ১৯৬৬ পৃঃ ৫০৩)। কিন্তু 'রথের রশি' নাট্যে কবির চিন্তাধারার আশ্চর্য ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়।

৬। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অবান্তর নয় যে, ১৯৩৫ সনে (১৯৩৫ সন 'রথের রশি' নাট্যরচনার কাল) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সমাবর্তনে ভাষণ দেবাব অনুরোধ জানাতে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ভারত সরকারের কাছে জানতে চাইলেন— রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত হবে কিনা। গোয়েন্দা বিভাগ তদুত্তরে মন্তব্য পাঠাল : "রর্বীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাইট উপাধি ব্যবহার করেন না। কবি, দার্শনিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। অন্যদিকে পার্টিশন বিরোধী আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে (anti-partition agitation) তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর তখন থেকেই তিনি সরকারের বিরুধ্বতাকরছেন। বাংলাদেশকে তিনি জাতীয় সংগীত দিয়েছেন। কলকাতাথেকে একটি সদ্য পাওয়া সংবাদে জানা যাচ্ছে যে, তিনি আগের চেয়ে ক্ষিপ্ত সরকার-বিরোধী (rabidly anti-government) হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি উপন্যাসে একথা স্পষ্ট বোঝা গেছে। অভিযোগ এই যে, বাংলার বিপ্লববাদের গুণগান গাওয়া হয়েছে এই উপন্যাসে।... পাবলিক প্রসিকিউটর ১৯৩১ সালের প্রেস ইমারজেন্সী পাওয়ারের প্রয়োগে বইটি বাজেয়াপ্ত করতে বলেছেন... বাংলাদেশে বইটির প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।—পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ডক্টর টেগোরের রাজনৈতিক মতামতের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই এই জাতীয় লোককে সমাবর্তনে ভাষণ দিতে আহ্বান করা উচিত নয়।" —(হোম ডিপার্টমেন্ট, ফাইল নং ৫৫-১-৩৫, সোমেন্দ্র নাথ বসু, 'পুলিশ রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬শে পৌষ ১৩৭৮)। উক্ত উপন্যাসের নাম 'চার অধ্যায়'। এ উপন্যাসে কবি বিপ্লববাদীদের চরিত্র চিত্রণ করেছেন। 'রথের রশি'তে এ জাতীয় নির্দিষ্ট চরিত্র না থাকলেও সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজচিত্র এবং গণমানুষের শক্তির উদ্বোধনের চিত্র উপস্থিত।

[গ্রন্থসূত্র : রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক—ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী]

একক ৮৬ ☐ গণনাট্য আন্দোলন ঃ নবান্ন — বিজন ভট্টাচার্য

গঠন

৮৬.১ উদ্দেশ্য
৮৬.২ প্রস্তাবনা
৮৬.৩ বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা
৮৬.৪ মূলপাঠ ১ : (ক) গণনাট্য আন্দোলন কি ও কেন?
(খ) গণনাট্য আন্দোলন এবং নবান্ন।
৮৬.৫ সারাংশ
৮৬.৬ অনুশীলনী ১
৮৬.৭ মূলপাঠ ২ : নবান্ন — প্রথম অঙ্ক
৮৬.৮ সারাংশ
৮৬.৯ মূলপাঠ ৩ : নবান্ন — দ্বিতীয় অঙ্ক
৮৬.১০ সারাংশ
৮৬.১১ মূলপাঠ ৪ : নবান্ন — তৃতীয় অঙ্ক
৮৬.১২ সারাংশ
৮৬.১৩ মূলপাঠ ৫ : নবান্ন — চতুর্থ অঙ্ক
৮৬.১৪ সারাংশ
৮৬.১৫ অনুশীলনী ২
৮৬.১৬ উত্তর-সংকেত
৮৬.১৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

৮৬.১ উদ্দেশ্য

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন নাটকটি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি নতুন ধারার সৃষ্টিকারী নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে জানবেন। এই এককটি পাঠ করলে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের যুগান্তর সৃষ্টিকারী 'নবান্ন' নাটকের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

- পরিশেষে জানবেন, 'নবান্ন নাটক সৃষ্টির প্রেরণা ও অভিনয়ের উদ্যোগের উৎসটি।
- 'নবান্ন' নাটক ও তার উপস্থাপনা শুধুমাত্র নতুনতর আর্ট হিসেবেবেই প্রশংসনীয় ছিলনা, দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি বেদনা জাগাতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

- নবান্ন নাটকের মধ্য দিয়ে এটি উপলব্ধি করবেন, এটি কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক জীবনবৃত্ত নয়, যুগ পরিবেশজাত জীবনের কথা।
- 'নবান্ন' ব্যক্তি জীবনবৃত্ত থেকে গোষ্ঠী জীবনকথা হয়ে উঠতে পেরেছে বলেই এ নাটক গণনাট্য।
- এ নাটক ভারত তথা বাংলাদেশের এক বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে রচিত (১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন এবং মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনায় ১৬ অক্টোবর সাইক্লোন ও বন্যা)।
- এ নাটকের পটভূমিতে আছে সন ১৩৫০-এর কুখ্যাত মন্বন্তর জনিত সঙ্কট (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) এবং তা থেকে উত্তরণের দিশা।
- নবান্ন এদিক থেকে হয়ে উঠেছে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক। নবান্ন গণনাট্যের একটি বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ নাটক।

৮৬.২ প্রস্তাবনা

ইতোপূর্বে আপনি বাংলা নাটকের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং দুটি নাটক পাঠের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রেক্ষাপট বাংলার গ্রাম ও তার দরিদ্র অসহায় কৃষক সমাজ—তাদের জীবনযাপনে সমস্যা সঙ্কট, ইংরেজ কুঠিয়ালদের শাসনপীড়ন, তাদের নায়েব-গোমস্তা পাইকদের অত্যাতারের পরিচয় পেয়েছেন। নাটকটি বসু পরিবারের পারিবারিক সীমায় আবদ্ধ হয়ে পড়ায় কৃষকের সম্মিলিত শক্তি এখানে সংহত গণ আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। অতিনাটকীয় উপাদানে নাটকের শেষ পরিণতি ঘটেছে।

'রথের রশি' (১৩৩৯) নাটকে আমরা প্রথম জনজাগরণের আভাস পেয়েছি। দেখেছি সভ্যতার রথ জনতার হাতের টানে উঁচুনিচু পথকে সমান করে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে। রবীন্দ্রনাটকের রূপক সাংকেতিক নাটকের এই প্রগতি ধারণা পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘের বাস্তব ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গণনাট্যের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য হোল : 'People' বা 'গণ' অর্থে সমাজের বৃহত্তর অংশ—শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের স্বাধীনতা, সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার গণতান্ত্রিক পরিবেশ। মানুষের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের কথা শিল্প সংস্কৃতি কর্মীরা তাঁদের নাটক গানে কবিতায় আলোচনা ও প্রচার করবার মঞ্চ হিসাবে গণনাট্য সংঘকে গড়ে তুলেছিলেন। 'নবান্ন', ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৪ গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে অভিনীত হয়। নাটকটি ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তদানীন্তনকালে দেশের শোষিত কৃষক মধ্যবিত্তের জীবনের বঞ্চনা ও শোষণের চিত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল। নাটকটির অভিনয় চতুর্দিকে সাড়া তুলেছিল।

আপনি এ হেন ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই নাটকটির পূর্ণাঙ্গরূপ বর্তমান এককে পড়বেন। নাটকটি সমগ্রত পড়ার পর, আপনি নাটকটির বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, উপস্থাপনা নিজেই মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৮৬.৩ বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

'নবান্ন'-র নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম ১৭ই জুলাই, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) খানখানপুর গ্রামে। পিতা ক্ষীরোদ বিহারী ভট্টাচার্য পেশায় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর আদর্শ জীবনযাত্রা, সাহিত্য ও সংগীতপ্রীতি এবং শেক্সপীয়র-চর্চায় অনুরাগ বিজন ভট্টাচার্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পিতার সঙ্গে নানা স্থানে পরিভ্রমণ কালে গ্রামের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন ও তাঁদের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল। এখানে যাত্রা, কথকতা ও মেলায় অংশগ্রহণ করায় বিজন ভট্টাচার্যের গ্রামজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল অতিশয় সমৃদ্ধ। মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আশুতোষ কলেজে পরে রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩১-৩২-এ শরীর-চর্চা, জাতীয় আন্দোলন, পরে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অবসর সময়ে আলোচনা, ফিচার ও স্কেচ লিখতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত 'অরণি' পত্রিকায় যোগ দিয়ে গল্প ছাড়াও নানা বিষয়ে লিখতেন। রেবতী বর্মনের সাম্যবাদ সম্পর্কিত বই পড়ে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৯৪২-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে সর্বক্ষণের কর্মী হন। অনিয়মিত জীবনযাপন ও অযত্নে তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। ১৯৪২-এর 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন, 'জনযুদ্ধ' নীতির প্রচার এবং ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ স্থাপন এবং সেখান থেকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সঙ্গ (IPTA) গঠন-এ তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাঁর প্রথম নাটক 'আগুন' (১৯৪৩)। বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী'র তিনি নাট্যরূপ দেন। এগুলি অভিনীত হয়। এরপর তাঁর নাটক 'জবানবন্দী' অরণি'তে প্রকাশিত হয় আর দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেন 'নবান্ন'। এটি ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪-এ আই. পি. টি. এ. কর্তৃক শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনীত হয়। নাটকটিতে তিনি প্রধান সমাদ্দারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ইত্যবসরে ১৯৪৩-এ তিনি খ্যাতনামাকবি ও গল্পলেখক মনীষ ঘটকের কন্যা, লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীকে বিয়ে করেন, তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য 'জীয়নবন্যা' লেখেন। 'মরাচাঁদ' নাটকে পবন বাউলের ভূমিকায় উদ্দীপনামূলক গান গেয়ে সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯৪৮-এ তিনি মতান্তরের কারণে গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে বোম্বাই চলে যান জীবিকার অন্বেষণে। সেখানে তিনি কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন এবং কয়েকটি চিত্রনাট্য রচনা করে দেন। ১৯৫০-এ কোলকাতায় ফিরে 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ' প্রতিষ্ঠা করে প্রায় ২০ বছর ধরে নাটক লিখে, অভিনয় করে, নাটক পরিচালনা করে জীবন ধারণ করেছেন। দেবী দুর্গার রূপকাশ্রয়ে জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষকের সম্মিলিত প্রতিরোধ রচনার জন্য 'দেবীগর্জন', দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় 'কলঙ্ক', দেশবিভাগের দরুণ বাস্তুচ্যুত শিক্ষকের জীবন নিয়ে 'গোত্রান্তর' রচনা করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি 'ক্যালকাটা থিয়েটার' ছেড়ে 'কবচকুণ্ডল' নামে একটি নাট্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানেও কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়েছে—যেমন, 'কৃষ্ণপক্ষ', 'আজ বসন্ত' প্রভৃতি।

বিজন ভট্টাচার্য উৎপল দত্ত পরিচালিত লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'তিতাস একটি নদীর নাম', দিলীপ

রায় নির্দেশিত 'রাজদ্রোহী'-তে অভিনয় করা ছাড়াও 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', 'তথাপি', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' প্রভৃতি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। বস্তুত নাটক, গান, অভিনয় ছিল বিজন ভট্টাচার্যের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে ওতোপ্রোত। তথাপি, বিশৃঙ্খল জীবনযাপন ও হতাশা, তাঁর অসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সফল সুন্দর জীবন উপকূলে পৌঁছে দিতে পারেনি।

৮৬.৪ মূলপাঠ—১ (ক) গণনাট্য আন্দোলন কি ও কেন? (খ) গণনাট্য আন্দোলন ও 'নবান্ন'।

(ক) ফরাসী চিন্তাবিদ ও ঔপন্যাসিক রম্যাঁ রলাঁ তাঁর থিয়েটার সংক্রান্ত ভাবনা কয়েকটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন। সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হলো, ইংরেজিতে অনুবাদ হয়। অনূদিত গ্রন্থের নাম 'দি পিপ্‌লস্ থিয়েটার', এ দেশে নাম দেওয়া হয়েছে 'গণনাট্য'। বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক পটভূমিকায় য়ুরোপে নাটক ও থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। চল্লিশের দশকে বৃটিশ-উপনিবেশ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এটি প্রায় অমোঘ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চল্লিশের এই গণনাট্য আন্দোলন বর্তমানের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার।

রলাঁর মূল বক্তব্য হল প্রায়োগিক শিল্প বা পারফরমিং আর্টকে জনগণের কাছে যেতে হবে, তাঁদের জীবনকে তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ এ থিয়েটার হবে গনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত থিয়েটার। তিনি এখানেই থামেননি। তিনি একে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর আস্থা, তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভরতার কেন্দ্র জনগণ। তিনি বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মত বুঝেছিলেন যে কোন সংকট উত্তীর্ণ হ'তে হলে প্রয়োজন ব্যাপক প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ একক প্রচেষ্টায় নয়, ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সম্ভব। তাই গণনাট্যের নাটক জীবনের জন্য, তার বিষয়বস্তু জনজীবন থেকে আহৃত। চরিত্র সমাবেশে থাকবে সাধারণ মানুষ, কোন বিশেষ ব্যক্তি চরিত্র নয়, সামগ্রিক অভিনয় দক্ষতার ওপর এই নাট্যাভিনয় নির্ভরশীল। সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করে, তাঁদের নতুন জীবন-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা। ফলত এ নাটক বস্তুত উদ্দেশ্যমূলক। তবে এর মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হয় আনন্দময় পরিবেশে, জীবন সম্পর্কে রাজনৈতিক সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এ নাটকের মঞ্চ দৃশ্যসজ্জা হবে অতি সাধারণ, সাধারণ মানুষের জীবনানুগ-বাস্তব।

এখন নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে আন্দোলন শব্দটা সংযুক্তির তাৎপর্য বুঝে নেওয়ার দরকার। আন্দোলনের দুটি পক্ষ—আন্দোলনকারী ও যাঁর বা যাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়। এই প্রসঙ্গে অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে আর একটি প্রশ্ন, আন্দোলন কি জন্য? এবং কার জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবস্থা যা গরিষ্ঠ জনজীবনের পরিপন্থী, তাকে ভেঙে নতুন কিছু গড়বার বা করবার জন্য আন্দোলন। কার জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর হ'ল এই যে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মানুষের বাইরে যে অগণিত জনগণ শহরে গ্রামে গঞ্জে ক্ষেতে খামারে কলে

কারখানায় নানান সাধারণ বৃত্তিতে নিযুক্ত আছে, সেই সব মানুষের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরবার জন্য এই প্রয়াস। সেই দায়িত্ব অবিসংবাদিতভবে এসে পড়ল। তিরিশের দশকের মানুষের কাঁধে। মাঝখানের সময়টাতে দর্শকমণ্ডলী এমন কোন নাটক পায়নি যার মধ্যে নিজের মানসিকতার দুর্গতির সাযুজ্য খুঁজে পেতে পারে—কোন চরিত্রের জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের জীবন যন্ত্রণার সন্ধান পেতে পারে। বস্তুত নাটক জীবনের কাছে দায়বদ্ধ। তথাপি একথা বুঝবার বা বোজাবার চেষ্টা হয়নি সমাজের কাছে, মানুষের কাছে, জীবনের কাছে—নতুনত্ব পিয়াসী জনগণের কাছে যে নাটকের দায় ও দায়িত্ব কতখানি। অথচ নাটকের কারবার তো কেবল মাত্র মানুষকে নিয়ে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে সমাজের জীবনের সম্পর্ক নাটকের বিষয়। নাটক মানুষের কথা বলে, জীবন যন্ত্রণা বা জীবন সংগ্রামের ভাষ্যকার সে তাই তার বক্তব্য বিষয় বস্তুত যা নিয়ে তা হ'ল জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক, জীবিকার সঙ্গে বঞ্চনার, বঞ্চনার সঙ্গে প্রতিরোধের, প্রতিরোধের সঙ্গে সংগ্রামের বাস্তবসম্মত নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে জীবনের ইতিবাচক দিকটিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা।

বাংলা নাটকের পেশাদার মঞ্চ এই সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করতে পারেনি। ফলত জীবনবিমুখতা পলায়নবাদিতা, গতানুগতিকতা আর রোমান্টিসিজমের ধূম্রজালের মধ্যে নিমজ্জিত থাকল সে। ইতিমধ্যে এসে গেল আর একটা মহাযুদ্ধ। শুরু হ'ল কালোবাজারী আর মুনাফাখোর মানুষের নৃত্য। কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত শোষিত হতে হতে নিঃশেষিত প্রায় হতে লাগল। একদিকে স্বাধীনতা পাবার উদগ্র কামনা, অন্যদিকে শোষণ আর পেষণ থেকে মুক্তির আকুতি দিকে দিকে রণিত হতে লাগল। শুরু হ'ল জীবনের সপক্ষে—শুধু মধ্যবিত্ত নয়, শ্রমজীবী মানুষের অনুকূলে, নাট্য আন্দোলন।

আন্দোলনের আরো সুন্দর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, "আজ যে দেশের মধ্যে সর্বত্র নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে, তাহা এই নাট্য আন্দোলনের জন্য সম্ভব হইয়াছে। নাট্য-আন্দোলনে 'আন্দোলন' কথাটি লইয়া অনেকে আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু যখন সমাজের কোনো বৃহৎ অংশ একটি বিশেষ লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়, তখনই তো তাহাদের মধ্যে একটি আন্দোলন দেখা যায়। 'আন্দোলন' কথার অর্থই হইল প্রচলিত অবস্থার একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং কোন এক অপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য সক্রিয় সাধনা। ..... প্রাণবান নাটক মঞ্চজগৎ এবং আশ্বাসভরা এক আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে অদম্য সাধনাই ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই জন্য আন্দোলন কথাটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্ব হইতেই সাধারণ নাট্যশালায় অবসাদ ও অবক্ষয়ের লক্ষণ প্রকটিত হইয়া উঠিতেছিল। ওই সব নাট্যশালাকে যে সব অসাধারণ অভিনেতা তাদের অদ্বিতীয় অভিনয়গুণে বাঁচাইয়া রাখিয়াচিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরলোকগমন করিলেন। কেহ কেহ বা রঙ্গামঞ্চ হইতে সাময়িকভাবে অবসর লইলেন। তাহাদের অভাবে রঙ্গামঞ্চের আকর্ষণ একেবারে কমিয়া গেল। মঞ্চপরিচালকরাও আলোক ও দৃশ্যপটের ব্যবহার এবং প্রয়োগরীতির দিক দিয়া তেমন কোন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই, সে জন্য নবাগত সিনেমা-নেশায় উন্মত্ত দর্শকগণ রঙ্গামঞ্চের অভিনয়ের প্রতি

এ সময় বিশেষ কোন আগ্রহ বোধ করেন নাই। সমাজের অবস্থাও দ্রুত পরিবর্তন হইতেছিল। থিয়েটারের নেশামত্ত জমিদার শ্রেণীর অবলোপ ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং নূতন যে ব্যবসাদার শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছিল, তাহারা থিয়েটার অপেক্ষা চলচ্চিত্র শিল্প অধিকতর লাভজনক দেখিয়া সেদিকে ঝুঁকিলেন। নাট্যশালাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে এমন কোনো বলিষ্ঠ ভাবাশ্রয়ী উদ্দীপনাজনক নাটকও তখন রচিত হইতেছিল না। এইসব নানা কারণে সাধারণ নাট্যশালার অবস্থা তখন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নাটক ও মঞ্চকে বাঁচাইবার জন্য সাধারণ নাট্যশালার বাইরে তখন নবজীবনবাদী ও অদম্য উৎসাহী একদল নাট্যামোদী যুবকের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় নবনাট্য আন্দোলন গড়িয়া উঠিল।"

সমাজ সম্বন্ধে বিপ্লবী মতবাদ এবং নতুন জীবন সম্বন্ধে আশাবাদী ভাবনা প্রথম দেখা গিয়েছিল গণনাট্য সঙ্ঘে। দীর্ঘদিন ধ'রে এই আন্দোলন চলে আসছে। পেশাদারী মঞ্চগুলিও পাশাপাশি পুরাতন ঐতিহ্যকে বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে এবং দর্শক আকর্ষণের নানান কৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশের সুস্থ সংস্কৃতির ছিন্নপত্র সীমান্ত পেরিয়ে এসে বাংলার যুবমানসের ওপর যে তীব্র প্রভাব ফেলতে শুরু করে সেই সব নবলব্ধ চেতনা একে একে বিস্ফোরণ ঘটায়। কৃষক ও জমিদার-জোতদারের সংগ্রাম, শ্রমিক-মালিকের সংগ্রাম, শোষক ও অত্যাচারী মধ্যবিত্ত এবং খেটে খাওয়া নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের সংগ্রামকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে বাংলা নাটক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকল বাংলার মানুষের সঙ্গে। জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরে বাংলা নাটক বাংলার মানুষের প্রাণের বস্তু হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। নাট্যাভিনয়ই প্রধান অংশ ছিল এই গণনাট্য সংঘের। এই সংঘের ভাবনা চিন্তা পেশাদার কোন মঞ্চের ভাবনা চিন্তার অনুসারী ছিল না, তা সম্পূর্ণ আলাদা।

সংগঠিতভাবে 'গণনাট্য' আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক দিয়ে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে গণনাট্য সম্পর্কে কিছু জানার দরকার আছে। তা' না হলে 'নবান্ন' নাটকের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝা যাবেনা। 'নবান্ন' এবং 'গণনাট্য' সংঘ একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেশের ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি স্তরে মার্কসবাদী আদর্শ এবং সংগঠন বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রুশ বিপ্লবের পরেই এই প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যেমন রাজনীতিতে তেমনই সংস্কৃতি আন্দোলনেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রয়োগ এদেশে শুরু হয়ে যায়। এরই ফলে ১৯৩৫ সালে প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়, যার মূল ঘোষণা ছিল 'ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা ক্ষুধা-দারিদ্র্য সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা কবতেই হবে। যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে তাকে আমরা প্রগতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসম্মতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মীষ্ঠ শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে—তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।'

এই ঘোষণায় স্পষ্ট বলা আছে—'সাহিত্যেরবিষয় বস্তু কি হবে এবং যা আরো গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে

যে কেবলমাত্র রসের বিচারের দ্বারা সাহিত্য বিচার হতে পারেনা। সেই শিল্পজাত রস আমাদের সমাজের রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করে কিনা সেও একটা মানদণ্ড যা তৎকালীন ভারতীয় শিল্পকলা বিচারে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ইতিপূর্বে বলা হয়নি।'

এই 'প্রগতি লেখক সংঘ' সারা ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলার প্রায় অনেকগুলি জেলায় শাখা বিস্তার করে। নাটক সাহিত্যের এমন একটি অঙ্গ যা নতুন ভাবাদর্শ প্রচারে সক্রিয় এবং অগ্রগামী ভূমিকাপালন করে। আর যেহেতু, অভিনয় যোগ্যতা নাটকের মৌল শর্ত, সেই হেতু দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে তা সহজেই ছাপ ফেলতে পারে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কিংবা 'নীলদর্পণ' আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে রায় দেবে। ফলে দেশের লেখকদের সামনে একটা নতুন ঢেউ এলো। গল্প কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ছাত্র, যুবক, অফিসের কেরানী প্রভৃতি শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিরা নাটক লেখা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে থাকলেন।

(খ) ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তার প্রথম বুলেটিনে 'Peoples Theatre Stars the People'—এই বাণী শিরোভূষণ করে যাত্রা শুরু করে। এই সংঘের লক্ষ্য ছিল স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলে তাকে প্রাণবন্ত করে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। প্রভাবে গণসংযোগের মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ করা সম্ভব হবে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে এভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে এসেছে। গণনাট্যের নাটক তাই সাধারণ নাট্যভাবনা বা নাট্যতত্ত্ব দিয়ে বিচার করা ঠিক হবে না। জীবন্ত ও সচল জীবন ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে এ নাটককে বিচার করতে হবে সমসাময়িক দেশকাল ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগুলি লেখা বলে, বিচারও করতে হবে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে। যেহেতু এর বিষয়বস্তু নতুন, চিন্তাধারাও স্বতন্ত্র, প্রয়োজনীয় সংঘবদ্ধ প্রয়াস, সর্বোপরি শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজনে মূল বক্তব্য উপস্থাপিত, এর বিচার প্রচলিত মানদণ্ডে হতে পারেনা।

প্রথম পর্বে Youth Cultural Institution (Y.C.I.) (১৯৪০), পরে গণনাট্য সংঘ যে নাটক ও গল্পের নাট্যরূপ অভিনয় করেছিল ; তা হল অঞ্জনগড় ও কেরাণী এবং ল্যাবরেটরী, আগুন, হোমিওপ্যাথী ও জবানবন্দী। এগুলিতে কৃষক-শ্রমিকের সঙ্গে অবহেলিত শোষিত সাধারণ মানুষ এবং নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সমাজের শোষণ বঞ্চনা তুলে ধরে, তাদের মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগঠনের মাধ্যমে বাঁচবার প্রেরণা সঞ্চার করা হয়েছে। এমনি পরিবেশ পরিস্থিতিতে 'নবান্নে'র জন্য।

নবান্নের পটভূমিতে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানী আক্রমণ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিম্নবঙ্গে ফসল নষ্ট, সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্দশা প্রতিকারহীন দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর—সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরে ক্ষুধা মেটাতে লঙ্গরখানায় লাইনে দাঁড়িয়ে। ওদিকে লোভী জোতদার মজুতদার ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক খাদ্য গুদামজাত করছে, এদিকে অস্থিচর্মসার ক্ষুধার্ত নারী-পুরুষের নগ্নমূর্তির ছবি ও সেবাশ্রমের আড়ালে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা চলছে রমরমা।

এই ক্রান্তিকালে 'নবান্ন' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গণনাট্য সংঘ সমগ্র দেশে তো বটেই ইংল্যান্ডেও সাড়া ফেলেছিলো। দেশে বিদেশে সংবাদপত্রে এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হ'তে থাকে। ইংল্যান্ডের

জনগণ বাংলার এই দুর্ভিক্ষের খবর জানতে পারে। তাঁদের কেউ কেউ গণনাট্য সংঘকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যে উদ্যোগী হন।

People's Relief Committee (PRC)-র ব্যবস্থাপনায় গণনাট্য সংঘ মন্বন্তরে পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সার্বিক সহায়তা দান শুধু করেনি, আর্ত জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে দেশেরসামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছে।

৮৬.৫ সারাংশ

বর্তমান এককের সূচনায় নাটকের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এটি একটি অভিনব নাটক যার বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, চরিত্র পরিকল্পনা, দৃশ্যসমাবেশ আলো ও ধ্বনির সুষম বিন্যাসের সাহায্যে ব্যক্তিজীবন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি বাস্তবসম্মত চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষের, দুর্গতির ও প্রতিরোধের ছবি ফুটিয়ে তুলে গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।

প্রস্তাবনায় জানানো হয়েছে 'নীলদর্পণ' ও 'রথের রশি'-র অবদানের পরিচয়। ইতিহাসের ধারায় নাটক ক্রমশ পুরাণ, ইতিহাসের সীমা থেকে সাধারণ মানুষের জীবনাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। কালক্রমে এরই স্রোতোধারায় গণনাট্য আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'নবান্ন' নাটক।

বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা থেকে জানা যায়, তাঁর পরিবারে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। গ্রামীণ যাত্রা, কথকতা, মেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গ্রাম্য কথ্যভাষার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। জাতীয় আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন তাঁকে নাড়া দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। এ সময়েই সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে সর্বক্ষণের কর্মী হন। নানা কাজের মধ্যে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, জনযুদ্ধনীতি প্রচার, ফ্যাসিস্ট বিরোধী থেকে প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ ও গণনাট্য সংঘ স্থাপন। এই গণনাট্য সংঘের জন্য তাঁর 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' নাটক রচনা। শেষোক্ত নাটকটি তিনি শম্ভু মিত্রের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালনা এবং অভিনয় করেন। শেষ জীবনে, অভিনয়ই তাঁর জীবনধারণের একমাত্র পাথেয় ছিল। হতাশা তাঁকে ঘিরে থাকায়, শেষদিকে তিনি ভগ্ন, রিক্ত বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করেছেন।

পরিশেষে মূলপাঠ ১-এ গণনাট্য আন্দোলন ও নবান্ন সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। রম্যাঁ রলাঁর 'পিপল্‌স্ থিয়েটার'-এর ধারণা থেকে এ দেশে গণনাট্যের ধারণার সূচনা চল্লিশের দশকে। এই নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্র পরিকল্পনা জনজীবন থেকে আহৃত, উপস্থাপনা সহজ, সরল অনাড়ম্বর। তাই সাধারণ নাট্যতত্ত্ব দিয়ে একে বিচার করা ঠিক হবেনা। সমসাময়িক দেশকালের প্রেক্ষাপটে সচল জীবন্ত চরিত্রগুলিকে সমাজ বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে।

১৯৪০-এর দশকে রচিত গণনাট্যের নাটকগুলি প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগঠন ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঁচবার প্রেরণা জুগিয়েছে। 'নবান্ন' এই ক্রান্তিকালের সৃষ্টি।

৮৬.৬ অনুশীলনী ১

১। (ক) আপনার মতে 'নবান্ন' পাঠের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হল—
(খ) বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক—
(গ) নবান্ন নাটকের রচনা কাল—

২। (ক) 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয়—
(খ) 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপটে আছে—
(গ) বিজন ভট্টাচার্য কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, যে কোন দুটি অভিনীত চিত্রের নাম করুন—

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ——— তে' প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর নাটক 'নবান্ন' — — ও ——— পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, অভিনীত হয় ——— মঞ্চে।

৪। (ক) গণনাট্য নামকরণের উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
(খ) Y.C.I. এবং গণনাট্য সংঘ যে নাটকগুলি অভিনয় করেছিল তার যে কোন তিনটির নাম উল্লেখ করুন।

৫। প্রথম যুগের প্রগতি নাট্য আন্দোলনের বিষয়বস্তু ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮৬.৭ মূলপাঠ ২ নবান্ন ঃ প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিবাবসানে চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্গত পল্লীর বুকে নেমে আসছে রাত্রি। মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। সুদূরের পটভূমি রক্তিম। অস্পষ্ট আলোকে কচ্ছপের পিঠের খোলার আকৃতি একটি মালভূমির ওপর ছায়ামূর্তির মতো দু-চারজন লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই দুটো লোক ত্রস্ত অথচ সন্তর্পণে ঢুকে কী যেন সব ফিসফিসিয়ে বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে, আবার বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার এসে ঢুকল যেন আরও কারা। কী সব কথা ফিসফিস করে বলে কয়ে চলে গেল। ছায়ামূর্তিগুলোর হাত-পা নাড়া ও কথা বলার বলিষ্ঠ ধরনে মনে হচ্ছে যেন কী একটা ভীষণ চক্রান্ত চলছে ওদের মধ্যে। হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল ; আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি। আগুনের আভায় মালভূমির ওপরকার দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুচোখের সামনে। কালো চেহারার বলিষ্ঠ দুজন লোক। একজন প্রৌঢ়ত্বের ওপারে পৌঁছেছে ঃ আর একজনের বয়স কম—

গোটা ত্রিশ-বত্রিশ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গোটানো, হাতে গাছলাঠি—শরীরের সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।

প্রধান। (হাত তুলে রক্তিম পটভূমির দিকে ইঙ্গিত করে) তা এ সব কিছুর পর, সব কিছুর পর যে দিন আসবে, আমার শ্রীপতি-ভূপতি বলে গেছে রে কুঞ্জ, তার বরন হবে, ও কুঞ্জ তুই চেয়ে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, ওই ওই রকম। ওই রকম সোন্দর, ওই রকম নিদারুণ সোন্দর। (অনুকম্পা ও তাচ্ছিল্যভরে হেসে) তিন মরাই ধান। তিন মরাই ধান তুই আমারে কী বলিস্ কুঞ্জ! ..... জীবনটা না দিতে পারলে যে শান্তি নেই তা তো তুই দেখছিস নে। কুঞ্জ, ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। আমি প্রাণ দেব। আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

[নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ]

কুঞ্জ। (ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে) চুপ। টুঁ শব্দ না। ঐ—

প্রধান। চল, চল্ কুঞ্জ আমরা এগিয়ে যাই।

কুঞ্জ। কী এগিয়ে যাই, পাগল না মাথাখারাপ!

প্রধান। মাথাখারাপ!

কুঞ্জ। মাথাখারাপ না তো কী বলব? (নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ) শুনছ ওদিকে, ঐ ঐ আবার—

প্রধান। আবার! আবার! ওরা ক'জনা?

কুঞ্জ। ক'জনা! কী করে বলব ক'জনা! চলো—

প্রধান। চল্ তো গাঙ বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।

[নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ]

কুঞ্জ। না না না, তা হয় না, তুমি—ঐ, ঐ আবার! চলো পালাই।

প্রধান। পালাব। পালাতে বলছিস তুই!

কুঞ্জ। আ—া—হা—া, তা খামখা জান্ দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? চলো, চলো ঐ বনের ভেতরেই পালাই।

প্রধান। (বিলাপের সুরে) আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। (প্রধানকে হাতে ধরে টেনে) তোমারে নিয়ে হয়েছে আমার মহা জ্বালা, বুঝলে, মহা জ্বালা।

[উভয়ে দ্রুত প্রস্থান]

[ত্রস্ত পায়ে বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদিনী। (বিমূঢ়ভাবে) ওমা, এ কী বিপদ হলো, এখন যাই কোথায়।

[দ্রুত প্রস্থান]

[সন্ত্রস্তভাবে নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নিরঞ্জন। (খালি গায়ে ছুটতে ছুটতে) তাই তো—সাংঘাতিক।

[দ্রুত প্রস্থান]

[পঞ্চাননীর প্রবেশ]

পঞ্চাননী। (লাঠি ভর দিয়ে ত্বরিতপদে) না, শরম-ইজ্জৎ আর থাকল না মেয়েমানষির, শরম-ইজ্জৎ আর থাকল না—

[দ্রুত প্রস্থান]

এলো চুলে উন্মাদিনীর মতো ছুটতে ছুটতে সোজা মঞ্চের ওপর দিয়ে রাধিকার দ্রুত প্রস্থান। সন্ধ্যার গোধুলি আলোর মতোই পটভূমির রক্তিম আভা বিষণ্ণ হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। দূরে শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রায়ান্ধকার মঞ্চের ওপর দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অনেকগুলো দ্রুত ধ্বনি দূরে মিলিয়ে গেল।

[কুঞ্জর প্রবেশ]

কুঞ্জ। (সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে ঢুকে) থাক্ চলে গেছে। এসো, এসো তোমরা সব।

[প্রধানের প্রবেশ]

প্রধান। (কব্জির ওপরে ক্ষতস্থানে হাত চেপে) চলে গেছে? চলে গেছে, আবার আসতে কতক্ষণ?

কুঞ্জ। ও কী, রক্ত? কাটল কিসে? দেখি!

প্রধান। (তাচ্ছিল্যভরে ক্ষোভের সুরে) হে, এ রক্তের আবার দাম? এ রক্তের জন্যে আবার মায়া। জন্তু জানোয়ারের মতো বনে জঙ্গালে যাদের পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা—ও বেশ হয়েছে কুঞ্জ তুই আমারে ছেড়ে দে।—আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। অন্তর কার জলেনি, আমার না?

প্রধান। (ক্ষুব্ধ স্বরে) জ্বলেছে তো এগুলি নি কেন যখন বল্লাম? এগুলি নি কেন? কেন এগুলি নি তুই? তোর অন্তর যদি—আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

কুঞ্জ। শ্রীপতি-ভূপতির ব্যথা বড় কম বাজে নি এই বুকে, জানলে জেঠা! তবে তুমি শুধু বারবার ঐ নাম দুটো করে মিথ্যে শান্তি পেতে চাও, আর আমি ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরি, এই তফাৎ। তা মিথ্যে হা-হুতাশ আর—

[পঞ্চাননীর প্রবেশ]

পঞ্চাননী। (লাঠি ভর দিয়ে ত্বরিতপদে) না এর এট্টা বিহিত করতে হয় কুঞ্জ, বুঝলে, এর এট্টা বিহিত করতে হয়। এ কী রকম ধারা কথা? মেয়েমানুষ, লজ্জাশরম খুইয়ে বনে-জঙ্গালে গিয়ে বসে থাকবে পহরের পর পহর! কেন, বিত্তান্তটা কী! দেশে পুরুষ মানুষ নেই, হ্যাঁরা কুঞ্জ?

কুঞ্জ। জেঠিমা তুমি!

পঞ্চাননী। হ্যাঁ আমি, তুই জবাব দে আগে আমার কথার।

কুঞ্জ। বলো।

পঞ্চাননী। আবার বলবে কী? দেখছিস নে, না খেয়ে বসে আছিস চোখের মাথা! বলি তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়েমানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? মেয়েমানুষ কী পাপ করেছে, য়্যাঁ।

কুঞ্জ। কী বলব।

পঞ্চাননী। কী বলবি!

প্রধান। সহ্য করতে এয়েছ সহ্য করে যাও। মুখ বুজে সহ্য করে যাও, কোনো কথা কয়ো না। কোনো কথা কয়ো না, অধর্ম হবে। মুখ বুজে.....

পঞ্চননী। তার আর বলবে কী। আজ তিন দিন দাঁতে এট্টা কুটো কাটি নি, বুঝলে! শরীরের কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি। সে কোনো কথা না। কিন্তু শরম!! লজ্জা!! তোমাদের দেশের মেয়েমানুষের অঙ্গোর ভূষণ!! যা নিয়ে তোমরা গর্ব কর!! আর তারপর সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!! মেয়েমানুষের ইজ্জৎ!! কী, কথা বলিস না যে! চুপ করে থাকিস কেন, হ্যাঁরা কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ!! !! !!

কুঞ্জর দিকে স্থির দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে পঞ্চাননীর দ্রুত প্রস্থান

কুঞ্জ। (ক্ষোভের সুরে) ইজ্জৎ!! ইজ্জৎ দেখছে! জীবনটাই যেখানে বেইজ্জতের সেখানে আবার মেয়েমানুষের ইজ্জৎ! কিন্তু কিন্তু

[নিদারুণ অস্বস্তিতে যেন হাঁপিয়ে ওঠে কুঞ্জ]

প্রধান। ঐ হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু ; (হঠাৎ উদভ্রান্তের মত ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে কুঞ্জর) ঐ কিন্তুটার টুঁটি একবার, (মরিয়াভাবে) কিন্তুটা-রে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে (ধস্তাধস্তি) —

কুঞ্জ। জেঠা, জেঠা, কী হচ্ছে, কী কর? জেঠা! জেঠা!!

[কুঞ্জর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে প্রধান]

প্রধান। (হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে) য়্যা)!

কুঞ্জ। জেঠা!

প্রধান। আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর জ্বলে গেছে।

কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে থাকে প্রধান

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির। কুঞ্জ।

কুঞ্জ। (একটু লক্ষ্য করে) আপনি এলেন কবে!

যুধিষ্ঠির। এ অঞ্চলে দিনসাতেক হল এসেছি।

কুঞ্জ। জানতে পারিনি তো একেবারেই।

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, তোমরা জানতে পারোনি ঠিকই, তবে আমি এর মধ্যেই দু'বার ঘুরে গিয়েছি। দিন তিনেক আগে, এই তোমার গত বুধবার হতে, একজন কাবুলিওয়ালা ঘুরে য়ায়নি তোমাদের এখান দিয়ে।

কুঞ্জ। (মাথা চুলকে) কাবুলিওয়ালা। সকাল বেলার দিকে?

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, এই বেলা আন্দাজ নটা নাগাদ? (একুট হেসে) আমিই সেই কাবুলিওয়ালা।

কুঞ্জ। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) আপনি সেই কাবুলিওয়ালা?

প্রধান। আপনি!

যুধিষ্ঠির। কাঠের একটা গুঁড়ির ওপর বসে তুমি আমাকে খাচ্ছিলে না।

কুঞ্জ। ঠিক তো।

যুধিষ্ঠির। এই, আর একদিন রাত্তিরে। রতনগঞ্জ থেকে সেদিন আমি ঘোড়ায় ফিরছিলাম।

কুঞ্জ ও প্রধান বিস্মিতের ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে যুধিষ্ঠিরের দিকে

তা যাক-গে, সে সব কথা জানবার দরকার নেই তোমাদের। সময় খুব সংক্ষেপ, দু'চারটে জরুরি কথা বলেই চলে যেতে হবে আমাকে এখান থেকে। কথাটা হচ্ছে যে, যারাই আমাদের কর্তব্যের পথে সামান্যতম অন্তরায়ের সৃষ্টি করতে চাইবে, তাদের বিরুদ্ধেও আমাদেরকে এখন থেকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। আমাদের আদর্শকে জয়যুক্ত করবার দিক থেকে যে-কোনো ব্যবস্থা, তা সে যতই নির্মম হোক না কেন, গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধা করলে আমাদের চলবে না। আমি জানি, জয় পরিণামে হবে আমাদেরই, কিন্তু সেই বিজয় গৌরব অনায়াসলভ্য নয় কুঞ্জ, প্রতিটি পদক্ষেপ রক্তরেখায় রঞ্জিত করে জিতে নিয়ে আসতে হবে সেই বিজয়লক্ষ্মীকে।

প্রধান। (পৈশাচিক উল্লাসে) আমি তাই বলি কুঞ্জ এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্, বেড়ি দিয়ে ফেলি গে ওদের ; তা কুঞ্জ শোনে না, কুঞ্জ শুধু পালায়, কুঞ্জ শুধু—আজ যদি আমার শ্রীপতি-ভূপতি।

ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়ে প্রধান

কুঞ্জ। (যুধিষ্ঠিরকে একান্তে) শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল দুটে ছেলের শোকে।

যুধিষ্ঠির। না না পাগল নয় কুঞ্জ প্রধান পাগল নয়। এই ঠিক। প্রয়োজন আছে আজ এই উন্মত্ততার।

এ পাগলামি নয়।

প্রধান। না না।

যুধিষ্ঠির। (কুঞ্জর প্রতি) তুমি বলছ পাগল, কিন্তু বলতে পারো কুঞ্জ, কোথা থেকে আসে এই পাগলামি? কেন এই উন্মত্ততা? ভুল—

ভুল কুঞ্জ, মহা ভুল প্রধান পাগল নয়।

কুঞ্জ। পাগল নয়?

প্রধান। (অস্ফুটস্বরে) না, না, না, না।

যুধিষ্ঠির। আমাদের অন্তরের সমস্ত খর্বতাকে আজ প্রধানের অর্ন্তদাহই পরিশুদ্ধ করতে পারে।

অভিভূত হয়ে গেছে কুঞ্জ। ভাববিহ্বল চিত্তে কী যেন ব্যক্ত করতে চায়, কিন্তু পারে না।

যুধিষ্ঠির। (কুঞ্জর বুক চাপড়ে) আমার সময় হয়ে গেছে কুঞ্জ। আমি চলি এখন। (প্রধানের প্রতি) আবার আসব প্রধান।

[প্রথানুযায়ী যুধিষ্ঠির ডান হাতটা বুকে ঠেকিয়ে উর্ধ্ববাহু করে তুলে ধরে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। কুঞ্জ ও প্রধান যুধিষ্ঠিরের অনুকরণ করে ..... যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।]

হঠাৎ নেপথ্যে একটা হট্টগোল শোনা যায় এবং ক্রমে সেই গণ্ডগোল বাড়তে থাকে। গভীর উত্তেজনায় কুঞ্জ চতুর্দিক লক্ষ্য করে। প্রধানও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ।

কুঞ্জ। জেঠা! জেঠা! ঐ! (হাত দিয়ে অনুসরণের ইঙ্গিত করে)

[কুঞ্জর দ্রুত প্রস্থান]

প্রধান। (পৈশাচিক উল্লাসে) ঐ, ঐ আবার! ও কুঞ্জ, কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ! কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব প্রাণ দেব প্রাণ দেব!

[দ্রুত প্রস্থান]

নেপথ্যে গণ্ডগোল ভয়াল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই দেখা যায়,
বৃদ্ধা পঞ্চাননী একটা জনতাকে পরিচালনা করে নিয়ে ঢুকছে।

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব! এগিয়ে যা।

জনতা সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে খানিকটা এগিয়ে আসে

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা!

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ। জনতা একটু ইতস্তত করে

এগিয়ে যা, এগিয়ে চল তোরা সব! এগিয়ে যা।

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ। জনতা থমকে দাঁড়ায়

জনৈক ব্যক্তি। (ঘা খেয়ে) আরে ব্বাস রে, বাপ রে বাপ।

সকলে সমবেত কণ্ঠে এই -ই-ই শব্দ করে পিছিয়ে যায়।

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা সব।.....

নেপথ্যে বাঁশ ফাটার বিরামহীন শব্দ। পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কপালে হাত চেপে ধরে এগিয়ে যা, এগিয়ে যা .....

মূহ্যমান হয়ে পড়ে পঞ্চাননী। সকলে মালভূমির ওপর দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যায়। দু একজন মাটিতে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকে

(ক্ষীণ কণ্ঠে) এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব .....

দুই একটা জ্বলন্ত মশাল মাটিতে পড়ে থাকে। হাতিয়ার সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। গোলমাল ক্ষীণ হয়ে আসে। পঞ্চাননীর মুখে কথা সরে না, শুধু হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে থাকে—এগিয়ে যা, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব।

মঞ্চের উপর তিন-চারজন আহত লোক শুয়ে পড়ে ক্ষীণভাবে হাত-পা নাড়তে থাকে। পঞ্চাননীর কণ্ঠ নির্বাক হয়ে আসে। কিন্তু তখনও হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে থাকে, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা। সুদূরের হট্টগোল ক্ষীণ হয়ে আসে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটা মশাল তখনও জ্বলছে।

(পটক্ষেপ)

প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালি। একখানা দোচালা ঘরের দাওয়ার ওপর বসে আছে প্রধান, কুঞ্জ, কুঞ্জর ভাই নিরঞ্জন, আর কুঞ্জর ছেলে—নাম মাখন! জল ভরতি একটা মেটে কলসি কাঁখে নিয়ে কুঞ্জর স্ত্রী রাধিকা, ওরফে রাধি ঘরে গিয়ে উঠল। একটু পরেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়—রাধিকাকে—কাঁকালে পুরোনো একটা মেটে কলসি আর হাতে একখানা বস্তা। কলসিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে রাধিকা প্রথমে বস্তাটা উঠোনে বিছিয়ে দেয়, তারপর কলসির ধানগুলো চটের ওপর ঢেলে ফেলে পা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নেড়ে দেয়।

প্রধান। (পা দিয়ে ধান নাড়তে নাড়তে) নাও, এই কটাই সম্বল ছিল, কত করে রেখে দিছলাম, গেল।

কুঞ্জ। কেন, মাচাং-এর ওপরে সেই সে কালো জালার ভিতরি যে পুরোনো আউস কতকগুলো ছিল?

রাধি। (মুখ ঝামটা দিয়ে) হ্যাঁ, বসে রয়েছে এখনও তোমার জন্যে সেই ধান। রোজ ক'সের করে চাল লাগে হিসেব করে দেখেছ কোনো দিন?

কুঞ্জ। (রাগত ভাবে) না, হিসেব করে দেখিনি, এমনিই চলছে।

নিরঞ্জন। (বাধা দিয়ে) নাও, ও অভাব-অভিযোগ তো লেগেই আছে মাসের মধ্যে তিরিশ দিন সংসারে। তা বলে সকালবেলাই খামখা এট্রা অস্বরস কাণ্ড বাধিয়ে আর লাভ কী। চুপ করে যাও।

কুঞ্জ। না, তাই দ্যাখো একবার আচরণ। সোজা কথায় বললেই হয় যে, না, ফুরিয়ে গেছে সেই ধান। তা না মেয়েমানুষের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত একেবারে রি রি করে জ্বলে ওঠে। মোটে সহ্য করতে পারি নে। কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে, তার আবার—

রাধি। (রাগত ভাবে) হ্যাঁ, খেয়ে খেয়ে দ্যাখো না কেমন সোন্দর হাল হয়েছে শরীরের! (মুখ ভেংচে) আর বলো না, বুঝলে? পুরুষ মানুষের কিতিত্বের কথা আর বলো না। আমরা যে মেয়েমানুষ, আমাদের পর্যন্ত লজ্জা করে।

কুঞ্জ। ও—ো —ো ঃ, লজ্জাবতী লতা রে আমার!

[পিঁচ কাটে]

রাধি। (কটাক্ষ করে) দু'চক্ষে পেড়ে দেখতে পারি নে।

[রাধিকার প্রস্থান]

প্রধান। (আফশোসের সুরে) হায় রে ধান, হুঁঃ। এই দুটো ধানের জন্যে—

নিরঞ্জন। (বাধা দিয়ে) ন্যাও, থামো তুমি। তোমার আফশোস শুনতে আর ভালো লাগে না। পচে গেল কান।

কুঞ্জ। হ্যাঁ, সব খুইয়ে এখন ঐ আফশোসই সার হয়েছে। ভালো কাণ্ডকারখানা।

প্রধান। (আনমনে) সে কি দু'চারটে ধান! তিন তিন মরাই ধান।

কুঞ্জ। (নিরঞ্জনের প্রতি) ন্যাও সামলাও এখন ঠেলা।

[প্রধান ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে]

নিরঞ্জন। (প্রধানের প্রতি) তা সে যা করেছে তা বুঝে শুনেই করেছে।

কুঞ্জ। বুঝে শুনে মানে, নিজে তো করেইছে, আর পাঁচ জনারে পর্যন্ত বাধ্য করেছে ধান নষ্ট করে ফেলতে।

প্রধান। জোর করে প্রধান কাউকেই কিছু বলেনি।

কুঞ্জ। জোর করে মানে কি আর তুমি নিজে হাতে করে অপরের গোলার ধান নষ্ট করেছ আমি বলছি? অনুরোধ উপরোধ করে বাধ্য করেছ। উপরোধে মানুষ বলে ঢেঁকি পর্যন্ত গেলে, তার আবার—

প্রধান। উপরোধও করিনি।

নিরঞ্জন। বেশ তো তাই হল, উপরোধও করিনি। কিন্তু আচরণ করে শিক্ষে দিয়েছ।

প্রধান। হ্যাঁ তা দিইছি।

নিরঞ্জন। বিবেচনা করেই দিয়েছ?

প্রধান। (রাগতভাবে) হ্যাঁ দিইছি, বিবেচনা করেই দিইছি। যা করবার তোরা কর আমারে। য়্যাঁ, নৌকো ছিল আমি আটকে রেখেছি। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে আমি মানষিরি সব দেশান্তরি করিছি। সব আমি করিছি। কর্ তোরা আমারে যা করবার কর।

[অস্থির হয়ে ওঠে প্রধান]

কুঞ্জ। (নিরঞ্জনকে চুপ করতে ইঙ্গিত করে) তোমাকে আবার কে কী করতে চাচ্ছে মাঝে মাঝে আপনা থেকে আফশোস কর বলেই তো এই সব কথা ওঠে। যা গিয়েছে—গিয়েছে, য়্যা। এই তো, ক'মাস পরেই আবার আমন ধান পাওয়া যাবে। তেমন একটা অঘটন যদি ঈশ্বরের ইচ্ছেয় না ঘটে তো ভাতের আবার ভাবনা! (স্ত্রী রাধিকার উদ্দেশ্যে) কই, গেলে কোথায়? (মাখনের প্রতি) ডাক দিকিন মাখ তোর মা-রে।

মাখন। মা এসে আবার কী করবে?

কুঞ্জ। (ধমকের সুরে) কী করবে তা বুঝবখন আমি। ব্যাদড়া ছেলে কাঁহাকা, ডাক শিগ্‌গির।

মাখন। যাচ্ছি।

[মাখনের প্রস্থান]

কুঞ্জ। মুখ থেকে দুধের গন্ধ গেল না, এর মধ্যেই তক্ক করতে শিখেছে মুখে মুখে। মা-টি আবার কেমন দেখতে হবে তো।

[রাধিকার প্রবেশ]

কী, খুব তো মেজাজ দেখিয়ে চলে গেলে তখন। বলি রাগ করে বসে থাকলে কি পেট ভরবেখন সকলের?

রাধি। ওমা, রাগ আবার করলাম কখন!

কুঞ্জ। না, পা থাবড়ে যে বড়ো ঘরে গিয়ে উঠলে, সেই কথা বলছি।

রাধি। তা উঠলামই বা। কারো তো কিছু এসে যাচ্ছে না তাতে!

কুঞ্জ। তা এসে যাচ্ছে বই-কি। শুধু শুধু আর কি হাত গুটিয়ে বসে আছি? নাও, দাও দিকিন এইবার তোমার সেই—

রাধি। (আঁচ করে একটু রেগে) কী দেবে?

কুঞ্জ। (চোখ বুঁজে) আরে কী যে বলে ওর নামটা—